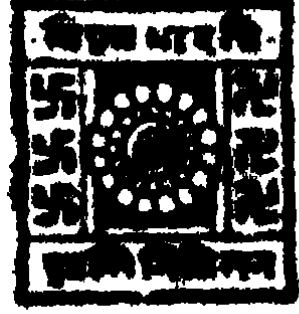


কালান্তর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চার্টার্ড স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৯৪৪ বৈশাখ

পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫ পৌষ

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬১৩ ষারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীশূৰ্বনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস, ৩০ কনওরালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

কালান্তর	৩-২৩
বিবেচনা ও অবিবেচনা	১৭
লোকহিত	২২
লড়াইয়ের মূল	৪২
কর্তার ইচ্ছার কর্ম	৪৭
ছোটো ও বড়ো	৭৮
ব্যতিকারপ্রমত্ত:	১০২
বাতারনিকের পত্র	১২৩
শক্তিপূজা	১৫৮
শিক্ষার মিলন	১৬২
সত্যের আহ্বান	১৮৩
সমস্তা	২১৮
সমাধাম	২৪৫
শুদ্ধধর্ম	২৫২
চরকা	২৫৩
স্বরাজস্বাধন	২৭৮
স্বয়ংভের কথা	২৯১
বৃহত্তর ভারত	৩০৪
হিন্দু মুসলমান	৩১৪
স্বামী প্রভাকর	৩১৯
হিন্দু মুসলমান	৩২৭
'স্বামীনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'	৩৪১
নারী	৩৫৩
কনগ্রেস	৩৬৩
আরোগ্য	৩৭৬
সত্যতার সংকট	৩৮২

যে মার্ঘ্য সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে
 করতে গিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতি-
 হাসিকভাবে দেখাই সংগত। রাষ্ট্রনীতির
 মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে
 সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে
 আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনের
 অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের
 মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত
 পরিবর্তনপরস্পার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা
 ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে
 হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ
 গৌণ, কোন্টা তৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ
 সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান,
 সেইটে বিচার ক'রে দেখা চাই। বস্তুত
 সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে
 পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব ক'রে
 তবে তাকে পাই।

মুদ্রণসময় : ১৩৬ পৃ ১১ হতে **expeditionary** হলে
expeditionary হইবে।

কালান্তর

কালান্তর

এক দিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়াপড়শীদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বহু। পরস্পরকে নিয়ে রাগঘেবে গলে-গুজবে তাসে-পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা-তিন-চার পরিমাণে দিবানিজা বিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিন্তামূলনার যে আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাচালি কবিগান নিয়ে। তার বিষয়বস্তু ছিল পুরাকাহিনীভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত। যে জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতি-পরিচিত। তার সমস্ত তথ্য এবং রসধারা বংশানুক্রমে বৎসরে বৎসরে বার বার হয়েছে আবর্তিত অপরিবর্তিত চক্রপথে, সেইগুলিকে অবলম্বন করে আমাদের জীবনযাত্রার সংস্কার নিবিড় হয়ে জমে উঠেছে, সেই-সকল কঠিন সংস্কারের ইটপাথর দিয়ে আমাদের বিশেষ সংসারের নির্মাণকার্য সমাধা হয়ে গিয়েছিল। এই সংসারের বাইরে মানব-ব্রহ্মাণ্ডের দিক্দিগন্তে বিরাট ইতিহাসের অভিব্যক্তি নিরন্তর চলেছে, তার সূর্য্যদান নীহারিকা আছোপান্ত সনাতন প্রথার ও শাস্ত্রবচনে চিরকালের মতো স্থাবর হয়ে ওঠে নি, তার মধ্যে এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ঘাতসংঘাতে নব নব সমস্তার সৃষ্টি হচ্ছে, ক্রমাগতই তাদের পরস্পরের সীমানার সংকোচন-প্রসারণে পরিবর্তিত হচ্ছে ইতিহাসের রূপ, এ আমাদের গোচর ছিল না।

বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু, সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন জাতীয় শতাব্দীর মধ্যে বহু। বাহুবলে সে রাজ্যসংঘটন করেছে, কিন্তু তার চিন্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এইজন্যে সে যখন আমাদের দ্বিগন্তের

কালান্তর

মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল— কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাধা মতের সঙ্গে আর-এক বাধা মতের। রাষ্ট্রপ্রণালীতে মুসলমানের প্রভাব প্রবেশ করেছে, চিন্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সর্বতোভাবে প্রবল হয় নি, তারই প্রমাণ দেখি সাহিত্যে। তখনকার ভদ্রসমাজে সর্বত্রই প্রচলিত ছিল পার্সি, তবু বাংলা কাব্যের প্রকৃতিতে এই পার্সি বিচার স্বাক্ষর পড়ে নি— একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিভাসচন্দ্র মার্জিত ভাষায় ও অখ্যলিত ছন্দে যে নাগরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে পার্সি-পড়া স্মিতপরিহাসপটু বৈদম্ব্যের আভাস পাওয়া যায়। তখনকার বাংলা সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ ছিল; এক মঙ্গলকাব্য, আর-এক বৈষ্ণব পদাবলী। মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের বিবরণ আছে, কিন্তু তার বিষয়বস্তু কিম্বা মনস্তত্ত্বে মুসলমান সাহিত্যের কোনো ছাপ দেখি নে, বৈষ্ণব গীতিকাব্যে তো কথাই নেই। অথচ বাংলা ভাষায় পার্সি শব্দ জমেছে বিস্তর, তা ছাড়া সেদিন অস্তুত শহরে রাজধানীতে পারসিক আদবকায়দার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ-ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয়, কিন্তু তা সামান্য। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপরে খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্গমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। তারা ঘরে এসে ঘর দখল করে বসল, বহু করে দিলে বাহিরের দিকে দরজা। মাঝে মাঝে সেই দরজা-তাঙাতাঙি চলেছিল, কিন্তু এমন কিছু ঘটে নি যাতে বাহিরের বিশ্বে আমাদের পরিচয় বিস্তারিত হতে পারে।

কালান্তর

সেইঅন্ত পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আগর ।

তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মাহুবরূপে নয়, নব্য যুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে । মাহুব জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে বনকে । আজ মুসলমানকে আমরা দেখি সংখ্যারূপে ; তারা সম্প্রতি আমাদের রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ঘটিয়েছে যোগ-বিয়োগের সমস্তা । অর্থাৎ এই সংখ্যা আমাদের পক্ষে গুণের অঙ্কফল না কবে ভাগেরই অঙ্কফল কবছে । দেশে এরা আছে অথচ রাষ্ট্রজাতিগত ঐক্যের হিসাবে এরা না থাকার চেয়েও দক্ষিণতর, তাই ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাতালিকাই তার অতি-বহুলত্ব নিয়ে সব চেয়ে শোকাবহ হয়ে উঠল ।

ইংরেজের আগমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার । মাহুব হিসাবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু যুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর-কোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি । যুরোপীয় চিন্তের অক্ষয়শক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে ; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চারণ করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে । এই চেষ্টা যে ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্তযোগিতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম । আমরা যুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি, তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার ক'রে আজকাল কোনো কোনো সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উত্তত করে নিগুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন । একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত যুরোপের মনে বধন প্রতিহত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্যঅষ্টাদের মনে তার প্রভাব

কালান্তর

যে নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছুই আশ্চর্যের কথা নয়, না হলেই সেই দৈন্তকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না— এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিন্তা বেঁচে আছে, চিন্তা জেগে আছে।

বর্তমান যুগের চিন্তার জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাসিত, দেখা যাক তার স্বরূপটা কী। একটা প্রবল উত্তমের বেগে যুরোপের মন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে— শুধু তাই নয়, সমস্ত জগতে। যেখানেই সে পা ঝড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলো, কল্পনার কুহকে, আপাতপ্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পাণ্ডিত্যের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি; মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা বিশ্বাস করে নিশ্চিত থাকতে চায় তার প্রলোভনকেও সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিগত, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নিমুক্ত।

যদিও আমাদের চার দিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্ভূত করে আছে, তবু তার মধ্যে ঝাঁক করে যুরোপের চিন্তা আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ; মানুষের বুদ্ধির এমন একটা সর্বব্যাপী ঔৎসুক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে যা অহৈতুক আগ্রহে নিকটতম-দূরতম অণুতম-বৃহত্তম প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সমস্তকেই সন্ধান, সমস্তকেই অধিকার করতে চায়; এইটে দেখিয়েছে যে, জ্ঞানের রাজ্য কোথাও ঝাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোনো বিশেষ বাক্য বিশ্বের কুস্তম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত

কালান্তর

প্রমাণিকতা দাবি করতে পারে না।

বিষতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি-ভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না। ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা-অপরাধের পংক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোনো মুনিঋষির অনুশাসন স্তায়-অস্তায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না।

সমাজে উচিত-অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারা-যোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটতে পারবে না, এ কথাটা এখনো আমরা সর্বত্র অন্তরে অন্তরে মেনে নিতে পেরেছি তা নয়, তবু আমাদের চিন্তায় ও ব্যবহারে অনেকখানি বিপ্লব এনেছে সন্দেহ নেই। সমাজ বাদের অস্পৃশ্যশ্রেণীতে গণ্য করেছে তাদেরও আজ দেবালয়-প্রবেশে বাধা দেওয়া উচিত নয়, এই আলোচনাটা তার প্রমাণ। যদিও এক দল লোক নিত্যধর্মনীতির উপর ভর না দিয়ে এর অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থন আওড়াচ্ছেন, তবু সেই আশুবাক্যের ওকালতিটাই সম্পূর্ণ জোর পাচ্ছে না। আসল এই কথাটাই দেশের সাধারণের মনে বাজছে যে, যেটা অন্তায় সেটা প্রথাগত শাস্ত্রগত বা ব্যক্তিগত গায়ের জোরে শ্রেয় হতে পারে না, শংকরাচার্য উপাধিধারীর স্বরচিত মার্কা সম্বন্ধেও সে প্রচেষ্টা নয়।

মুসলমান-আমলের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি করলে দেখা যায় যে, অবাধে অন্তায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ এই বিশ্বাসটা কল্পিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে। তখনকার দিনে যেমন অত্যাচারের দ্বারা প্রবল ব্যক্তি আপন শাসন পাকা করে তুলত, তেমনি করে অন্তায়ের বিত্তীষিকার দেবদেবীর প্রতিপত্তি আমরা কল্পনা করেছি। সেই নির্ভর বলের হার-জিতেই তাঁদের শ্রেষ্ঠতা-অশ্রেষ্ঠতার প্রমাণ হত।

কালান্তর

ধর্মের নিয়ম যেনে চলবে সাধারণ মানুষ, সেই নিয়মকে লঙ্ঘন করবার চূড়ান্ত অধিকার অসাধারণের। সন্ধিপত্রের শর্ত অমুগারে আপনাকে সংযত করা আবশ্যিক সত্যরক্ষা ও লোকস্থিতির খাতিরে, কিন্তু প্রতাপের অভিমান তাকে ক্র্যাপ্, অফ্, পেপারের মতো ছিন্ন করবার স্পর্ধা রাখে। নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে এক দিন ঈশ্বরদেবের লক্ষণ বলে মানুষ স্বীকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত 'দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা' এই কথাটার অর্থ এই যে, জগদীখরের জগদীখরতা তাঁর অপ্রতিহত শক্তির প্রমাণে, জায়গরতার বিধানে নয়, সেই পছার দিল্লীখরও জগদীখরের তুল্য খ্যাতির অধিকারী। তখন ব্রাহ্মণকে বলেছে ভূদেব, তার দেবদেব মহাদেবের অপরিহার্য দারিদ্র নেই, আছে অকারণ শ্রেষ্ঠতার নিরর্থক দাবি। এই অকারণ শ্রেষ্ঠতা জায়-অজায়ের উপরে; তার প্রমাণ দেখি স্বতিশাস্ত্রে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণ করবার অব্যাহত অধিকারে। ইংরেজ-সাম্রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই; কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না যে, উইলিঙডনো বা জগদীখরো বা। তার কারণ আকাশ থেকে বোমাবর্ষণে শত্রুপল্লী-বিধ্বংসনের নির্মম শক্তির দ্বারা ঈশ্বরদেবের আদর্শের তুল্যতা আজ কেউ পরিমাপ করে না। আজ আমরা মরতে মরতেও ইংরেজ-শাসনের বিচার করতে পারি জায়-অজায়ের আদর্শে; এ কথা মনে করি নে, কোনো দোহাই পেড়ে শক্তিমানকে অসংযত শক্তি সংহরণ করতে বলা অশক্তের পক্ষে স্পর্ধা। বস্তুত জায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা স্বীকার ক'রে এক জায়গার ইংরেজ-রাজের প্রভূত শক্তি আপনাকে অশক্তের সমানভূমিতেই দাঁড় করিয়েছে।

যখন প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অতিনব রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অজায় দূর করবার আশ্রয়; তখন

কালান্তর

পেরেছিলেন রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খল-মোচনের ঘোষণা ; দেখেছিলেন বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, অনাগত নিত্যবিধানে বা পূর্বঅন্যায়িত কর্কশে বিশেষ জাতির মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য ; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে অন্তঃপরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার অন্তে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে ; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পারে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি। যুরোপের সংস্রব এক দিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্য-কারণবিধির সার্বভৌমিকতা ; আর-এক দিকে জ্ঞান-অজ্ঞানের সেই বিস্তৃত আদর্শ বা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে ঋণ্ডিত হতে পারে না। আজ আমরা সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের রাষ্ট্রজাতিক অবস্থা-পরিবর্তনের অন্তে যে-কোনো চেষ্টা করছি সে এই তত্ত্বের উপরে দাঁড়িয়ে, এবং যে-সকল দাবি আমরা কোনো দিন যোগল-সম্মাটের কাছে উত্থাপন করবার কল্পনাও মনে আনতে পারি নি তাই নিয়ে প্রবল রাজশাসনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বিরোধ বাধিয়েছি এই তত্ত্বেরই জোরে, যে তত্ত্ব কবিবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে : A man is a man for a' that.

আজ আমার বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে, অর্থাৎ বাক্যে যুরোপীয় যুগ বলতেই হবে, সেই যুগে যখন প্রথম প্রবেশ করলুম

কালান্তর

সময়টা তখন আঠোরো শো খুস্টাকের মাঝামাঝি। এইটিকে ভিক্টোরীয় যুগ নাম দিয়ে এখনকার যুবকেরা হাসাহাসি করে থাকে। যুরোপের বে অংশের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ, সেই ইংলণ্ড তখন ঐশ্বৰ্যের ও রাষ্ট্রীয় প্রতাপের উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। অনন্ত কালে কোনো ছিঁড় দিয়ে তার অন্নভাঙারে যে অলক্ষী প্রবেশ করতে পারে, এ কথা কেউ সেদিন মনেও করে নি। প্রাচীন ইতিহাসে যাই ঘটে থাকুক, আধুনিক ইতিহাসে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কর্ণধার তাদের সৌভাগ্য যে কোনোদিন পিছু হঠতে পারে, বাতাস বইতে পারে উন্টে দিকে, তার কোনো আশঙ্কা ও লক্ষণ কোথাও ছিল না। রিফর্মেশন-যুগে, ফ্রেন্স-রেভোল্যুশন-যুগে যুরোপ যে মতবাতস্তোর অস্ত্রে, ব্যক্তিবাতস্তোর অস্ত্রে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাটসিনি-গারিবাল্ডির বানীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত ক'রে মজ্জিত হয়েছিল গ্যাড্‌স্টোনের বক্তব্য। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসনকর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম? কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি? মানুষের মূল্য, মানুষের অঙ্কুরতা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিকার? অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাভাব্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে স্তায়সংগত ব্যবহারের সমান-অধিকার-ভঙ্গ, এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারে

কালান্তর

নি। তা হোক, আচরণে পদে পদে প্রতিবাদ সত্ত্বেও যুরোপের প্রভাব
অল্পে অল্পে আমাদের মনে কাজ করছে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সত্ত্বেও ঠিক
সেই একই কথা। পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের ঘরে,
কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঞ্জিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি। তবু
যুরোপের বিজ্ঞা প্রতিবাদের মধ্য দিয়েও আমাদের মনের মধ্যে সম্মান
পাচ্ছে।

তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ যুরোপের সঙ্গে আমাদের
গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিন্তের,
আমাদের শিকার অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব। এই
সহযোগ সহজ হয়, যদি আমাদের শ্রদ্ধায় আঘাত না লাগে। পূর্বেই
বলেছি, যুরোপের চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ
হয়েছিল; দেখেছিলাম জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুরোপ মানুষের মোহমুক্ত বুদ্ধিকে
শ্রদ্ধা করেছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে তার ভারসংগত
অধিকারকে। এতে ক'রেই সকলপ্রকার অত্যাধিকার সত্ত্বেও আমাদের
আত্মসম্মানের পথ খুলে গিয়েছে। এই আত্মসম্মানের গৌরববোধেই
আজ পর্যন্ত আমরা স্বজাতি সত্ত্বে চুঃসাধ্যসাধনের আশা করছি, এবং
প্রবল পক্ষকে বিচার করতে সাহস করছি সেই প্রবল পক্ষেরই বিচারের
আদর্শ নিয়ে। বলতেই হবে, এই চিন্তাগত চরিত্রগত সহযোগ ছিল না
আমাদের পূর্বতন রাজদরবারে। তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সেই
মূলগত দূরত্ব ছিল যাতে ক'রে আমরা আকস্মিক শুভাদৃষ্টক্রমে
শক্তিশালীর কাছে কদাচিৎ অসুগ্রহ পেতেও পারতুম, কিন্তু সে তারই
নিজগুণে; বলতে পারতুম না যে, সর্বজনীন ভারধর্ম অসুগারেই, মানুষ
ব'লেই মানুষের কাছে আত্মকুল্যের দাবি আছে।

ইতিমধ্যে ইতিহাস এগিয়ে চলল। বহু কালের স্তম্ভ এশিয়ার দেখা
দিল আগরণের উত্তম। পাশ্চাত্যেরই সংঘাতে সংস্রবে জাপান অতি

কালান্তর

অল্প কালের মধ্যেই বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জয় করে নিলে সম্মানের অধিকার। অর্থাৎ জাপান বর্তমান কালের মধ্যেই বর্তমান, অতীতে ছায়াচ্ছন্ন নয়, সে তা সম্যক্রূপে প্রমাণ করল। দেখতে পেলেম, প্রাচ্য জাতিরা নবযুগের দিকে যাত্রা করেছে। অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে, আমাদেরও রাষ্ট্রজাতিক রথ চলবে সামনের দিকে; এবং এও মনে ছিল যে, এই চলার পথে টান দেবে স্বয়ং ইংরেজও। অনেক দিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম, চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুরূহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ-সাধন কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে তার যে সম্ভাবনা আছে তাও দেখতে পাই নে, কেননা দেশের সম্বল সমস্তই তুলিয়ে গেল ল এবং অর্ডরের প্রকাণ্ড কবলের মধ্যে। যুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে যুরোপেরই সংস্রবে। নবযুগের সূর্যমণ্ডলের মধ্যে কলঙ্কের মতো রয়ে গেল ভারতবর্ষ।

আজ ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকার কাছে ঋণী। ঋণের অঙ্ক খুব মোটা। কিন্তু, এর বিগুণ মোটাও যদি হত তবু সম্পূর্ণ শোধ করা অসাধ্য হত না, দেনদার দেশে যদি কেবলমাত্র ল এবং অর্ডর বজায় রেখে তাকে আর-সকল বিষয়ে বঞ্চিত রাখতে আপত্তি না থাকত— যদি তার অন্নসংস্থান রহিত আধ-পেটা পরিমাণ, তার পানযোগ্য জলের বরাদ্দ হত সমস্ত দেশের তৃষ্ণার চেয়ে বহুগুণ স্বল্পতর, যদি দেশে শতকরা পাঁচ-সাত জন মানুষের মতো শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও চলত, যদি চিরস্থায়ী রোগে প্রজনাসুক্রমে দেশের হাড়ে হাড়ে দুর্বলতা নিহিত করে দেওয়া গড়েও নিশ্চেষ্টপ্রায় থাকত তার আরোগ্যবিধান। কিন্তু, যেহেতু জীবনযাত্রার সত্য আদর্শ বজায় রাখবার পক্ষে এ-সকল অস্তাব একেবারেই যাবতীয়,

কালান্তর

এইমতে পাণ্ডানাদারকে এমন কথা বলতে শুনলুম যে, 'আমরা দেনাশোধ করব না।' সভ্যতার দোহাই দিয়ে ভারতবর্ষ কি এমন কথা বলতে পারে না যে, 'এই প্রাণ-দেউলে-করা তোমাদের জ্বলন্ত শাসনতন্ত্রের এত অসহ্য দেনা আমরা বহন করতে পারব না যাতে বর্ষরদশার অগঙ্গল পাথর চিরদিনের মতো দেশের বুকের উপর চেপে থাকে।' বর্তমান যুগে যুরোপ যে সভ্যতার আদর্শকে উদ্ভাবিত করেছে যুরোপই কি স্বহস্তে তার দাবিকে ভূমণ্ডলের পশ্চিম সীমানাতেই আবদ্ধ করে রাখবে? সর্বজনের সর্বকালের কাছে সেই সভ্যতার মহৎ দায়িত্ব কি যুরোপের নেই।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, যুরোপের বাইরে অনাশ্রয়মণ্ডলে যুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার অন্তে নয়, আগুন লাগাবার অন্তে। তাই এক দিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড এক সঙ্গে বর্ষিত হল চীনের মর্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এমন সর্বনাশ আর কোনো দিন কোথাও হয় নি— এক হয়েছিল যুরোপীয় সভ্যজাতি যখন নবাবিকৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়ী' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল; তার বেদনা অনতিকাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য যুরোপ চীনের মতো এত বড়ো দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জরিত হয়ে গেল। একদিন তরুণ পারসিকের দল দীর্ঘকালের অসাড়তার জাল থেকে পারস্তকে উদ্ধার করবার অন্তে যখন প্রাণপণ করে দাঁড়িয়েছিল, তখন সভ্য যুরোপ কিরকম করে ছুই হাতে তার টুঁটি চেপে ধরেছিল, সেই অমার্জনীয় শোকাবহ ব্যাপার জানা যায় পারস্তের তদানীন্তন পরাহত আমেরিকান রাজস্বসচিব গুস্টারের *Strangling of Persia* বইখানা পড়লে। ও দিকে আফ্রিকার কনুগো প্রদেশে যুরোপীয় শাসন যে কিরকম অকথ্য বিভীষিকার

কালান্তর

পরিণত হয়েছিল সে সকলেরই জানা। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাতি সামাজিক অসম্মানে লাহিত, এবং সেই-জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীবিত অবস্থায় দাহ করা হয় তখন খেতচর্মী নর-নারীরা সেই পাশব দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে ভিড় ক'রে আসে।

তার পরে মহাবুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে। যেন কোন্ মাতালের আক্রমণে গেল যুচে। এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহুপূর্বকার অন্ধ যুগে কণকালের জন্মে হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করে নি। তারা আগত কালো আধির মতো ধুলায় আপনাকে আবৃত করে; কিন্তু এ এসেছে যেন অগ্নিগিরির আগ্নেয়শ্রব, অবক্রম পাপের বাধায়ুক্ত উৎস-উচ্ছ্বাসে দিগুদিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে', দগ্ধ ক'রে দিয়ে দূরদূরান্তের পৃথিবীর শ্রামলতাকে। তার পর থেকে দেখছি যুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্ভত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে। একদা ইংরেজের সংস্রবে আমরা যে যুরোপকে জানতুম, কুৎসিতের সঙ্কে তার একটা সংকোচ ছিল; আজ সে লজ্জা দিচ্ছে সেই সংকোচকেই। আজকাল দেখছি, আপনাকে ভদ্র প্রমাণ করবার জন্যে সভ্যতার দায়িত্ববোধ যাচ্ছে চলে। অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখা দিচ্ছে প্রকাশে বুক ফুলিয়ে। সভ্য যুরোপের সর্দার-পোড়ো আপনাকে দেখলুম কোরিয়ার, দেখলুম চীনে; তার নিষ্ঠুর বলদৃষ্ট অধিকারলক্ষ্যনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্তে নজির বের করে যুরোপের ইতিহাস থেকে। আরলও রক্তপিঙ্গলের যে উন্নত বর্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্বেও আমরা তা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারতুম না। তার পরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিতীষিকা। যে যুরোপ এক দিন তৎকালীন তুর্কিকে অমাবু্য ব'লে

কালান্তর

গল্পনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ক্যাঙ্গিঞ্জের নির্বিচার নিদারুণতা। এক দিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি যুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত শ্রেয়ো-বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করবার কথা অল্পবয়সে আমরা যুরোপের বেদী থেকে স্তনতে পেতুম, আজ সেখানে যারা খৃস্টের উপদেশকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করে, যারা শত্রুকেও হিংসা করা মনে করে অধর্ম, তাদের কী দশা ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত থেকে কিয়দংশ উদ্ভূত করে দিচ্ছি।

যুদ্ধবিরোধী ফরাসী যুবক রেনে রেইমঁ লিখছেন—

So after the war I was sent to Guiana.... Condemned to fifteen years' penal servitude I have drained to the dregs the cup of bitterness, but the term of penal servitude being completed, there remains always the accessory punishment—banishment for life. One arrives in Guiana sound in health, young, vigorous, one leaves (if one leaves), weakly, old, ill... One arrives in Guiana honest— a few months later one is corrupted... They (the transportees) are an easy prey to all the maladies of this land— fever, dysentery, tuberculosis and most terrible of all, leprosy.

পোলিটিকাল মতভেদের জন্মে ইটালি যে স্বীপান্তরবাসের বিধান করেছে, সে কিয়কম হুঃসহ নরকবাস সে কথা সকলেরই জানা আছে। যুরোপীয় সভ্যতার আলোক যেসব দেশ উজ্জ্বলতম ক'রে জালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে এমন অকস্মাৎ, এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে, এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধপরবর্তীকালীন যুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চার দিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এই

কালান্তর

কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ । মানুষের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে ? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা ? কিন্তু সেই নৈরাশ্রের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, ছুর্গতি যতই উচ্চতভাবে ভয়ংকর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি 'তুমি অশ্রদ্ধেয়', অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত', বলবার জন্তে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়— এই তো সকল ছুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা । আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারি নে, দিল্লীখরো বা জগদীখরো বা । বলতে পারি নে, তেজীমান যে তার কিছুই দোষের নয় । বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয় । যে ছুঃখী, যে অবমানিত, সে যেদিন স্ত্রায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে দিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব, এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ বড়া পর্যন্ত দেউলে হল । তার পরে আনুক কল্লাস্ত ।

শ্রাবণ ১৩৪০

বিবেচনা ও অবিবেচনা

বাংলা দেশে এক দিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিল; আমাদের প্রাণের ধারা হঠাৎ অসম্ভব রকম ফুলিয়া উঠিয়া পাড়ি ছাপাইয়া পড়ে আর কি। সেই বেগটা যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার চাকুল্যে কেবল আমাদের কাগজের নৌকাগুলোকে দোলা দেয় নাই, কেবল সত্যতলেই করতালির তুকান উঠিয়া সমস্ত চুকিয়া গেল না।

সেদিন সমাজটাও যেন আগাগোড়া নড়িয়া উঠিল, এমনতরো বোধ হইয়াছিল। এক মুহূর্তেই তাঁতের কাজে ব্রাহ্মণের ছেলেদের বাধা ছুটিয়া গেল; ভদ্রসন্তান কাপড়ের মোট বহিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল; এমন কি, হিন্দু মুসলমানে একত্রে বসিয়া আহার করার আরোজনটাও হয়-হয় করিতে লাগিল।

তর্ক করিয়া এসব হয় নাই— কেহ বিধান লইবার জন্য অধ্যাপক-পাড়ার বাতায়নত করে নাই। প্রাণ জাগিলেই কাহারো পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়; তখন সে চলার পথের সমস্ত বাধাগুলোকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে গভীরভাবে সিঁহুর চন্দন মাখাইতে বসে না, কিম্বা তাহাকে লইয়া বসিয়া বসিয়া স্ননিপুণ তন্ত্র বা সূচাক কবিশ্বের সূত্র বুনানি বিস্তার করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না। যেমনি চলিতে যায় অমনি সে আপনিই বুঝিতে পারে কোন্‌গুলো লইয়া তাহার চলিবে না; তখন যাহা গারে ঠেকে তাহাকেই সমস্ত গা দিয়া সে ঠেলা দিতে শুরু করে। সেই সাবেক পাথরগুলো যখন ঠেলার চোটে টলিতে থাকে তখন বোঝা যায়, প্রাণ জাগিয়াছে বটে; ইহা মারা নহে, স্বপ্ন নহে।

সেই বস্তার বেগ কমিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার মধ্যে যে চলার বঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া আজ আবার বাধি বোলের

কালান্তর

বেড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে।

আজ আবার সমাজকে বাহবা দিবার পালা আরম্ভ হইল। জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেরই জলবাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাহ্ন আছে যে, এখানে রীতি আপনিই নীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া নিজেকে অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিমসমুদ্র-পারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, 'তোমরা মরিতে বসিয়াছ। আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্তু চাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ— তোমরা স্কুলের উপাসক।' এসব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি— ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজ কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলো বলে নিশ্চয় সেগুলো ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা আমাদের দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আন্তিন গুটাইরা যেমন কাজ করিতেছিল তেমনিই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই, ইহারা যে চলিতেছে, ইহারা যে প্রাণবান, তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে— বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রার সংকটের সীমা নাই, সমস্তার গ্রহিও বিস্তর, কিন্তু সকলের

বিবেচনা ও অবিবেচনা

উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এইজন্য ইহারা : নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্রের কথাটাকে লইয়া কণ-কালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর-একটু উত্তেজনার সঞ্চার করে।

আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরাদমে কাজের পথে চলিতাম। কারণ, তাহা হইলে আপনিই বুদ্ধিতে পারিতাম, প্রাণের গতিতে সমস্ত মানিকে ভাসাইয়া লইয়া যার। পক্ষ যখন অচল হইয়া থাকে তখন সেটা নিন্দিত, কিন্তু জোয়ারের গঙ্গাকে পঙ্কিল বলিয়া দোষ দিলেও যাহারা জান করে তাহাদের তাহাতে বাধা হয় না।

এইজন্য, নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই, হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়স্তের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া? তাহাকে পরামর্শ দেওয়া উচিত যে, 'তোমার এই বনেদি স্বাবরত্ব গৌরব করিবার জিনিস নয়, যেমন করিয়া পার একটা কর্মে লাগিয়া যাও।' কিন্তু, এ স্থলে পরামর্শদাতার কাজটা নিরাপদ নহে, বাবুর পারিষদবর্গ তখনই হাঁ-হাঁ করিয়া আসিবে। সুতরাং বকশিসের প্রত্যাশা থাকিলে বলিতে হয়, 'হজুর, আপনি যে সনাতন তাকিয়া ঠেগান দিয়া বসিয়াছেন উহার তুলার স্তূপ জগতে অতুল, অতএব বংশের গৌরব যদি রাখিতে চান তো নড়িবেন না।'

আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি, সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে। এমন স্থলে হয় বলিতে হয় 'খাঁচাটাকে ভাঙো, কারণ ওটা আমাদের ঈশ্বরদত্ত পাখাটাকে অসাড় করিয়া দিল' নমু বলিতে হয়, ঈশ্বরদত্ত পাখার চেয়ে খাঁচার লোহার

কালান্তর

শলাগুলো পবিত্র, কারণ, পাখা তো আজ উঠিতেছে আবার কাল পড়িতেছে, কিন্তু লোহার শলাগুলো চিরকাল স্থির আছে। বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন, অতএব ঐ খাঁচার সীমা-টুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশ-ভরা নিষেধ। খাঁচার মধ্যে যদি নিতান্তই থাকিতে হয় তবে খাঁচার স্তব করিলে নিশ্চয়ই মন ঠাণ্ডা থাকে।

আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অল্প সকল গান ভুলিয়াছি, কেননা অল্পথা করিলে বিপদের অস্ত্র নাই। আমাদের এখানে সকল দিকেই ঐ কামারেরই হইল জয়; আর সব চেয়ে বিড়ম্বিত হইলেন বিধাতা, যিনি আমাদেরকে কর্মশক্তি দিয়াছেন, যিনি মানুষ বানিয়া আমাদেরকে বুদ্ধি দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

যাঁহারা বলিতেছেন, যেখানে যাহা আছে সমস্তই বজ্রের থাক, তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য— কারণ, তাঁহাদের বয়স অল্পই হউক আর বেশিই হউক, তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। সংসারে তাঁহাদের প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করি না। পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই যেখানে তাঁহারা দণ্ড ধরিয়া বসিয়া নাই। কিন্তু বিধাতার বরে যে সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে সে সমাজে তাঁহাদের দণ্ডই চরম বলিয়া মান পায় না।

সেদিন একটি কুকুরছানাকে দেখা গেল, মাটির উপর দিয়া একটি কীট চলিতেছে দেখিয়া তাহার ভারি কৌতূহল। সে তাহাকে শুঁকিতে শুঁকিতে তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। যেমনি পোকাটা একটু ধড়ফড় করিয়া উঠিতেছে অমনি কুকুরশাবক চমকিয়া পিছাইয়া আসিতেছে।

দেখা গেল, তাহার মধ্যে নিষেধ এবং তাগিদ দুটা অনিসই আছে। প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই যে, সমস্তকেই সে পরা করিয়া দেখে।

বিবেচনা ও অবিবেচনা

নূতন নূতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়ে সে আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া চলিতে চায়। প্রাণ হুঃসাহসিক— বিপদের ঠোকর খাইলেও সে আপনার জয়যাত্রার পথ হঠাতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে চায় না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি প্রবীণতা আছে, বাধার বিকট চেহারা দেখিবা মাত্রই সে বলে, 'কাজ কী!' বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুবাহুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পৃথিবীর আকারে বাধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো', প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই থাক-না'।

অতএব এই প্রবীণতার বিরুদ্ধে আমরা আপত্তি করিবার কে ? আপত্তি করিও না। তাঁহার বৈঠকে তিনি গদিয়ান হইয়া থাকিবেন, সেখান হইতে তাঁহাকে আমরা নড়িয়া বলিতে বলি এমন বেআদব আমরা নই। কিন্তু প্রাণের রাগে তাঁহাকেই একেবারে করিবার যখন যড়যন্ত্র হয় তখনই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া বাহির হইবার দিন আসে। দুর্ভাবনা এবং নির্ভাবনা উভয়কেই আমরা খাতির করিয়া চলিতে রাজি আছি।

প্রাণের রাজ্যাধিকারে এই উভয়েই শরিক বাট, কিন্তু উভয়ের অংশ যে সমান তাহাও আমরা মানিতে পারি না। নির্ভাবনার অংশটাই বেশি হওয়া চাই, নহিলে শ্রোত এতই মন্দ বহে যে শেওলা জমিয়া তলটা চাপা পড়ে। মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যা বেশি হওয়াই কল্যাণের লক্ষণ।

পৃথিবীতে বাঘা আনা জল, চার আনা স্থল। এরূপ বিভাগ না হইলে বিপদ ঘটিল। কারণ, জলই পৃথিবীতে গতিসকার করিতেছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছে। জলই খাতকে সচল করিয়া

কালান্তর

গাছপালা পশুপক্ষীকে স্তম্ভদান করিতেছে। জলই সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিতেছে, মগ্নিনকে ধৌত করিতেছে, পুরাতনকে নূতন ও শুককে সরস করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর উপর দিয়া যে জীবের প্রবাহ নব নব ধারায় চলিয়াছে তাহার মূলে এই জলেরই ধারা। স্থলের একাধিপত্য যে কী ভয়ংকর তাহা মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। তাহার অচলতার তলে কত বড়ো বড়ো শহর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে পুরাতন পথ বাহিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে জাপানে পণ্য ও চিন্তা-বিনিময় চলিত, এই রুদ্র মরু সে পথের চিহ্ন মুছিয়া দিল; কত যুগের প্রাণচঞ্চল ইতিহাসকে বালু চাপা দিয়া সে কঙ্কালসার করিয়া দিয়াছে। উলঙ্গ ধূর্জটি সেখানে একা স্থাগু হইয়া উর্ধ্বনেম্রে বসিয়া আছেন; উমা নাই। দেবতারা তাই প্রমাদ গণিতেছেন— কুমারের জন্ম হইবে কেমন করিয়া? নূতন প্রাণের বিকাশ হইবে কী উপায়ে?

জোর করিয়া চোখ বুজিয়া যদি না থাকি, তবে নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহারাি দেখিতে পাইব। এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে— এ যে পক্ষকেশের স্তম্ভ মরুভূমি। এখানে এক কালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সম্ভব হইয়া, সচল হইয়া, কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর-এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে— মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের, সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্ কালে বালু চাপা পড়িয়া গেছে। এখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর ছোটো একটা ভাঙা টুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহাগহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিনীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে; কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই।

বিবেচনা ও অবিবেচনা

সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সঙ্ঘর্ষ কী ? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাঠতেছে।

চারি দিক এমনি নিস্তরক নিশ্চল যে মনে ভ্রম হয়, ইহাই সনাতন। কখনোই নহে, ইহাট নূতন। এই মরুভূমি সনাতন নহে, ইহার বহু পূর্বে এখানে প্রাণের নব নব লীলা চলিত— সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প সাহিত্য, রাজ্য সাম্রাজ্য, কত ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লব তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কিছু না করিয়া একবার মহাভারতটা পড়িয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা ও কারিগরের ছাপ-মারা সামগ্রী ছিল না— তাহাতে বিধাতার নিজের সৃষ্টির সমস্ত লক্ষণ ছিল, কেননা তাহাতে প্রাণ ছিল। তাহা নিখুঁত নয়, নিটোল নয় ; তাহা সজীব, তাহা প্রবল, তাহা কোতূহলী, তাহা দুঃসাহসিক।

ইজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে সমস্ত 'মমি' মৃত্যুকে অমর করিয়া দাত মেলিয়া জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে তাহাদিগকেই কি বলিবে সনাতন ? তাহাদের সিন্ধুকের গায়ে বসত প্রাচীন তারিখের চিহ্নই খোদা থাক-না কেন, সেই ইজিপ্টের নীলনদীর পলিপড়া মাঠে আজ যে 'ফেলাহীনু' চাষা চাষ করিতেছে তাহারই প্রাণ যথার্থ সনাতন। মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই ; আগে প্রাণ, তাহার পরে মৃত্যু। যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরস্থান চলার যোগ আছে— যাহা ধামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আজ ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে ; তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্ভম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার

কালান্তর

করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি, জগতে আমাদের মতো সনাতন আর-কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো শুষ্কও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে, সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই ছুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির ছুঃসাহস, বুদ্ধির ছুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার ছুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে; বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া, অন্ধ সংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে; ব্যাধি দৈন্ত্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে ছুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যতলে মৃত্যুর স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগযুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

এই ছুঃসাহসের মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচনা আছে। আজ যাহারা আকাশযানে উড়িতে উড়িতে আকাশ হইতে পড়িয়া চূরনার হইয়া মরিতেছে তাহাদের মধ্যে সেই চূরস্ত অবিবেচনা কাজ করিতেছে। এমনি করিয়াই এক দিন যাহারা সমুদ্র পার হইবার সাধনা করিতে করিতে হাজার হাজার জলে ডুবিয়া মরিতেছে, সেই অবিবেচনাই তাহাদিগকে তাড়া করিয়াছিল। সেই চূর্ধর্ষ অবিবেচনার উত্তেজনাতেই আজও মানুষ ভূষারদৈত্যের পাহারা এড়াইয়া কখনো উত্তরমেরু, কখনো দক্ষিণমেরুতে কেবলমাত্র দিগ্বিজয় করিবার জন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। এমনি করিয়া যাহারা নিতান্ত লক্ষীছাড়া তাহারা লক্ষীকে ছুর্গম অন্তঃপুর

বিবেচনা ও অবিবেচনা

হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

এই ছুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। বাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত, এ কথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশাস্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া, কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অস্ত্র নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া দেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা ছুঃখ পায়, ছুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্মলক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপনায় গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনায় তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে— সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐসকল প্রাণবহন ছরস্তু ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা— শুইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। বাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই বাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য ছরস্তু হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এইপ্রকার হতবুদ্ধি হতোত্তম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে

কালান্তর

ওঠবোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলোকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল। ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর-কোথায় ঘটিয়াছে ?

তবু হাজার হইলেও যাহাদের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আছে তাহাদিগকে সকল দিক হইতে চাপিয়া পিষিয়াও তাহাদের তেজ একেবারে নষ্ট করা যায় না। এইজন্য আর কোনো কাজ না পাইয়া সেই উন্মত্ত, সেই তেজ তাহারা সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবলবেগে খাটাইতে থাকে। স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সবাগ্রে চলার পথে ছুটিত, তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

ইহারা কুস্তীম্মত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল, কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যাহাদের কথা বলিতেছি তাঁহারা স্বভাবতই চলিয়ু, কিন্তু এ দেশে জন্মিয়া সে কথাটা তাঁহারা একবারেই ভুলিয়া বসিয়াছেন— এইজন্য যাহারা ঠিক তাঁহাদের এক দলের লোক তাঁহাদের সঙ্গেই অহরহ হাতাহাতি করিতে পারিলে ইহারা আর কিছু চান না।

এই শ্রেণীর লোক আজকাল অনেক দেখা যায়। ইহারা ভাল ঠুকিয়া বলেন, 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।' আক্ষেপ করিয়া বলেন, 'আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে

বিবেচনা ও অবিবেচনা

পারি না ।' অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া, তাহাকে সৰু মোটা হাজার বাধনে বাঁধিয়া, মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া, একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ হইয়াই। বলেন, এ ঘানি সনাতন, হইবার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শাস্ত হইয়া যায়। হইয়া প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ নিবৃত্তির জন্ত লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয়, সেজন্ত হইয়া ভয়ংকর ব্যস্ত।

কিন্তু পারিয়া উঠিবেন না। অস্থিরতার বিরুদ্ধে যে চাকলা ঈহাদিগকে এমন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, সেটা দেশের নাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা নিজেই। সকালবেলায় জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ কেহ ঘরে আলো আসিতেছে বলিয়া বিদ্রক্ত হইয়া ছুড়নাড়ু শব্দে ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিতে চায় তবে নিশ্চয় আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে ছুই দলই আগে, এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে আশার কথা।

যাহারা দেশকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অনেক দিন একাধিপত্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই একেধর রাজত্বের কীর্তিগুলি চারি দিকেই দেখা যাইতেছে; তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই রাগারাগি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, দেশের নববৌবনকে তাঁহারা আর নির্দাসিত করিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থাকুন, আর বাকি সবাই পথে ঘাটে বাহির হইয়া পড়ুক। সেখানে তাকুণের জয় হউক। তাহার পায়ের তলার জঙ্গল মরিয়া যাক, জঙ্গাল সরিয়া যাক, কাঁটা দলিয়া যাক, পথ খোলসা হউক; তাহার অবিবেচনার উচ্ছত বেগে অসাধ্যসাধন হইতে থাক।

চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও

কালান্তর

আবশ্যিক। কিন্তু, অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনা করিতেও অধিকার দিব না— মানুষকে বলিব 'তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেবলমাত্র ঘানি চালাও', এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস, সে ফুল স্মরণ, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমর-গুঞ্জে নহে কিন্তু পখিকদলের অক্রান্ত পদধ্বনিত্তেই রমণীয়।

বৈশাখ ১৩২১

লোকহিত

লোকসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ আমাদের দেশে আছে এটা আমরা কিছুদিন হইতে আন্দাজ করিতেছি এবং 'এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত' হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে, ভাবনার অন্তই ভাবনা হয়।

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না, ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনো দিন কোনো বর্ধার্থ হিতকে তিক্ত-রূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু, আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মন্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজদেরও হিত করি না।

(হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়) মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অর্থাৎ তাহাকে প্রীতি না করা।

এ কথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ—যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্ঠা।

কালান্তর

মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ, এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে রাস্তা দিবে চলে মানুষ সে রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে, স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত। ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে শ্রুদ দিতে হয়; সে শ্রুদ আমলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে শ্রুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান; সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে, সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য, লোকহিত করার লোকের বিপদ আছে, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই, তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।

অল্প দিন হইল, এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল, সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, তাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।

সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। এক দিনের জন্তও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিহু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি ব' তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না— সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে

লোকহিত

আমরা তাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বৃকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারেনা ।

এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই— সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যক্ষগোচর না করা । ধনী দরিদ্রে পার্থক্য আছে কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যাগ করিয়া তোলে, তবে আর বাই হউক, দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বৃকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য, না হয় শোভন ।

হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআক্র করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু বঙ্গদেশী-প্রচারক এক ঘাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া বাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই । কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে মানুষ মানুষকে ঠেলিয়া রাখে, অপমানও করে— তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না । কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে, তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না ; কিন্তু সামাজিকতার মূলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শকু হয় । 'আমরা বিদ্যালয়ে ও আপিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি ; সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে তাহা মানি, তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, হৃদয়ে লাগে না । কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না, হৃদয়ে লাগে । কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরস্পরের পার্থক্যের উপর শ্রোভন সামঞ্জস্যের আন্তরণ বিছাইয়া দেওয়া ।

কালান্তর

বঙ্গবিচ্ছেদ বাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যত দূর পর্যন্ত অখণ্ড তত দূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনার আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনো দিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।

সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপখননেরও চেষ্টা করি নাই— আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধুলাই উড়িল, তখন আমাদের বিশ্বয়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপখননের কথা ভুলিয়া আছি। আরো বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সে ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।

লোকসাধারণের সম্বন্ধেও আমাদের ভ্রমসম্প্রদায়ের ঠিক ঐ অবস্থা। তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে অপমানিত করা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভ্রমলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। বাংলাদেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা যে বাড়িয়া গিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ, হিন্দু ভ্রমসমাজ এইশ্রেণীদিগকে হৃদয়ের সহিত আপন বলিয়া টানিয়া রাখে নাই।

আমাদের সেই মনের ভাবের কোনো পরিবর্তন হইল না, অথচ এই শ্রেণীর হিতসাধনের কথা আমরা কখনো আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই এ কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই।

লোকহিত

এক দিন যখন আমরা দেশহিতের কথা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা আর কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল। সেদিন আমরা যুরোপের নকলে দেশহিত শুরু করিয়াছিলাম, অস্তরের একান্ত তাগিদে নয়। আজও আমরা লোকহিতের অন্ত যে উৎসুক হইয়া উঠিয়াছি তাহার মধ্যে অনেকটা নকল আছে। সম্প্রতি যুরোপে লোকসাধারণ সেখানকার রাষ্ট্রীয় রক্তভূমিতে প্রধান নায়কের সঙ্গে দেখা দিয়াছে। আমরা দর্শকরূপে এত দূরে আছি যে, আমরা তাহার হাত-পা নাড়া যতটা দেখি তাহার বাণীটা সে পরিমাণে শুনিতে পাই না। এইজন্যই নকল করিবার সময় ঐ অঙ্গ-ভঙ্গীটাই আমাদের একমাত্র মডেল হইয়া উঠে।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে সেটা জানা চাই।

যুরোপে খাহারা এক দিন বিশিষ্টসাধারণ বলিয়া গণ্য হইত তাহার সেখানকার কত্রিয় ছিল। তখন কাটাকাটি মারামারির অন্ত ছিল না। তখন যুরোপের প্রবল বহিঃশত্রু ছিল মুসলমান; আর ভিতরে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো পরস্পরের গায়ের উপর পড়িয়া কেবলই মাথা-ঠোকাঠুকি করিত। তখন দুঃসাহসিকের দল চারি দিকে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া বেড়াইত— কোথাও শাস্তি ছিল না।

সে সময়ে সেখানকার কত্রিয়েরাই ছিল দেশের রক্ষক। তখন তাহাদের প্রাধান্ত স্বাভাবিক ছিল। তখন লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যে মিল ছিল সেটা কৃত্রিম নহে। তাহারাই ছিল রক্ষাকর্তা এবং শাসনকর্তা। লোকসাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত।

তাহার পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন যুরোপে রাজার জায়গাটা রাষ্ট্রতন্ত্র দখল করিতেছে, এখন লড়াইয়ের চেয়ে নীতিকৌশল প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন পূর্বের চেয়ে

কালান্তর

বাড়িয়াছে বই কমে নাই, কিন্তু এখন যোদ্ধার চেয়ে যুদ্ধবিজ্ঞা বড়ো ; এখন বীর্যের আসনে বিজ্ঞানের অভিষেক হইয়াছে। কাজেই যুরোপে সাবেক কালের ক্ষত্রিয়বংশীয়েরা এবং সেই সকল ক্ষত্রিয়-উপাধিধারীরা যদিও এখনো আপনাদের আভিজাত্যের গৌরব করিয়া থাকে তবু লোকসাধারণের সঙ্গে তাহাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেছে। তাই রাষ্ট্রচালনার কাজে তাহাদের আধিপত্য কমিয়া আসিলেও সেটাকে জাগাইয়া তুলিবার জোর তাহাদের নাই।

শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোকসাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্তীম উৎপন্ন করে।

পূর্বকালের ক্ষত্রিয়নায়কের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ ছিল সেটা ছিল মানবসম্বন্ধ। দুঃখ কষ্ট অত্যাচার যতই থাক, তবু পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের আদান-প্রদানের পথ ছিল। এখন বৈশ্য মহাজনদের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যান্ত্রিক। কর্মপ্রণালী-নামক প্রকাণ্ড একটা জাঁতা মানুষের আর-সমস্তই গুঁড়া করিয়া দিয়া কেবল মজুতটুকু মাত্র বাকি রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ি বই কমে না, কিন্তু ধন তিনিসটাকে পাচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাচজনের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

তাই ধনের বৈষম্য লইয়া যখন সমাজে পার্থক্য ঘটে তখন ধনীরা দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া উঠে তখন বিপদটাকে কোনোমতে ঠেকা দিয়া

লোকহিত

ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।

তাই, ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে ; তাহাদিগকে অন্নব্রহ্ম এটা-ওটা দিয়া কোনোমতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে 'উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও', কেহ বলে 'যাহাতে উহারা ছ চামচ সুপ খাইয়া কাজে বাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো', কেহ বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া খিটখুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ বা আপন উদ্ভূত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।

এমনি করিয়া ধনের প্রকাণ্ড জালের মধ্যে আটকা পড়িয়া লোক-সাধারণ ছটফট করিয়া উঠিয়াছে। ধনের চাপটা যদি এত জোরের সঙ্গে তাহাদের উপর না পড়িত তবে তাহারা জমাট বাঁধিত না— এবং তাহারা যে কেহ বা কিছু তাহা কাহারও খবরে আসিত না। এখন ও দেশে লোকসাধারণ কেবল সেন্সম-রিপোর্টের তালিকাভুক্ত নহে ; সে একটা শক্তি। ~~সে আর তিক্ত করে না, দাবি করে।~~ এইজন্য তাহার কথা দেশের লোকে আর ভুলিতে পারিতেছে না ; সকলকে সে বিষয় ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

এই লইয়া পশ্চিমদেশে নিয়ত যেসব আলোচনা চলিতেছে আমরা তাহাদের কাগজে পত্রে তাহা সবদাই পড়িতে পাই। ইহাতে হঠাৎ এক-একবার আমাদের ধর্মবুদ্ধি চমক খাইয়া উঠে। বলে, তবে তো আমাদেরও ঠিক এইরকম আলোচনা কর্তব্য।

ভুলিয়া যাই, ও দেশে কেবলমাত্র আলোচনার নেশায় আলোচনা নহে, তাহা নিতান্তই প্রাণের দায়ে। এই আলোচনার পশ্চাতে নানা বোঝাপড়া, নানা উপায়-অন্বেষণ আছে। কারণ, সেখানে শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলিতেছে— যাহারা অকমকে অগ্রগ্ৰহ করিয়া চিত্ত-

কালান্তর

বিনোদন ও অবকাশযাপন করিতে চায়, এ তাহাদের সেই বিলাস-কলা নহে।

আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে লোক বলিয়া জানে না, সেইজন্য জানান দিতেও পারে না। আমরা তাহাদিগকে ইংরেজি বই পড়িয়া জানিব এবং অনুগ্রহ করিয়া জানিব, সে জানায় তাহারা কোনো জোর পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজের অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট দুঃখের অন্তর্গত, এইটি জানিতে পারিলে তবে তাহাদের দুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। তখন সমাজ, দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদের কাছে ভাবাইয়া তোলে। অনুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্তমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা যদি আপনার উচ্চতার অভিমানে পুলকিত হইয়া মনে করি যে, ঐসব সাধারণ লোকদের জন্য আমরা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিব তবে এমন জিনিসের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা কুলা ছুঁল্যা হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমরা যেমন অন্য মানুষের হইয়া থাকিতে পারি না, তেমনি আমরা অন্য মানুষের হইয়া বাঁচিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ, তাহা তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা, অর্থাৎ ইহাতে

লোকহিত

ভালো মন মাঝারি সকল জাতেরই জিনিস আছে। ইহার বাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো— জগতের কোনো রসিকসভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব, দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুকব্বিরানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই বাহা-কিছু রচিয়াছেন। যেখানেই হেতু আসিয়া মুকবি হইয়া বসে সেইখানেই সৃষ্টি মাটি হয়। এবং যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড়ো আসনটা লয় সেইখান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে।

আমাদের ভঙ্গমাজ আরামে আছে, কেননা আমাদের লোক-সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই। এইজন্যই জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে গুণিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোস্তাফার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে, আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই। আমরা বড়োজোর ধর্মের দোহাই দিয়া জমিদারকে বলি 'তোমার কর্তব্য করো', মহাজনকে বলি 'তোমার সুদ কমাও', পুলিশকে বলি 'তুমি অন্তায় করিও না'— এমন করিয়া নিতান্ত দুর্বল-ভাবে কত দিন কত দিক ঠেকাইব। চালুনিতে করিয়া জল আনা হইব আর বাহককে বলিব 'যতটা পার তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও'— সে হয় না; তাহাতে কোনো এক সময়ে এক মুহূর্তের কাজ চলে কিন্তু চিরকালের এ ব্যবস্থা নয়। সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি।

অতএব সব-প্রথমে দরকার, লাকেরা আপনাদের পরম্পরের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ দেখিতে পার। অর্থাৎ তাহাদের পরম্পরের মধ্যে একটা রাস্তা থাকি চাই। সেটা যদি রাজপথ না হয় তো অন্তত

কালান্তর

গলিরাস্তা হওয়া চাই।

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা। যদি বলি জ্ঞানশিক্ষা, তাহা হইলে তর্ক উঠিবে, আমাদের চাষাভূষার যাত্রার দল ও কথকঠাকুরের কুপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য। যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্ছ্বাস উঠিবে— সেটাও সহিতে পারিতাম যদি আশু এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা থাকিত।

আমি কিন্তু সব চেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা— সেও পাড়ারগায়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বন্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পার, তাহার আভিনায় হরিনামসংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে, কিন্তু এ কথা তাহার স্পষ্ট বুদ্ধির উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবলমাত্র অধ্যানুযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

দূরের সঙ্গে নিকটের, অমুপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বন্ধপথটা সমস্ত দেশের মধ্যে অবাদে বিস্তীর্ণ হইলে তবেই তো দেশের অমুভব-শক্তিটা ব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে। মনের চলাচল যতখানি মানুষ ততখানি বড়ো। মানুষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই।

তাই আমি এই বলি, লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মানুষ কী শিখিবে ও কতখানি শিখিবে, সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপনি শুনিবে ও আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে, এমনি করিয়া সে যে আপনার মধ্যে বৃহৎ মানুষকে ও বৃহৎ মানুষের মধ্যে আপনাকে পাইবে, তাহার চেতনার অধিকার যে চারি দিকে প্রসৃত হইয়া যাইবে, এইটেই গোড়াকার কথা।

লোকহিত

যুরোপে লোকসাধারণ আজ যে এক হইয়া উঠিবার শক্তি পাইয়াছে তাহার কারণ এ নয় যে, তাহারা সকলেই পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো আমাদের দেশাভিমानीরা প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, পরাধিনা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের চেয়ে বেশি বোঝে। কিন্তু, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, যুরোপের সাধারণ লোকে লিখিতে পড়িতে শিখিয়া পরস্পরের কাছে পৌছিবার উপায় পাইয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়ে গতিবিধির একটা মস্ত বাধা দূর হইয়া গেছে। এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, যুরোপে লোকশিক্ষা আপাতত অগতীর হইলেও তাহা যদি ব্যাপ্ত না হইত তবে আজ সেখানে লোকসাধারণ নামক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া আপন প্রাণ্য দাবি করিতেছে তাহাকে দেখা যাইত না। তাহা হইলে যে গরিব সে কণে কণে ধনীরা প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইত, যে ভূত্ব সে মনিবের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত এবং যে মজুর সে মহাজনের লাভের উচ্ছ্রষ্টকণা মাত্র ধাইয়া কুখাদ্য পেটের একটা কোণ ম'য় ভরাইত।

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, 'আমরা তো সেই কাঙ্ক্ষাই লাগিয়াছি, আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি।' কিন্তু ভিকার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আমরা শুধু লোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটোতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি— সেটা আমাদের দান করা অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। এইজন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো খর্বতা ঘটিলে আমরা উদ্বেজিত হইয়া উঠি। আমরা মাথা তুলিয়া শিক্ষা দাবি করি। সেই দাবি ঠিক গায়ের জোরের নহে, তাহা ধর্মের জোরের। কিন্তু লোকসাধারণেরও সেই জোরের দাবি আছে; যত দিন তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হইতেছে তত দিন

কালান্তর

তাহাদের প্রতি অন্তর জমা হইয়া উঠিতেছে এবং সেই অন্তরের ফল আমরা প্রত্যেকে ভোগ করিতেছি, এ কথা বত কণ পর্যন্ত আমরা স্বীকার না করিব তত কণ দয়া করিয়া তাহাদের অন্ত এক-আধটা নাইট স্কুল খুলিয়া কিছুই হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোকসাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করা।

কিন্তু সমস্তটা এই যে, দয়া করিয়া গণ্য করাটা টেকে না। তাহারা শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য করাইবে সেই দিনই সমস্তার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে তাহাদের নাই তাহার কারণ, তাহারা অজ্ঞতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা, তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয়, তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ-নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে, কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোটো হয়— দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুইচারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিস হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লক্ষ্য রক্ষা করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেটা সত্যকার কারবার হয়। এই সত্যকার কারবারে উত্তর পক্ষেরই মঙ্গল। যুরোপে শ্রমজীবীরা যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার বণিকরা জবাবদিহির দায় পড়িয়াছে। ইহাতেই দুই পক্ষের সম্বন্ধ সত্য হইয়া উঠিবে— অর্থাৎ যেটা বরাবর সহিবে সেইটেই দাঁড়াইয়া যাইবে, সেইটেই উত্তরেরই পক্ষে কল্যাণের। ত্রীলোককে সাধনী রাখিবার

লোকহিত

অল্প পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিক্রমে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে— তাই জ্বীলোকের কাছে পুরুষের কোনো অবাবদিহি নাই— ইহাতেই জ্বীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; জ্বীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের কতি অনেক বেশি। কারণ, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো এমন দুর্গতিকর আর কিছুই নাই। আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছ্বল হইয়া উঠে— এইখানেই মানুষের পতন।

আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজ-পুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে ; ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, শ্রমিকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি ; নিরস্ত্রদের সহিত স্ত্রায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতাই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে— এই নিরস্ত্র সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিরস্ত্রের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে— সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।

ভাদ্র ১৩২১

লড়াইয়ের মূল

অগ্রহায়ণের সবুজপত্রে সম্পাদক বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা পাকা কথা, সুতরাং তাহাতে শাস্ত আছে, রসও আছে। ইহার উপরে আর বেশি কিছু বলিবার দরকার নাই— সেই ভরসাতেই লিখিতে বসিলাম।

সম্পাদক বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, এবারকার যে লড়াই তাহা সৈনিকে বণিক লড়াই, কৃত্রিয় বৈশ্য। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্য-জীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবস্থা আছে— বৈশ্যের কর্তৃত্ব কৃত্রিয় সহিতে পারে না। তাই জার্মানি আপন কৃত্রিমত্বের দর্পে ভারি একটা অবজ্ঞার সহিত এই লড়াই করিতে লাগিয়াছে।

যুরোপে যে চার বর্ণ আছে তার মধ্যে ব্রাহ্মণটি তাঁর যজ্ঞন যাজ্ঞন ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সরিয়া পড়িয়াছেন। যে গুল্মসংঘ বর্তমান যুরোপের শিশু বয়সে উঁচু চৌকিতে বসিয়া বেত হাতে গুরুমহাশয়গিরি করিয়াছে আজ সে তার দয়ঃপ্রাপ্ত শিষ্যের দেউড়ির কাছে বসিয়া থাকে— সাবেক কালের ঋতিরে কিছু তার বরাদ্দ বাধা আছে, কিন্তু তার সেই চৌকিও নাই, তার সেই বেতগাছটাও নাই। এখন তাহাকে এই শিশুটির মন জোগাইয়া চলিতে হয়। তাই যুদ্ধে বিগ্রহে, পরজাতির সহিত ব্যবহারে, যুরোপ যত-কিছু অগ্রায় করিয়াছে গুল্মসংঘ তাহাতে আপত্তি করে নাই, বরঞ্চ ধর্মকথার ফোড়ও দিয়া তাহাকে উপদেশ করিয়া তুলিয়াছে।

এ দিকে কৃত্রিয়ের তলোয়ার প্রায় বেবাক গলাইয়া ফেলিয়া লাঙলের ফলা তৈরি হইল। তাঁই কৃত্রিয়ের দল বেকার বসিয়া বুধা গৌরু চাড়া দিতেছে। তাহারা শেঠজির মালখানার দ্বারে দরওয়ানগিরি করিতেছে মাত্র। বৈশ্যই সব চেয়ে মাথা তুলিয়া উঠিল।

এখন সেই কৃত্রিয় বৈশ্যে 'অস্ত্র যুদ্ধ ঘরা মরা'। দাপর যুগে

লড়াইয়ের মূল

আমাদের হৃদয় বলরামদাদা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন নাই। কলি-যুগে তাঁর পরিপূর্ণ মদের ভাঁড়টিতে হাত পড়িবা যাত্র তিনি হংকার দিয়া ছুটিয়াছেন। এবারকার কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রধান সর্দার কৃষ্ণ নছেন, বলরাম। রক্তপাতে তাঁর রুচি নাই—রক্ততকেনোচ্ছল মদের টোক গিলিয়া এত কাল ধরিয়া তাঁর নেশা কেবলই চড়িয়া উঠিতেছিল; এবারকার এই অচম্কা উৎপাতে সেই নেশা কিছু ছুটিতে পারে, কিন্তু আবার সময়কালে দ্বিগুণ বেগে মৌতাত জমিবে সে আশঙ্কা আছে।

ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে দছিল, সে বৈশ্যে শূদ্র, মহাজনে মজুর—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মজুর পালা শেষ হইয়া নূতন মজুর পড়িবে।

বণিক সৈনিক লড়াই তো বাদিল, কিন্তু এই লড়াইয়ের মূল কোথায় সেটা জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। সাদেক কালের ইতিহাসে দেখা যায়, যারা কারদারী তারা রাজশক্তির আশ্রয় পাইয়াছে, কখনো বা প্রহর পাইয়াছে, কখনো বা অত্যাচার ও অপমান সহিয়াছে, কিন্তু লড়াইয়ের আসরে তাহাদিগকে নামিতে হয় নাই। সেকালে ধন এবং মান স্বতন্ত্র ছিল, কাজেই ব্যবসায়ীকে তখন কেচ ষাতির করিত না, বরঞ্চ অবজ্রাই করিত।

কেননা জিনিস লইয়া মানুষের মূল্য নহে, মানুষ লইয়াই মানুষের মূল্য। তাই যে কালে কত্রিয়েরা ছিল গণপতি এবং বৈশ্যেরা ছিল ধনপতি, তখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল না।

তখন ঝগড়া ছিল ব্রাহ্মণ-কত্রিয়ে। কেননা তখন ব্রাহ্মণ তো কেবল-মাত্র যজ্ঞ-যাজ্ঞন অধ্যয়ন-অধ্যাপন লইয়া ছিল না—মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই কত্রিয়-প্রভু ও ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব সর্বদাই ঠেলাঠেলি চলিত; বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে আপস করিয়া থাকি শক্ত।

কালান্তর

যুরোপেও রাজ্য পোপে বাও-কষাকষির অস্ত ছিল না।

কারবার জিনিসটা দেনাপাওনার জিনিস ; তাহাতে কেতা বিক্রেতা উভয়েরই উভয়ের মন রাখিবার গরজ আছে। প্রভু জিনিসটা ঠিক তার উন্টা, তাহাতে গরজ কেবল এক পক্ষের। তাহাতে এক পক্ষ বোঝা হইয়া চাপিয়া বসে, অন্য পক্ষই তাহা বহন করে।

প্রভু জিনিসটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। এইজন্য প্রভুই যত-কিছু বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূল। বোঝা নামাইয়া ফেলিতে যদি না পারি, অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পান্ডির বেহারা তাই বার বার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুদের বোঝা লইয়া বার বার কাঁধ বদল করিতে হয়— কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষী চঞ্চলা। লক্ষী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

ইতিপূর্বে মানুষের উপর প্রভুচেষ্ঠা ব্রাহ্মণকত্রিয়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল— এই কারণে তখনকার যত-কিছু শস্ত্রের ও শাস্ত্রের লড়াই তাহাদিগকে লইয়া। কারবারীরা হাতে মাঠে গোঠে ঘাটে কিরিয়া বেড়াইত, লড়াইয়ের ধার ধারিত না।

সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্বরাজ্যক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গাঙ্কর্ষ বিবাহ ঘটয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্বের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজ্যও সেই-খানেই ; জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

লড়াইয়ের মূল

কিন্তু এখন বাণিজ্য-প্রবাহের মতো রাজস্ব-প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রকতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে— তাহা এক দেশের উপর আর-এক দেশের রাজস্ব এবং সেই সেই দেশ সমুদ্রের ছই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব অগতে আর-কখনো ছিল না।

যুরোপের সেই প্রভুত্বের কেন্দ্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার যুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত। কুখা যথেষ্ট, মাছেরও গন্ধ পাইতেছে, অথচ কাটা ছাড়া আর বড়ো-কিছু বাকি নাই। এখন রাগে তার শরীর গস্‌গস্‌ করিতেছে। সে বলিতেছে, ‘আমার জন্ত যদি পাত পাড়া না হইয়া থাকে, আমি নিমন্ত্রণপত্রের অপেক্ষা করিব না। আমি গায়ের জোরে যার পাই তার পাত কাড়িয়া লইব।’

এক সময় ছিল যখন কাড়িয়া-কুড়িয়া লইবার বেলায় ধর্মের দোহাই পাড়িবার কোনো দরকার ছিল না। এখন তার দরকার হইয়াছে। জর্মনির নীতিপ্রচারক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, যারা দুর্বল, ধর্মের দোহাই তাদেরই দরকার; যারা প্রবল, তাদের ধর্মের প্রয়োজন নাই, নিজের গায়ের জোরই যথেষ্ট।

আজ কুখিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মাহুত্ব আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্ত লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্ত জোগাইবে— যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

যুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন যুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারে না।

আজ তাহা নিজের গারে বাজিতেছে। কিন্তু জর্মনি পণ্ডিত যে শুধু

কালান্তর

আজ প্রচার করিতেছে এবং যে তত্ত্ব আজ মদের মতো জর্মনিকে অস্তায়
যুদ্ধে মাতাল করিয়া তুলিল, সে তত্ত্বের উৎপত্তি তো জর্মন-পণ্ডিতের
মগজের মধ্যে নহে, বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে ।

পৌষ ১৩২১

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বস্তা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাঝোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া উঠে, এবং অস্তুত এই গলিচর জীবেরা উত্তর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগাতর নয়, শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আনার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাপ ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিহ্বৎ তাহাকে কটাক করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে ; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌছিয়াছিল অদৃশ্য, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল ; ও দিকে মরিবার কালের পিপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে— এক দিন এই আকাশেরও ভাগবতরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে, অ্যাটর্নি তার দিন গণিতেছে ; চীনের মানুষ একরায়ে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং আপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচ শো বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সঘন্থে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনই আছে। যখন কনগ্রেসের ক অফিসেরও পত্তন হয় নাই তখনও এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কত কাল-পরে পদচারি ওরে

ছুখসাগর সঁতারি পার হবে ?

আর আজ যখন হোমকলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গৌফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান— মেঘমল্লাররাগেণ, যতিতালাত্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি, স্ততরাং ব্যাপারটা

কালান্তর

আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিছু চিঠিতে যে কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নীচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নীচে তেমনি ছোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও ক্রমে ক্রমে চমক লাগিল। বর্ষাও নামিয়াছে, ট্রামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে, স্মরণশাস্ত্রে এই কথা বলে; কিন্তু ট্রামওয়ালাদের অস্তায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার সহযোগে যখন চিংপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে অনস্রোতের বন্দ দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল, তখন অনেক দিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন।

সহ্য না করিলে যে চলে, এবং না করিলেই যে ভালো চলে, চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই, আমাদের সময়, ওদের সময় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো আনার হিসূসা ট্রামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত, আজ তবে ট্রাম-কোম্পানির দিনে আহা, রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কী কথা! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্রামের রাস্তা মেরামত হইবে না?'

'হইবে বই কি! কিন্তু, এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।'

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, 'সে কি সম্ভব?'

যা হইতেছে তার চেয়ে আরো ভালো হইতে পারে, এই তবুগা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্কর জলে তাদের বন্ধ ভাসে

কর্তার ইচ্ছার কর্ম

এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া ছুঃখকে আমরা সর্বান্তে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাংরার মতো স্লেটাকে দেশের চার দিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদের কোনো কর্তৃত্ব আছে, এটা আমরা কিছুতেই পুরানাজার বুঝিলাম না। বইরে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে, কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাঁচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েরমাগে জড়ানো, তাই যেখানে সান্তান চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অতিমন্থ্য মায়ের গর্ভেই ব্যুৎ প্রবেশ করিবার বিস্তা শিথিল, বাহির হইবার বিস্তা শিথিল না, তাই সে সর্বান্তে সশরীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাধা পড়িবার বিস্তাটাই শিথিলাম, গাঁঠ খুলিবার বিস্তাটা নয়; তার পর জন্ম-মাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাকেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত, সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনা বাক্যে পুকবে পুকবে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মানুষের অধিকার। নানা মত্রে, নানা স্রোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু তুল হয় এইজন্য যে দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আটপেঁটে বাধে,

কালান্তর

চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইঅন্ত নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিণীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার অন্ত সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গান্ধীর্ষের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'

আর যাই হোক, মনু-পরামর্শের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলার ভারি বেহুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ শ্রুতির কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্ভীক হইতে হয়, তবে তার চেয়ে নাহয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ, কিন্তু এক দিন রাত থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকাছুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বায়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর-এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্ট্রিমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুঘুঘাষ, সুবাঘুবি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্তেরা যখন জরিমানা ও শাসনের

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর, গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ারল্যান্ড আমেরিকার লক্ষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটামিয়া পর্যন্ত গলদের লড়াই ফর্দ দেওয়া যায় ; ভারতবিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোটো নয়— কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যেসকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ডেকুসের নির্ধাতন উপলক্ষে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্তের যে অস্তায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে রিপূর অক্ষশক্তিরই তো হাত দেখা যায়। এসকল সম্বন্ধে আজকের দিনে এ কথায় কারও মনে সন্দেহ বেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অস্তায়ের গর্ভে খাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাধিয়া তার মুখে পায়সার তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে, সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুবাবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বড়, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা, তার শক্তি, তার আশা ভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। ভূমৈব সুখং নাম্নে সুখমস্তি। অতএব ভুলচূকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও

কালান্তর

আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব; দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কোনো একপুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে, তবে সে দিক হইতে সে ইন্টার্নড্ হইতে পারে, কিন্তু এ দিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি 'তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য করিবার জন্তই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এত বড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না', তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক ইন্টার্ন.মেন্টের হুকুম জারি করেন। যারা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্ত পাখা ঝটপট করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পাতুটাকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা, নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্তও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্তও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে, সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিৎপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাত। চিৎপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই উপর-ওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিত হইয়া রহিল। চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাতছুটাই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে, চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে; আর চিৎপুর তাহা মানে

ইংরেজিতে বলা যায়, তাঁরা 'Art for art's sake'—এই নীতিতে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে অভিমত থেকে তাঁকে অনায়াসেই কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্য সমালোচক হিসাবে মনে করা যায়।

[পাঁচ] আমাদের দেশে লোকহিত সাধনের যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তাতে বিশেষ ফলস্বাক্ষর সম্ভাবনা নেই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন কেন? তিনি প্রকৃত লোকহিতের জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন 'লোকহিত' প্রবন্ধ অবলম্বনে সে কথা বুঝিয়ে দাও।

উত্তর । রবীন্দ্রনাথ যে সময় 'লোকহিত' প্রবন্ধটি রচনা করেন সেই সময় আমাদের দেশের ভ্রমসমাজে দরিদ্র সাধারণ মানুষের উপকার করবার একটা হৃদয় দেখা গিয়েছিল। এই ধরনের প্রয়াসকে সাধারণভাবে স্বাগত জানানো উচিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাতে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারেন নি। এতে যে তেমন কোন ফল ফলবে, এমন আশাও তিনি করতে পারেন নি। কেন তিনি মনে করেছেন এই প্রয়াস ফলবান হয়ে উঠবে না, তার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথমত, লোকসাধারণের হিত করবার বাসনা ভ্রমসমাজের মনে কোন আন্তরিক প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়নি—সেই সময় ইউরোপীয় সমাজে উচ্চবিত্তের মানুষ শ্রমিক সাধারণের উন্নতির জন্য যে সচেতনতা দেখিয়ে ছিলেন তার অনুকরণ করবার জন্যই আমাদের দেশে লোকহিতের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এভাবে অনুকরণ করে কোন স্থায়ী অথবা প্রকৃত ফল আশা করা যায় না, কারণ দুই ভূখণ্ডের সমাজব্যবস্থা, সামাজিক বিবর্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইউরোপীয় বণিকসমাজ যে শ্রমিকের স্বার্থ দেখবার জন্য ব্যস্ততা দেখিয়েছেন তা তাঁদের উদ্ভবের ফল নয়, শ্রমিকের গণচেতনা আগরণেরই প্রতিক্রিয়া। বিপুল সংখ্যার সাধারণ মানুষ তাদের কার্মিক পরিশ্রমের দ্বারা বণিকদের কলকারখানায় যে মুনাফা উৎপাদন করে তার গুরুত্ব তারা বুঝতে পেরেছে। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তাদের চেতনা বেগেছে—হুতরাং তাদের উপেক্ষা করার ফল যে ভয়ানক হতে পারে, একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই বণিকসমাজ তাদের উন্নতির জন্য এতো সচেষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষের দরিদ্রসাধারণের মধ্যে সে চেতনা এখনো আসেনি, তাই তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর কোন দায়ও ভ্রমসমাজের থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কোনরকম সামাজিক দায় এখনও অসুভব করে না বলেই এখানকার ভদ্রসমাজ লোকসাধারণের যেটুকু হিতসাধন করতে চায় তা অসুগ্রহ বিবেচনা করেই করে। নিজেদের আত্মস্বরিতা ও বৈশ্ব প্রচার করাটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দরিদ্র সাধারণের চেয়ে তারা অনেক বড়ো—এই কথাটি লোক সমক্ষে গোচর করা এবং তাতে পরিপূর্ণ আত্মাহংকার বোধ করাই এই ধরনের লোক-হিতের উদ্দেশ্য। ফলে, এতে নিজেদের আত্মপ্রচারের কাজটা বেশ ভালভাবেই সমাধা হয় বটে, কিন্তু লোকহিতের কাজটা সে অসুপাতে কিছুই হয় না। সামান্ত দুটো একটা নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে অথবা লোকসাধারণের জন্য লোকসাহিত্য রচনা করার উদ্যোগ দেখিয়েই তারা কর্তব্য শেষ করে।

তৃতীয়ত, দীর্ঘদিন ধরে ভদ্রের সমাজের প্রতি যে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভদ্রসমাজ পোষণ করে আসছে তা বিসর্জন না দিলে তাদের সত্যকার কোন উপকার করা ভদ্রসমাজের পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রসমাজের চোখে দরিদ্র সম্প্রদায় প্রায় পশুর পর্যায়ভুক্ত—তারা মনে করে ভারতবর্ষ বলতে ভদ্রসমাজের ভারতবর্ষকেই বোঝায়, দরিদ্রেরা তাদের সেবা করবে—এইটুকু মাত্র তাদের অধিকার। তারা ভদ্রসমাজের চেয়ে অনেক অসুন্নত অনেক ছোট—কিন্তু কেবল সেই কারণেই তাদের উপকার করা অনেক কঠিন। ছোটের অপকার বড় খুব সহজেই করতে পারে, তার উপকার করতে গেলে আগে তাকে ভালবাসা দরকার। ছোটকে ভাল না বেসে তাকে ভিকা দেওয়া যায়, অসুগ্রহ করা যায়—তাতে তার অপমানই বাড়ে, সে প্রাপ্য বলে কোন উপকার বড়র কাছে থেকে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের সম্বন্ধে মনোস্তমীর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, অথচ ভদ্রসমাজ তাদের হিতসাধনের জন্য ব্রতী হয়েছে—এটি এমনই অসম্ভব ব্যাপার যে এতে লোকসাধারণের কোনরকম উন্নতি ঘটা সম্ভব নয় বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লোকহিতের কার্যকর সমাধান সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন দরিদ্র সাধারণের মধ্যে যদি প্রাথমিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবেই লোকহিতের কাজ সার্থক হয়ে উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন কেবল লিখতে ও পড়তে শেখা। কিন্তু সে শিক্ষা অল্প কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত করলে চলবে না—দেশের সমস্ত দরিদ্র মানুষই যাতে এই শিক্ষা লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার মান খুব উচ্চ হওয়ার

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

না বলিয়াই অগংটাকে হাতছাড়া করিয়া ছই চক্ৰ তারা উন্টাইয়া শিবনেত্র ছইয়া রছিল।

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে ছইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্ঠার সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তি-লাভ, সমৃদ্ধিলাভ, দুঃখ ছইতে পরিত্রাণ লাভ— এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত্তি। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে— এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে যুরোপের এত বড়ো মুক্তি।

আমরা কিছু ছই হাত উন্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি— কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেই কর্তাটিকে— ঘরের বাপদাদা, বা পুলিশের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্বতন্ত্র, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহ কেতু প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন, 'আমরা তো এসব মানি না। আমরা তো বসন্তের টিকা লই; ওলাউঠা ছইলে মূনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটপ্ত কীট বলিয়াই গণ্য করি'— এবং 'সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর বুলাইয়া রাখি।'

যুখে কোনটাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিছু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অথও বিশ্বনিয়মের যথো প্রকাশিত অথও বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনার বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত

কালান্তর

করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি, কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়, যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায়রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেক্ষিত রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে; এবং বিধাতার উপর টেকা দিয়া ভাবে, প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আণ্ডামানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটাই তো বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিম্বা ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধ ভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি, আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি, 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম' এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের এ কালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দেশের কাজের পত্তন হইয়াছে, তবু আমাদের সে কালের ভাগ্যে সেই দেশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্ত কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দেশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিত্তারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ান কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ, কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক হাত ঘেরের কুমার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুটিরই বা কী গুণ, কুটিরই বা কী,

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

শ্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর শ্লেচ্ছের ছোওয়া জলেরই বা কী—
কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে বিচার তারা চিরকালের মতো
সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানিপাড়ে নোংরা ষটি ডুবাইয়া
যে জল বালতিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি-
মিঞা ফিলটার হইতে যে জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর,
তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার
ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু
অতিধিসংকার নয়, অস্ব্যস্তিসংকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবর্দস্তি
দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে
ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্র-
ব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে
না কেন ?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া অনসাধারণের কারবার না চলে
তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে
হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও
খুব স্পষ্ট করিয়া সৃষ্টিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মহাভারত। ঠান্ড
সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ, তাই যে দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে
সে মানিতে চাহে নাই বহু দুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার
মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা জ্ঞানধর্মের যোগ নাই।
মানিবার পাত্র যতই যথেষ্টাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে
নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃদেব এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃদেব
যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই,
বিচার নাই, জোর যার মূলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার
কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুঘাব এবং
অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন,

কালান্তর

রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ ।

অথচ এক দিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যথাতথ্যতোহর্ষান্ ব্যদধাৎ শাখতীভ্যঃ সমাভ্যঃ । অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে বিধান শাখত কালের । তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্ত বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয় । স্মৃতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্ণের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি । তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব । কেননা, যে বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই । এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান । সেই বিজ্ঞানের জোরে যুরোপের মনে এত বড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে সে বলিতেছে, ‘ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবেই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না ; জ্ঞানের অভাব, অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই ; মানুষের দ্বারে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্ব-কল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে ।’

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ এক দিন বলিয়াছিল, অবিজ্ঞাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে ; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিভ্রাণ । অসত্য কাকে বলে ? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য । সর্বভূতের সঙ্গে আস্থার মিল জানিয়া পরমাশ্রমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা । এত বড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্রম ব্যাপার, তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না ।

এ দিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যুরোপ যে মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই । এখানেও দেখা যায়, অবিজ্ঞাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি । সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতার লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল ; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এ দেশে বিষ্ণুর সঙ্গে অবিষ্ণুর একটা আপোষ হইয়া গেছে ; বিষয়বিত্তাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া যাবস্থানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে যত সংকীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক, উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে 'যে মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে' ; অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিকার বুলি ভরিয়া দিল। ও দিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে 'যে বেটা সর্বভূতকে যত দূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ' ; আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা, বাঁচিয়া থাকো।' এইজন্যই এ দেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

যুরোপে ঠিক ইহার উল্টা। যুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে শক্তি, যে মুক্তি দিতেছে, সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার ; তাহা সকল

কালান্তর

মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়— তাহার বিকাশ তত্ত্বমন্ত্রের কুশাশায়
ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এবং
সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই-যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা
আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে
ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে যুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব
পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা
আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের
শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হোক; উপর হইতে
যেমন-খুশি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুশিতে সে নিয়ম মানিব,
এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে
এমন একটা চাকাওয়াল ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হোক যেটাকে
আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে
যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে।
এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে; না যদি
দিতাম, যদি বলিতাম, রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভাঙ্গা— সেটা
আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অস্বত একটা ফাটল দিয়াও
সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও স্তম্ভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে,
দেশের যে আত্মাভিमानে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা
দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল
খোঁটার আমাদের বলির পাঠার মতো বাধিতে চায় তাকে বলি ধিক!
এই আত্মাভিमानে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের
কর্তৃত্বসত্তায় আমাদের আসন পাতা চাই; আবার সেই অভিमानেই ঘরের

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি 'ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না'— ইহাকেই বলি হিন্দুমানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে, আর-এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওপ ডাও ওই বেতবনটাকে।' ভুলিয়া গেছে, বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই, বাঁশেও নাই, আছে আপনার মথোই। অপরাধটা এই যে, সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাত্যাস। যত দিন এমনি চলিবে তত দিন কোনো-না-কোনো ঝোপে ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্ত অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময় যুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লড়াই করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের ঐপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা যুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলেণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলেণ্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। এক সময়ে যাদের কাছে সে নথনাড়া দিয়াছে, স্ত্রায়ে অন্ত্রায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্ত সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বদিক্তরমতো বুড়িকে হুণায় হুণায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্ত করে না। এই গৃহিণীর দাবরার যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে

কালান্তর

ছেলেমেয়েদের কারও আজ টু শব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বৃড়ির শাসন অনেক দিন হইল কাটাইয়াছে, কিন্তু স্পেন এখনও সম্পূর্ণ কাটায় নাই। এক দিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বৃড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল, তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী। তার কারণ, বৃড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেক দিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা গেল যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সেদিন হঠাৎ ধরা পড়িল, স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাধা তার নৌযুদ্ধবিজ্ঞাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল, কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজেদের অচল বাধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি তার কৌলীন্স যেমনি থাকে সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত, কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ যুরোপের ছোটো-বড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃক আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা ছিল না, যেমন জার-কর্তার রাশিয়ায়, সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস কেরতের মতো নানা কর্তার কাটাগাছে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে এ কালের পেয়াদা হইতে সে কালের পুঁধি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মসিরা অস্তায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আশুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন মদীর

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডেশ্যাপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, মানুষকে নির্ভয়ভাবে শ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ ভিধিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতত্ত্ব বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ স্বার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতত্ত্ব বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো অত্যাচনই হোক, মাথায় পা তুলিবার ষোণ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতত্ত্ব।

আমি জানি, এক দিন একজন রাজা কলিকাতার আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি ধার তিনি কলেজে পাশ-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সাদিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি ধার তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন; বলিলেন, 'আপনার মুখে পান!' গাড়ি ধার তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই, 'সারথি যেই হোক, মুখের পান ফেলা যায় কেন?' ধর্মবুদ্ধিতে বা

কালান্তর

কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত, সে দেশের লোক স্বাধীনতার অস্ত্যেষ্টিসংকার করিয়াছে। অথচ দেখি, যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এ দেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই ভাবেই দেখেন, একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্র-যোগ্যতা ষমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানঘাত্মার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গানানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অসুখ্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। ছুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যেসব ছেলে মানুষ করিয়াছে, ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অস্তুরায়কে আকাশপরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে, এইটেই সূক্ষ্ম। কানা বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয়, তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে সম্পদ দিয়াছেন, ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব, এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে— ইহার ঞ্ণের

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

ফর্দটাই মোটা । চোখের সামনে দেখিরাছি, হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে পথ দিরা স্নানে চলিরাছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িরা একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিরা কেহ তাহাকে ছুঁইল না । এই তো ষণদারে দেউলিয়ার লক্ষণ । এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে স্তম্ভর, কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে । যে অকৃত্য মানুষকে পুণ্যের অন্ত জলে স্নান করিতে ছোটার, সেই অকৃত্যই তাকে অজানা যুবুর্ন সেবার নিরন্ত করে । একলব্য পরমনিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অকৃত্য নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্শাকল হইতে তার সমস্ত আপন-জনকে বঞ্চিত করিরাছে । এই-ষে মৃত নিষ্ঠার নিরতিশয় নিফলতা বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না, কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা । পরাভীর্ষে দেখা গেছে, যে পাণ্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা চালিরা দিরা তার পা পূজা করিরাছে । সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবকের চোখে স্তম্ভর ; কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্ততা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক পা অগ্রসর করিরাছে ? ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে ; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিরা না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না কিম্বা নিজের অন্ত করিত । সে কথা ঠিক ; কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ না করাটাকে কিম্বা নিজের অন্ত খরচ করাটাকে সে ধর্ম বলিরা নিজেকে ভোলাইত না— এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত । মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না । কেননা যাকে চোখ বুজিরা চালানো অভ্যাস করানো হইরাছে, চোখ খুলিরা চলিতে তার পা কাপে ; অল্পগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের অন্তই প্রাণ দিতে শিখিরাছে, আপনি প্রভু হইরা

কালান্তর

সেচ্ছায় ত্রায়ধর্মের অন্ত প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এইজন্যই আমাদের পাড়ারগায়ে অন্ন জল বাস্তু শিকা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই— এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। এক দিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া হাস-হাস করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, ‘নিজেরা মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাধাইবার খরচা দিব।’ তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ওই সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব আমরা, এটা কঁাকি। সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাধা নিমন্ত্রণ।

এই-যে অটল চূর্ণশা এর কারণ, গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার ‘পরে নয় কোনো আগন্তকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনও সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে বুড়ি এদের জাতিকূল ধর্মকর্ম ভালোমনে শোণয়াবগা সমস্তই বাহির হইতে বাধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আকির খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কলেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। তারতবর্ষকে সনাতন ধাতীর কাছে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের তারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না। বলেন, ওই

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কাঁধে থাকিয়াই আত্মকর্তৃষের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, হুঃখের পর হুঃখ, ছুঃভিকের পর ছুঃভিক ; বয়লোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া বখন ঘাটের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি, সামাজিক বন্ধুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুদ্ধির শাসনের প্রতি যাদের তস্তি অটল তাঁরা বলেন, 'ওই অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই ? আমরাও সারাসল শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।' অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যাক্তি হয়, কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর যোলো আনা কৌক। ব্যবহারের গতি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্ভয় কানমালা, সমস্ত গুরুপূরোহিত ভাগ্যভাবিত সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতেই চেরে অনভ্যাসের বন্ধুকাটা লইয়াই কাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হোক, 'পায়ের বেড়িটা অক্ষর হোক' বলিয়াই বখন আশীর্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, 'মানুষদের কাঁধে চড়িয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও।' বত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরজীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রস্তু ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে সংকীর্ণ করাই আমাদের গৌরবের কথা হয়, তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলিতে হয়, 'এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার অস্ত্র দল বাঁধো।' কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেই

কালান্তর

নাই। তৃত্বার্ভের ঘড়াঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ হয় না। অনেকে বলেন, এ দেশে পদে পদে এত যে দুঃখদারিদ্র্য তার মূল কারণ, এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বৃকে শেল হানিরাছে, এ কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়' এগুজামিন পাস করি। এ কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কনগ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন যুরোপীয় সাম্রাজ্যে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সাম্রাজ্যেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশোজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সাম্রাজ্য শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সাম্রাজ্য সেই পাঁচশো ইংরেজের কঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রহরে বলিবে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।' তেমনি কোনো দশজন বা দশ-হাজার-জন ইংরেজ রাজসভার মধ্যে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারত-শাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানা প্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রহরে বলিতেছে, 'এসো তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হোক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, ভারতশাসনতন্ত্রে

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।’

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলার খাটে না, এমন একটা বড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল, উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মের কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল, যাহাকে বাহিরে পশু করিবে তার মনকেও পশু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই মুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্ত বোধ করি মনে মনে আপবোস করেন এবং আন্তে আন্তে বিদ্যালয়ের ছুটো-একটা জানলা-দরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি; কিন্তু তবু এ কথা তাঁরা কোনো দিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিতের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের স্ত্রীয়া অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত— এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার অল্প বিস্তর হুঃখ সহ্য, ত্যাগ করা, আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাগে বলিয়া বলি ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই’, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্র আসে, তার ছুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই— হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি নর ঘরের কোণে বসিয়া পরম্পরের কানে কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিংবা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভার সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো

কালান্তর

আমাদের স্মৃতি হইবে নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্রে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায় নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মানুষকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জ্বরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তই লীলা চলিতেছে; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে— যেখানে আমরাও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীত, ক্রুদ্ধ লোভে লুক্ক, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিবেক অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ভাগী তপস্বী অছাবান, সেখানে অন্য পক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়; সেখানে অন্য পক্ষের রিপু নার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিত্ত হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ-গবর্মেণ্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে ছুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে ছুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, ছুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অত্রাঙ্গণ যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল, ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যত বড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা প্রায়ই বল, পুলিশ তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।' বলা

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

বাহন্য, 'পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো' এ কথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্ত্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গানের জোরে নয়; সে তো ভেজের লড়াই, সে ভেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য এক দল লোকের তো বুকের পাটা ঝাকা চাই, অন্ত্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষ মাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্নেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টিমার; আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার তেলাও নাই। এ যেন এক রকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, 'বাপু মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাষ্ট অতীব স্বাস্থ্যকর।' এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেষ্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেক দিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা; ওই তো আমাদের কবিকল্পের চণ্ডী; ওই তো বেহলাকাব্যের মনসা; জায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। অন্ত্যায়—

যা দেবী রাজ্যশাসনে প্রেষ্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিজ্ঞা, ইহাই তো মায়। যেটা মূল চোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্নেন্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী, সেই বল আমারও বল। ইংরেজ-গবর্নেন্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীক হই, ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতন্ত্রে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন

কালান্তর

হইবেই, খ্রিষ্ট-দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ কথার উত্তরে শুনিব, 'রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমাণ্বিক ভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পস্থা, নয় তো খেস অ্যাঙ্কের মুখ-খাবার নীচে পরম-নিঃশব্দ নরম-পস্থা।'

'হাঁ, বিপদ আছে বই কি, তবু জানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকই ভয়ে কিম্বা লোভে স্ত্রায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না, বিক্রছেই দিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।'

'কিন্তু আমাদের দেশের লোকই প্রশংসা কিম্বা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।'

'এ কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিতে হইবে।'

'এতটা কি আশা করা যায়?'

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্মেণ্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজাদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরো বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অশ্রু দাবি টিকিবে না। এ কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেক দিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যারা সকল মানুষের প্রতিনিধি— যারা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যারা সমস্ত বিক্রমতার মধ্যেও যমুয়াসকে বিশ্বাস করেন এবং বার্ষিকতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্বপ্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীকার আগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিধাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন :

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

বলমপ্যস্ত ধর্মস্ত জ্ঞায়তে মহতো ভয়াৎ । অর্থাৎ কেবলমহলে যদি বলমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভরকেও ভয় করিবার দরকার নাই । রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার, ভীতিকে নয় । ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে ।

মনে করো, ছেলের শক্ত ব্যামো । সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি । খরচ বড়ো কম করি নাই । যদি হঠাৎ দেখি, তিনি মস্ত পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম কাড়া-ঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি-ত্রাহি করিতে লাগিল, তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব, 'দোহাই সাহেব, ভূত কাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন ।' তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, 'তুমি কে হে । আমি ডাক্তার, বাই করি-না তাই ডাক্তারি ।' তবে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার এ কথা বলিবার অধিকার আছে, 'যে ডাক্তারিতত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার, আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য ।'

এই-যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ওই ডাক্তার-সম্প্রদায়েরই ডাক্তারিশাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে । ডাক্তার যতই আফালন করুক, এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না । এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘৃষিও মারিতে পারে, কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘৃষির মূল্য বড়ো । এই ঘৃষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে । তাই বলিতেছি, যে কথাটা ইংরেজের কথা নয়, কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে কথার যদি আমরা সার না দিই তবে আজ হুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল হুঃখ কাটিবে ।

কালান্তর

দেড় শো বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্নেন্ট ভালোমনে বাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এত দিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পান্ডাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে, এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর-মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের চূর্ণতিকে আপন চূর্ণতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম-পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি কি এক দিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমনে মুখহুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্তরের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস— এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বহু; ইংরেজ যুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্বদেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব; এ কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে ‘ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া বাছ-কাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি’।

যে জাতি কোনো বড়ো সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। যুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্বলাভ। এই সম্পদ, এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

উপরেও আছে। কারণ, ছুই পক্ষের যোগ না হইলে বিশ্বস্তি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে, 'জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।' এ কথা মানি। অগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ার অনেক ভুল, অনেক ছুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল, সেই ছুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকার গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল, কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্ত্রীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পান্না যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যদুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। যুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহু যুগের যৌত্ববৃষ্টি বড়বাতাস লাগিল তাপানে তাহা শিকড়হুহু পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃশক্তির চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও, তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃশক্তির সুযোগ দিয়া আমাদের ওস্তরকার নূতন নূতন শক্তি-আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও ; সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ, তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর-কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে ছু পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে, তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিকিতেই পারে যার জোরে বায়ুব সকল

কালান্তর

বিভাগে আপন মহত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে ?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে, তার পরে সুযোগ পাইবে, এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ ! কিন্তু যুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এইসমস্ত যত কণ আছে তত কণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না, তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপের স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণার দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে কথা চাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এক কোণের বাতি জ্বলাইবার দাবি নাই, এ কাজের কথা নয়। যে দিকের যে সমস্ত দিরাই হোক আলো জ্বলাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি-মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জ্বলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছু কাল হইতে নিবিয়া গেছে ; তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জ্বলাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদের তিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিবেদন করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে ? সে যে

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কেবল ধনী স্বয়ংমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাভা অস্ট্রেলিয়ার নামে সে স্টেশন পর্বত ছুটিয়া যায়, আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উন্টা—এটা তো সহিবে না। দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং স্বয়ং যদি লজ্জাক্রমে অহরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি, আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধার-করা বার্ধক্যের মুখোষ পরিয়া বিস্তৃত নাহিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তৃত দেখিলাম যারা স্বাধীনতার কাছে লাজনা সহিয়াও ইংরেজ-ইতিহাসবৃক্ষের অমৃতফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যারা বাহির হইতে ছুঃখ এবং স্বয়ংদের নিকট হইতে বিককার সহিতে প্রস্তুত। যারা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আশ্বাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আশ্বা অপরিমের, যে আশ্বা অপরাধিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আশ্বা অত্যন্ত অল্প প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলার মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, 'আশ্বানং বিচি। আপনাকে জানো।'

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি

কালান্তর

বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চ ললাট মহোজ্জ্বল, অভিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্ত আগমনীর প্রভাতরাগিনী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীক, অসত্যাত্মারাবনত যুগ, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য, ক্ষুদ্র বিধেবে কলহ করিবার দিন নয় ; আজ তুচ্ছ আশা, তুচ্ছ পদমানের জন্ত কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে ; আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বস্তার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্তকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অন্ধের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি যুম্বু— সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে ; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ধূলিপুঞ্জ শুষ্কপত্রের সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব-নব-অধ্যবসায়-শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অতিভূত করিয়া দিল— আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব— সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চির-জাগরুক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণহস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নব নব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অন্তর্চিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমায়ি ; সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, ভড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এংসা প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু— ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাজ্জিত হউক, মূঢ় ভিরঙ্কৃত হইয়া চিরনির্বাসন গ্রহণ করুক।

ভাদ্র ১৩২৪

ছোটো ও বড়ো

যে সময়ে দেশের লোক ভূষিত চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত ; যে সময়ে রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ার পর্যবেক্ষকেরা খবর দিলেন যে, হোমরুলের প্রবল মৈসুম হাওয়া আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়াছে, মুবলধারে বৃষ্টি নামিল বলিয়া ; ঠিক সেই সময়েই মুবলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হান্সামা ।

অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাঘেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল ষণ্ডের কথা শুনি । আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্ম বিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই । বর্তমান কালে পশ্চিম-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে বিরোধ বাধে তাহা অর্থ লইয়া । সেখানে ধনির শ্রমিকেরা, সেখানে ডক ও রেলোয়ের কর্মিকেরা মাঝে মাঝে হুলস্থল বাধাইয়া তোলে ; তাহা লইয়া আইন করিতে হয়, ফৌজ ডাকিতে হয়, আইন বন্ধ করিতে হয়, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে । সে দেশে এইরূপ বিরোধের সময় ছুই পক্ষ থাকে । এক পক্ষ উৎপাত করে, আর-এক পক্ষ উৎপাত নিবারণের উপায় চিন্তা করে । ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো তৃতীয় পক্ষ সেখানে বাহির হইতে ছুয়ো দেয় না । কিন্তু আমাদের ছুঃখের বাসরঘরে শুধু যে বর ও কনের বৈততত্ত্ব তাহা নহে ; তৃতীয় একটি কুটুখিনী আছেন, অটুহাস্ত এবং কান-মলার কাজে তিনি প্রস্তুত ।

ইংলণ্ডে এক সময় ছিল, যখন এক দিকে তার রাষ্ট্রযন্ত্রটা পাকা হইয়া উঠিতেছে এমন সময়েই প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে ষণ্ড চলিতেছিল । সেই ষণ্ডে ছুই সম্প্রদায় যে পরস্পরের প্রতি বরাবর স্মৃতিচার করিয়াছে তাহা নহে । এমন কি, বহু কাল পর্যন্ত ক্যাথলিকরা

ছোটো ও বড়ো

বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই কাটাইয়াছে। আজও কোনো বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক চার্চের ব্যয়ভার ইংলণ্ডের সমস্ত লোককে বহন করিতে হইতেছে, সে দেশের অন্ত সস্প্রদায়গুলির প্রতি ইহা অন্তর। অশান্তি ও অসাম্যের এই বাহ্যিক ও মানসিক কারণগুলি আজ ইংলণ্ডে নিরুপভব হইয়া উঠিয়াছে কেন? যেহেতু সেখানে সমস্ত দেশের লোকে মিলিয়া একটি আপন শাসনতন্ত্র পাইয়াছে। এই শাসনভার যদি সম্পূর্ণ বিদেশীর 'পরে থাকিত তবে যেখানে জোড়া মেলে নাই সেখানে ক্রমাগত ঠোকাঠুকি বাধিয়া বিচ্ছেদ স্বায়ী হইত। এক দিন ব্রিটিশ পলিটিক্সে কটলও, ও ইংলণ্ডের বিরোধ কম তীব্র ছিল না। কেননা উত্তর জাতির মধ্যে ভাষা ভাব কচি প্রথা ও ঐতিহাসিক স্বত্ব-ধারার সত্যকারই পার্থক্য ছিল। স্বন্দের ভিতর দিয়াই স্বন্দ ক্রমে ঘুচিয়াছে। এই স্বন্দ ঘুচিবার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজ ও স্বচ উভয়েই একটা শাসনতন্ত্র পাইয়াছে বাহ' উভয়েরই স্বাধিকারে; বাহাতে সম্পদে ও বিপদে উভয়েরই শক্তি সমান কাজ করিতেছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, আজ ইংলণ্ডে স্বটিশ চার্চে ও ইংলিশ চার্চে প্রভেদ থাকিলেও, রোমান ক্যাথলিকে প্রটেস্ট্যান্টে অনেক ঘটিলেও, রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে শক্তির ঐক্য, মঙ্গলসাধনের যোগে, তাহাদের মিলন ঘটিয়াছে। ইহাদের মাঝার উপর একটি তৃতীয় পক্ষ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া আপন ইচ্ছামতো ইহাদিগকে চালনা করিত, তাহা হইলে কোনো কালেই কি ইহাদের জোড় মিলিত? আরলণ্ডের সঙ্গে আজ পর্যন্ত ভালো করিয়া জোড় মেলে নাই কেন? অনেক দিন পর্যন্তই আরলণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সাম্য ছিল না বলিয়া।

এ কথা মানিতেই হইবে, আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যপ্রতিভা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শান্তি। ধর্ম যদি অন্তরের

কালান্তর

জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই 'ডগ্মা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন করা লইয়া যুরোপের ইতিহাস কত বার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বল, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে হুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিত্ত আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায়, এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্তে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।

অল্প দিন হইল, রেলগাড়িতে আমার এক ইংরেজ সঙ্গী জুটিয়াছিল। তিনি বেহার অঞ্চলের হান্সামার প্রসঙ্গে গল্প করিলেন— সাহাবাদে কিম্বা কোনো-একটা জায়গায় ইংরেজ কাপ্তেন সেখানকার এক জমিদারকে বিক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার রায়তদের তোমরা তো ঠেকাইতে পারিলে না! তোমরাই আবার হোমরুল চাও!' জমিদার কী জবাব করিলেন শুনি নাই। সম্ভবত তিনি লজ্জা সেলাম করিয়া বলিয়াছিলেন, 'না সাহেব, আমরা হোমরুল চাই না, আমরা অযোগ্য অধম। আপাতত আমার রায়তদের তুমি ঠেকাও।' বেচারী জানিতেন,

ছোটো ও বড়ো

হামরুল তখন সমুদ্রপারের স্বপ্নলোকে, কাপ্তেন ঠিক সম্মুখেই, আর দাঙ্গামাটা কাঁধের উপর চড়িয়া বসিয়াছে।

আমি বলিলাম, 'হিন্দু-মুসলমানের এই দাঙ্গাটা হোমরুলের অধীনে তা ঘটে নাই। নিরস্ত্র জমিদারটি অক্ষমতার অপবাদে বোধ করি একবার সেনাপতি-সাহেবের ফৌজের দিকে নীরবে তাকাইয়াছিলেন। উপায় রহিল একজনের হাতে আর প্রতিকার করিবে আর-একজনে, এমনতরো শ্রমবিভাগের কথা আমরা কোথাও শুনি নাই। বাংলাদেশেও ঠিক স্বদেশী উদ্ভেজনার সময়, শুধু আমালপুরের মতো মফস্বলে নয়, একবারে কলিকাতার বড়োবাজারে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানের উপদ্রব প্রচণ্ড হইয়াছিল— সেটা তো শাসনের কলঙ্ক, শুধু শাসিতের নয়। এইরূপ কাণ্ড যদি সদাসংঘটা নিজামের হাইদ্রাবাদে বা অয়পুর বরোদা মৈস্তরে ঘটিতে থাকিত তবে সেনাপতি সাহেবের জবাব খুঁজিবার জন্য আমাদের ভাবিতে হইত।'

আমাদের নালিশটাই যে এই— কর্তৃত্বের দায়িত্ব আমাদের হাতে নাই, কর্তা বাহির হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছে। ইহাতে আমরা ক্রমশই অস্তরের মধ্যে নিঃসহায় ও নিঃস্বল হইতেছি; সেজন্য উল্টিয়া কর্তারাই আমাদেরকে অবজ্ঞা করিলে তরে তরে আমরা জবাব দিই না বটে, কিন্তু মনে মনে যে ভাষা প্রয়োগ করি তাহা সাধু নহে। কর্তৃত্ব যদি থাকিত তবে তাহাকে বজায় রাখিতে ও সার্থক করিতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমান গরজ থাকিত, সমস্ত উচ্ছ্বলতার দায়িত্ব সকলে মিলিয়া অতি সাবধানে বহন করিতে হইত। এমনি করিয়া শুধু আজ নহে, চিরদিনের মতো ভারতবর্ষের পোলিটিকাল আশ্রয় নিজের তিষ্ঠিতে পাকা হইত। কিন্তু এমন যদি হয় যে, একদিন ভারত-ইতিহাসের পরিচ্ছেদপরিবর্তন-কালে গ্রন্থানের বেলায় ইংরেজ তার মুশাসনের তদ্ব্যবস্থার উপর রাখিয়া গেল আত্মনির্ভরে

কালান্তর

অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম, আত্মকল্যাণসাধনে অসিদ্ধ, আত্মশক্তিতে নষ্টবিশ্বাস বহুকোটি নরনারীকে— রাখিয়া গেল এমন ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিবেশী নব উত্তমে আগ্রত, নব শিক্ষায় অপরিমিত শক্তিশালী— তবে আমাদের সেই চিরদৈন্যপীড়িত অস্বহীন দুর্ভাগ্যের জন্তু কাহাকে আমরা দায়ী করিব ? আর যদি কল্পনাই করা যায় যে, মানবের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের মাঝখানে একমাত্র ভারতে ইংরেজসাম্রাজ্যের ইতিহাসই ক্রম হইয়া অনন্ত ভবিষ্যৎকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে, তবে এই কি আমাদের ললাটের লিখন যে, ভারতের অধিবাসীরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে দেশের কল্যাণকর্মবন্ধনের কোনো যোগ থাকিবে না ; চিরদিনের মতোই তাহাদের আশা ক্ষুদ্র, তাহাদের শক্তি অবরুদ্ধ, তাহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরের ইচ্ছার পাষণপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত ?

এ পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়। এ ঐক্য জড় অকর্ষক, ইহা সজীব সক্রমক নয়। ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই, স্মরণ্য ইহা আনন্দ করিবার নহে ; ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

এক দিন আমাদের দেশে যে সমাজ ছিল তাহা সাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্বের আদর্শকে সচেষ্ট রাখিয়াছিল। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ, তখন আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলিয়া জানিতাম। তা হউক, সেই ছোটো সীমার মধ্যে ধনীর দায়িত্ব ছিল

ছোটো ও বড়ো

তার ধন লইয়া, জ্ঞানীর দায়িত্ব ছিল তার জ্ঞান লইয়া। যার যা শক্তি ছিল তার উপরে চারি দিকের দাবি ছিল। সচেষ্ট জীবনের এই-যে নানা দিকে বিস্তার, ইহাতেই মানুষের যথার্থ আনন্দ ও গৌরব।

আমাদের সেই দায়িত্ব সমাজ হইতে বাহিরে সরিয়া গেছে। একমাত্র সরকার-বাহাদুরই আমাদের বিচার করেন, রক্ষা করেন, পাহারা দেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, শাস্তি দেন, সম্মান দেন, সমাজে কোন্টা হিন্দু কোন্টা অহিন্দু আদালত হইতে তার বিধান দেন, মদের ভাঁটির বন্দোবস্ত করেন এবং গ্রামের লোককে বাঘে ধরিয়া ধাইতে থাকিলে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সবাক্কেব শিকার করিবার সুযোগ দিয়া থাকেন। সুতরাং এখন আমাদের সমাজ আমাদের উপর যে পরিমাণে তার চাপাইয়াছে সে পরিমাণে তার বহিতেছে না। ব্রাহ্মণ এখনো দক্ষিণা আদায় করেন কিন্তু শিকার দেন না, ভূস্বামী খাজনা শুবিয়া লন কিন্তু তার কোনো দায় নাই, ভদ্রসম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ হইতে সম্মান লন কিন্তু জনসাধারণকে আশ্রয় দেন না। ক্রিয়াকর্মে ধরচপত্র বাড়িয়াছে বই কমে নাই; অথচ সেই বিপুল অর্থব্যয় সমাজব্যবস্থাকে ধারণ ও পোষণের জন্য নয়, তাহা রীতিরক্ষা ও সমারোহ করিবার জন্য। ইহাতে দেশের ধনীদরিদ্র সকলেই পীড়া বোধ করে। এ দিকে দলাদলি, জাতে ঠেলাঠেলি, পুঁথির বিধান-বেচাকেনা প্রভৃতি সমস্ত উৎপীড়নই আছে। যে গাভীর বাধা খোরাক জোগাইতেছি সে দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধ করিল, কিন্তু বাকী শিশুর গুঁতা মারাটা তার কমে নাই।

যে ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে ছিল সেটা বাহিরে আসিয়া পড়াতে সুন্যাবস্থা হইল কি না সেটা লইয়া তর্ক নয়। মানুষ যদি কতকগুলো পাথরের টুকরা হইত তবে তাহাকে কেমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়া কাজে লাগানো যায়, সেইটেই সব চেয়ে বড়ো কথা হইত।

কালান্তর

কিন্তু মানুষ যে মানুষ। তাকে বাঁচিতে হইবে, বাড়িতে হইবে, চলিতে হইবে। তাই একথাটা মানিতেই হইবে যে, দেশের সম্বন্ধে দেশের লোকের চেষ্টাকে নিরুদ্ধ করিয়া যে নিরানন্দের জড়ভার দেশের বুকে চাপিয়া বসিতেছে সেটা শুধু যে নির্ধূর তাহা নহে, সেটা রাষ্ট্রনীতি হিসাবে নিন্দনীয়। আমরা যে অধিকার চাহিতেছি তাহা ঔচিত্য করিবার বা প্রভুত্ব করিবার অধিকার নহে। আমরা সকল ক্ষুধাতুরকে ঠেকাইয়া অগৎসংসারটাকে একলা ছুঁইয়া লইবার জন্য লম্বা লাঠি কাঁধে লইতে চাই না; যুদ্ধে নরঘাত সম্বন্ধে বিশ্বের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি, বড়ো উদ্ভোগ ও বড়ো উৎসাহ রাখি বলিয়া শয়তানকে লজ্জা দিবার ছুরাকাজ্জা আমাদের নাই; নিরীহ হিন্দু বলিয়া প্রবল পশ্চিম আমাদের উপরে যে প্লেথ প্রয়োগ করে তাহাকেই তিলক করিয়া আমাদের ললাটকে আমরা লাক্ষিত রাখিব; আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের 'পরে যে কটাক্ষবর্ষণ করিয়াছেন তারই পরশযায় শেষ পর্যন্ত শয়ান থাকিতে আমরা ছুঃখ বোধ করিব না— আমরা কেবলমাত্র আপন দেশের সেবা করিবার, তার দায়িত্বগ্রহণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার চাই। এই অধিকার হইতে ব্রষ্ট হইয়া আশাহীন অকর্মণ্যতার ছুঃখ ভিতরে ভিতরে অসহ হইয়াছে। এইজন্যই সম্প্রতি জনসেবার জন্য আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখিতে পাই। নিরাপদ শান্তির আওতার মানুষ বাঁচে না। কেননা, যেটা মানুষের অন্তরতম আবেগ তাহা বাড়িয়া চলিবার আবেগ। মহৎ লক্ষ্যের প্রতি আত্মোৎসর্গ করিয়া ছুঃখ স্বীকার করাই সেই বাড়িয়া চলিবার গতি। সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির ছুঁনিবার আবেগ ব্যর্থতা ও সার্থক্যের উপলব্ধির পথে গর্জিয়া, ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া-চুরিয়া, বরিয়া পড়িতেছে। ইতিহাসের সেই মহৎ দৃশ্য আমাদের মতো পোলিটিকাল

ছোটো ও বড়ো

পঙ্গুদের কাছ হইতেও আড়াল করিয়া রাখা অসম্ভব। এইজন্য যেসব যুবকের প্রকৃতিতে প্রাণের স্বাভাবিক উদ্বেজনা আছে, মহতের উপদেশ ও ইতিহাসের শিক্ষা হইতে প্রেরণা লাভ করা সম্বন্ধেও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। তাদের কাছে যে মৃত্যুর চেয়ে দারুণতর, সে কথা আত্মহত্যাকালে শচীন্দ্র দাসগুপ্তের মর্মান্বিতিক বেদনার পত্রখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। কিন্তু কেবল ক্রমে ক্রমে বস্ত্রাচ্ছতিকের নৈবিশ্বিক উপলক্ষ্যে অন্তর্গূঢ় সমস্ত শুভচেষ্টা নির্মূল্য হইতে পারে না। দেশ-বাপী নিত্যকর্মের মধ্যেই মানুষের বিচিত্র শক্তি বিচিত্রভাবে সকল হয়। নতুবা তার অধিকাংশই বন্ধ হইয়া আনুগমিক নৈরাশ্রের উত্তাপে বিকৃত হইতে থাকে। এই বিকার হইতে দেশে নানা গোপন উপক্রমের সৃষ্টি। এইজন্য দেখা যায়, দেশের ধর্মবুদ্ধি ও শুভচেষ্টার প্রতিই কর্তৃপক্ষের সন্দেহ স্রুতীত্র। যে লোক স্বার্থপর বেইমান, যে উদাসীন নিশ্চেষ্ট, বর্তমানের গুপ্ত ব্যবস্থার তারই জীবনযাত্রা সকলের চেয়ে নিরাপদ; তারই উন্নতি ও পুরস্কারের পথে সকলের চেয়ে বাধা অল্প। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার জবাবদিহি ভয়ংকর হইয়াছে। কেননা, সন্দেহের কাছে এই প্রেমের উত্তর দেওয়া কঠিন যে 'মহৎ অধ্যবসারে তোমার দরকার কী— তুমি খাইয়া দাইয়া বিয়া-খাওয়া করিয়া আপিসে আদালতে ঘুরিয়া ঘোটা বা সক্র বাহিন্যের বন্দন স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পার, শুধন ঘরের খাইয়া বনের মোষ ভাড়াইতে যাও কেন'। বহুত কর্তৃপক্ষ জানেন, এই আলো এবং ঐ ধোঁয়া একই কারণ হইতে উঠিতেছে। সে কারণটা, নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ হইতে দেশের শুভবুদ্ধির মূল্য হইবার চেষ্টা। যুক্তিশাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহিম্যান্ ধূমান্। গুপ্তচরের যুক্তি বলে, পর্বতো ধূমবান্ বহেঃ। কিন্তু যাই বলুক আর যাই করুক, মাটির তলার ঐ-যে দারুণ স্তূড়মপথ খোলা হইল, যেখানে আলো নাট, শব্দ নাট, বিচার নাট, নিকৃতির কোনো বৈধ উপায় নাই,

কালান্তর

এইটাই কি স্পৃহা হইল ? দেশের ব্যাকুল চেষ্টাকে বিনা বাহনিত্তে এক দমে কবরস্থ করিলে তার প্রেতের উৎপাতকে কি কোনো দিন শাস্ত করিতে পারিবে ? কুখার ছটফটানিকে বাহির হইতে কানমলা দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া চিরছূর্তিককে ভদ্র আকার দান করাই যে স্বার্থ ভদ্রনীতি, এমন কথা তো বলিতে পারিই না, তাহা যে বিজ্ঞনীতি তাহাও বলা যায় না ।

এই রকম চোরা উৎপাতের সময় সমুদ্রের ও পার হইতে খবর আসিল, আমাদিগকে দান করিবার জন্য স্বাধীন শাসনের একটা খসড়া তৈরি হইতেছে । মনে ভাবিলাম, কর্তৃপক্ষ বুঝিয়াছেন যে, শুধু দমনের বিভীষিকায় অশান্তি দূর হয় না, দাক্ষিণ্যেরও দরকার । দেশ আমার দেশ, সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয় ; এ দেশের ইতিহাসসৃষ্টির ব্যাপারে আমার তপস্তার উপরে সমস্ত দেশের দাবি আছে বলিয়াই এ দেশ আমার দেশ, এই গভীর মমত্ববোধ যদি দেশের লোক অমুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এ দেশে ইংরেজ-রাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে । কালক্রমে বাহিরে সে ইতিহাসের অবসান ঘটিলেও অন্তরে তাহার মহিমা অদ্বীপ হইয়া থাকিবে । তা ছাড়া নিরতিশয় দুর্বলেরও প্রতিকূলতা নৌকার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রের মতো । শান্তির সময় নিরস্তর জল সৈঁচিয়া সেই ফাটা নৌকা বাওয়া যায়, কিন্তু তুফানের সময় যখন সকল হাতই দাঁড়ে হালে পালে আটক থাকে তখন তলার অতি তুচ্ছ ফাটলগুলিই মুশকিল বাধায় । রাগ করিয়া তার উপরে পুলিশের রেগুলেশন বা নন-রেগুলেশন লাঠি ঠুকিলে ফাটল কেবল বাড়িতেই থাকে । ফাঁকগুলিকে বজাইবার জন্য সময়মতো সামান্য খরচ করিলে কালক্রমে অসামান্য খরচ বাঁচে । এই কথা যে ইংলণ্ডের মনীষী রাষ্ট্রনৈতিকেরা বুঝিতেছেন না তাহা আমি মনে করি না । বুঝিতেছেন বলিয়াই হোমরুলের কথাটা উঠিয়াছে ।

ছোটো ও বড়ো

কিন্তু রিগু অন্ধ; সে উপস্থিত কালকেই বড়ো করিয়া দেখে, অনাগতকে উপেক্ষা করে। ধর্মের দোহাইকে সে দুর্বলতা এবং শৌখিন ভাবুকতা বলিয়া অবজ্ঞা করে। অভাবনীর প্রত্যাশার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ইংরেজের এই রিগুর কথাটাকে ভারতবর্ষ সামান্ত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল। যে-সমস্ত ইংরেজ এ দেশে রাজ-সেৱেস্তার আমলা বা পণ্য-জীবী তাহারা ভারতবর্ষের অত্যন্ত বেশি নিকটে আছে। এই নিকটের দৃশ্যের মধ্যে তাদেরই প্রতাপ, তাদেরই ধনসঞ্চয় সব চেয়ে সমৃদ্ধ; আর ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ তাদের সমস্ত সুখসুখ লইয়া ছায়ার মতো অস্পষ্ট, অস্বাস্তব ও স্তান। এই কাছের ওজন, এই উপস্থিত কালের মাপে ভারতবর্ষের দাবি ইহাদের কাছে তুচ্ছ। তাই যে-কোনো বরলাভের প্রভাবে ভারতবর্ষ কিছুমাত্র আত্মশক্তি লাভ করিবে তাহা কীর্ণ হইয়া, খণ্ডিত হইয়া, রক্তশূন্য হইয়া আমাদের কাছে পৌঁছিবে অথবা অর্ধপথে অপঘাতমৃত্যুতে মরিয়া ভারতভাগ্যের মরুপথকে ব্যর্থ সাধুসংকল্পের কঙ্কালে আকীর্ণ করিবে।

এই বাধা দিবার শক্তি যারা বহন করিতেছে অব্যাহত প্রতাপের মদের নেশায় তারা যাতোয়ারা, কঠিন স্বাভাৱ্যতিমানের স্তরসঙ্কিত আবরণে তাহাদের মন ভারতবর্ষের মানুষসংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ ইহাদের কাছে একটা অতি প্রকাণ্ড সরকারি বা সওদাগরি আপিস। এ দিকে ইংলণ্ডের যে ইংরেজ আমাদের ভাগ্যনারক তার রক্তের সঙ্গে ইহাদের রক্তের মিল, তার হাতের উপরে ইহাদের হাত, তার কানের কাছে ইহাদের মুখ, তার মন্ত্রণাগৃহে ইহাদের আসন, তার পোলিটিকাল নাট্যশালার নেপথ্যবিধান-গৃহে ইহাদের গতিবিধি। ভারতবর্ষ হইতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে হইতে ইংলণ্ডের ইংরেজ-সমাজের পরতে পরতে ইহারা মিশিয়াছে; সেখানকার ইংরেজের মনস্তত্ত্বকে ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ইহারা নিজের পককেশের শপথ

কালান্তর

করে, অভিজ্ঞতার দোহাই পাড়ে এবং 'আমরাই ভারতসাম্রাজ্যের শিখরচূড়াকে অপরিমিত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছি' এই বলিয়া ইহারা অপরিমিত প্রশংসা দাবি করে। এই অপ্রভেদী অভিমানের ছায়াস্তরালে আমাদের ভাষা, আমাদের আশা, আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? ইহাকে উত্তীর্ণ হইয়া আপিসের প্রাচীর ডিঙাইয়া, ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া দেখিতে পায় এমন অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি কার কাছে প্রত্যাশা করিব?

যে দূরবর্তী ইংরেজ যুরোপীয় আবহাওয়ার মধ্যে আছে বলিয়াই অন্ধ স্বার্থের কুহক কাটাইয়া ভারতবর্ষকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পায়, ইহারা তাহাদিগকে জানায় যে, নীচের আকাশের ধূলানিবিড় বাতাসের মধ্য দিয়া দেখাই বাস্তবকে দেখা, উপরের স্বচ্ছ আকাশ হইতে দেখাই বস্তুতন্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতশাসনে দূরের ইংরেজের হস্তক্ষেপ কথাকে ইহারা স্পর্ধিত অপরাধ বলিয়া গণ্য করে। ভারতবাসীকে এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজ বলিয়া যে একটি মহৎ জাতি আছে প্রকৃতপক্ষে সেই যে ভারতশাসন করিতেছে তাহা নহে; ভারত-দফতরখানার বহুকালক্রমাগত সংস্কারের অ্যাসিডে কাঁচাবয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে-একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের পক্ষে কৃত্রিম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রজা। যে মানুষ তার সমস্ত মন প্রাণ হৃদয় লইয়া মানুষ, সে নয়; যে মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাঝে মানুষ, সেই তো কৃত্রিম মানুষ। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরাকে কৃত্রিম চোখ বলিতে পারি। এই ক্যামেরা খুব স্পষ্ট করিয়া দেখে কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া দেখে না, তাহা চলতিকে দেখে না, যাহাকে দেখা যায় না তাহাকে দেখে না। এইজন্য বলা যায় যে, ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে। সজীব চোখের পিছনে সমগ্র মানুষ আছে বলিয়া তাহার দেখা কোনো আংশিক প্রয়োজনের পক্ষে যত অসম্পূর্ণ হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাহারই

ছোটো ও বড়ো

সম্পূর্ণতর। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চোখের বদলে আমাদের ক্যামেরা দেন নাই। কিন্তু হার, ভারতশাসনে তিনি এ কী দিলেন? যে বড়ো-ইংরেজ যোলো-আনা মানুষ আমাদের আগে সে থাকে সমুদ্রের ও পারে, আর এ পারে পাড়ি দিতেই এরোজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো আনা ছাট্টা সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া আসে। সেই এতটুকুর পরিমাণ কেবল সেইটুকু যাতে বাড়তির ভাগ কিছুই নাই; অর্থাৎ মানুষের যেটা স্বাদ গন্ধ লাভ্য, যেটা তার কমনীয়তা ও নমনীয়তা, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা নিজেও বাড়িতে থাকে অল্পকেও বাড়াইতে থাকে, সে-সমস্তই কি বাদ পড়িল? এই ছোটোখাটো ছাট্টাছোট্টা ইংরেজ কোনোমতেই বুঝিতে পারে না, এমন অত্যন্ত দামি ও নিখুঁত ক্যামেরা পাইয়াও সজীব চোখের চাহনির অল্প ভিতরে-ভিতরে আমাদের এত তৃপ্তি কেন। বোঝে না তার কারণ, কলে ছাট্ট পড়িবার সময় ইহাদের কল্পনাবৃত্তিটা যে বাদ পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের সরকারি অনাথ-আশ্রমে যারা থাকে তাদের মন কেন পালাই-পালাই এবং প্রাণ কেন ত্রাহি-ত্রাহি করে? কেননা, ঐ ওয়ার্ক-হাউস সম্পূর্ণ ঘরও নয়, সম্পূর্ণ বাহিরও নয়। উহা আত্মীয়তাও দেয় না, মুক্তিও দেয় না। উহা কড়ার গণ্ডার হিসাব করিয়া কেবলমাত্র আশ্রয় দেয়। আশ্রয়টা অত্যন্ত দরকারি বটে, কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ সেইজন্য সে ঘরকে চায়, অর্থাৎ দরকারের সঙ্গে বহুল পরিমাণে অ-দরকারকে না পাইলে সে বাঁচে না। নহিলে সে অপমানিত হয়, সুবিধা-সুযোগ ফেলিয়াও সে পালাইতে চেষ্টা করে। অনাথ-আশ্রমের কড়া কার্যাবলি এই অকৃতজ্ঞতার বিম্বিত ও ক্রুদ্ধ হয় এবং কেবল তার ক্রোধের দ্বারাই হুঃখকে দমন করিবার জন্য সে দণ্ডধারণ করে। কেননা, এই কার্যাবলি পুরা মানুষ নয়, ইহার পুরা দৃষ্টি নাই, এই ছোটো মানুষ মনে করে— চূর্ভাগা ব্যক্তি কেবলমাত্র আশ্রয়ের শান্তিটুকুর

কালান্তর

জন্ম মুক্তি-অসীম-আশায়-ব্যাকুল আপন আত্মাকে চিরদিনের মতোই বণিকের ঘরে বাধা রাখিতে পারে।

বড়ো-ইংরেজ অব্যবহিতভাবে ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে না— সে মাঝখানে রাখিয়াছে ছোটো-ইংরেজকে। এইজন্য বড়ো-ইংরেজ আমাদের কাছে সাহিত্য-ইতিহাসের ইংরেজি পুঁথিতে। এবং ভারতবর্ষ বড়ো-ইংরেজের কাছে আপিসের দফতরে এবং জমাখরচের পাকা খাতায়, অর্থাৎ ভারতবর্ষ তার কাছে সুপাকার স্ট্যাটিষ্টিক্সের সমষ্টি। সেই স্ট্যাটিষ্টিক্সে দেখা যায়— কত আমদানি কত রপ্তানি ; কত আয় কত ব্যয় ; কত জমিল কত মরিল ; শাস্তিরকার জন্ম কত পুলিশ, শান্তি দিবার জন্ম কত জেলখানা ; রেলের লাইন কত দীর্ঘ, কলেজের ইমারত কয় তলা উচ্চ। কিন্তু, সৃষ্টি তো শুধু নীলাকাশ-জোড়া অন্ধের তালিকা নয়। সেই অন্ধমালার চেয়ে অনেক বেশির হিসাবটা ভারত-আপিসের কোনো ডিপার্টমেন্ট দিয়া কোনো মানবজীবের কাছে গিয়া পৌঁছায় না।

এ কথা বিশ্বাস করিতে যত বাধাই থাক, তবু আমাদের দেশের লোকের ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বড়ো-ইংরেজ বলিয়া একটা বড়ো জাতি সত্যই ভূগোলের এক জায়গায় আছে। প্রবলের প্রতি দুর্বল যে অবিচার করে তাহাতে তার দুর্বলতারই পরিচয় হয়— সেই দীনতা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের গৌরব। এ কথা শপথ করিয়া বলা যায় যে, এই বড়ো-ইংরেজ সর্বাংশেই মানুষের মতো। ইহাও নিশ্চিত যে, জগতের সকল বড়ো জাতিই যে ধর্মের বলে বড়ো হইয়াছে ইংরেজও সেই বলেই বড়ো ; অত্যন্ত রাগ করিয়াও এ কথা বলা চলিবে না যে সে কেবল তলোয়ারের ডগায় ভর করিয়া উঁচু হইয়াছে কিম্বা টাকার ধলির উপরে চড়িয়া। কোনো জাতিই টাকা করিতে কিম্বা লড়াই করিতে পারে বলিয়াই ইতিহাসে গৌরব লাভ করিয়াছে, এ কথা অশ্রদ্ধের। মনুষ্যে বড়ো না হইয়াও কোনো জাতি

ছোটো ও বড়ো

বড়ো হইয়াছে, এ কথাটাকে বিনা সাক্ষ্যপ্রমাণে গোড়াতেই ডিসমিস করা যাইতে পারে। জ্ঞান সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এই ইংরেজ জাতির অস্তরের আদর্শ। সেই আদর্শ ইহাদের সাহিত্যে ও ইতিহাসে নানা আকারে ও অধ্যবসারে প্রকাশ পাইয়াছে এবং আজিকার মহাবুদ্ধেও সেই আদর্শ নানা ছন্দা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহাদিগকে শক্তিমান করিতেছে।

এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাষ্ট, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া তার জীবনের পরিবর্তন ও প্রসার ঘটিতেছে। সে কেবল তার রাষ্ট্র ও বাণিজ্য লইয়া নয়, তার শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম ও সমাজ লইয়া পূর্ণপ্রবাহে চলিয়াছে। সে সৃজনধর্মী; যুরোপীয় সভ্যতার বিরূপ যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা। বর্তমান যুদ্ধের মহৎ শিক্ষা তার চিত্তকে প্রতি মুহূর্তে আন্দোলিত করিতেছে। মৃত্যুর উদার বৈরাগ্য-আলোকে সে মানুষের ইতিহাসকে নূতন করিয়া পড়িবার সূযোগ পাইল। সে দেখিল, অপমানিত মানুষের প্রতিকূলে স্বাভাভ্যেব আত্মাভিমানকে একান্ত করিয়া তুলিবার অনিবার্য দুর্ধোগটা কী। সে আজ নিজের গোচরে বা অগোচরে প্রত্যাহ বুঝিতেছে যে, স্বজাতির যিনি দেবতা সর্বজাতির দেবতাই তিনি, এইকল্প তাঁহার পূজায় নরবলি আনিলে একদিন কল্প তাঁর প্রলয়রূপ ধারণ করেন। আজ যদি সে না'ও বুঝিয়া থাকে, এক দিন সে বুঝিবেই যে, হাওয়া যেখানেই পাংলা ঝড়ের কেন্দ্রই সে জায়গাটার— কেননা, চারি দিকের মোটা হাওয়া সেই ফাঁক দখল করিতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি পৃথিবীর যেসব দেশ দুর্বল, সবলেও হৃন্দের কারণ সেখানেই; লোভের ক্ষেত্র সেখানেই; মানুষ সেখানে আপন মহৎরূপে বিরাজ করে না; মানুষ প্রত্যাহই সেখানে অসতর্ক হইয়া আপন মানুষকে শিথিল করিয়া বর্জন করিতে থাকে। শয়তান সেখানে আসন জুড়িয়া ভগবানকে দুর্বল বলিয়া বিক্রম

কালান্তর

করে। বড়ো-ইংরেজ এ কথা বুঝিবেই যে, বাণির উপর বাড়ি করা চলে না, একের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনোই পাকা হইতে পারে না।

কিন্তু ছোটো-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না। যে দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাধিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই দেশের সঙ্গে সে আপনি বাধা। তার জীবনের এক পিঠে আপিস, আর-এক পিঠে আমোদ। যে পিঠে আপিস সে পিঠে সে ভারতের বহুকোটি মানুষকে রাষ্ট্রিকের রাজদণ্ডের বা বণিকের মানদণ্ডের ডগাটা দিয়া স্পর্শ করে, আর যে পিঠে আমোদ সে পিঠটা তাঁদের পশ্চাদিকের মতো বৎসরের পর বৎসর সম্পূর্ণ অদৃশ্য। তবু কেবলমাত্র কালের অঙ্কপাত হিসাব করিয়া ইহারা অভিজ্ঞতার দাবি করে। ভারত-অধিকাংশের গোড়ায় ইহারা সৃষ্ণনের কাজে রত ছিল, কিন্তু তাহার পর বহুদীর্ঘকাল ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাণিজ্যকে প্রধানত পাহারা দিতেছে ও ভোগ করিতেছে। নিরন্তর কঠিনের ঘানি টানিয়া ইহারা বিষয়ী লোকদের পাকা প্রকৃতি পাইয়াছে, সেই প্রকৃতি কঠিন অসাড়তাকেই বল বলিয়া থাকে। তারা মনে করে, তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে, এইটেই বিশ্বের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা। কিন্তু আপিসের জালনার বাহিরে রাস্তার ধুলার উপর দিয়া বিশ্বদেবতা তাঁর রথযাত্রায় অতিদীনকেও যে নিজের সারথ্যেই চালাইতেছেন, এট চালানাকে তারা অশ্রদ্ধা করে। অক্ষয়ের সঙ্গে নিয়ত কারবার করিয়া এ কথা তারা প্রব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মালিক তেমনি তারা ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। 'আমরা এখানে আসিয়াছি' এই কথা বলিয়াই তারা চূপ করে না, 'আমরা এখানে থাকিবই' এই কথা বলিয়া তারা স্পর্ধা করে।

অতএব, ওরে মরীচিকালুক দুর্ভাগা, বড়ো-ইংরেজের কাছ হইতে আহাজ বোঝাই করিয়া বর আসিতেছে, কেবল এই আশাটাকে বুকে

ছোটো ও বড়ো

করিয়াই পশ্চিমের ঘাটের দিকে অত বেশি কলরব করিতে করিতে ছুটিয়ো না। এই আশঙ্কাটাকেও মনে রাখিও যে, ভারতসাগরের তলার তলার ছোটো-ইংরেজের মাইন সার বাধিয়া আছে। এটা অসম্ভব নয় যে, তোমার ডাগো জাহাজের যে ডাঙা কাঠ আছে সেটা স্বাধীনশাসনের অস্ত্যোষ্টিসংকারের কাজে লাগিতে পারে। তার পরে লোনা জলে পেট ভরাইয়া ডাঙার উঠিতে পারিলেই আমাদের অন্তের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।

দেখিতে পাই, বড়ো-ইংরেজের দক্ষিণাকেই চরম সম্পদ গণ্য করিয়া আমাদের লোকে চড়া চড়া কথায় ছোটো-ইংরেজের মুখের উপর জবাব দিতে শুরু করিয়াছেন। ছোটো-ইংরেজের জোর যে কতটা খেয়াল করিতেছেন না। ভুলিয়াছেন, মাঝখানের পুরোহিতের মাথুলি বরাদ্দের পাওনা উপরের দেবতার বরকে বিকাইয়া দিতে পারে। এই মধ্যবর্তীর জোর কতটা এবং ইহাদের যেজাজটা কী ধরনের সে কি বারে বারে দেখি নাই? ছোটো-ইংরেজের জোর কত সেটা যে কেবল আমরা লর্ড রিপনের এবং কিছু পরিমাণে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেখিলাম তাহা নহে, আর-এক দিন লর্ড ক্যানিং এবং লর্ড বেটিংয়ের আমলেও দেখা গেছে।

তাই দেশের লোককে বার বার বলি, 'কিসের জোরে স্পর্ধা কর ? গানের জোর ? তাহা তোমার নাই। কঠোর জোর ? তোমার যেমনি অহংকার থাক সেও তোমার নাই। মুক্কির জোর ? সেও তো দেখি না। যদি ধর্মের জোর থাকে তবে তারই প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখো। স্বৈচ্ছা-পূর্বক ছুঃখ পাইবার মহৎ অধিকার হইতে কেহ তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সত্যের জন্ত, স্ত্রীর জন্ত, লোকশ্রের জন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিবার গৌরব দুর্গম পথের প্রান্তে তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।' বর যদি পাই তবে অন্তর্ধানীর কাছ হইতে পাইব।

কালান্তর

দেখ নাই কি, বরদানের সংকল্প-ব্যাপারে ভারত-গবর্মেণ্টের উচ্চতম বিভাগের যোগ আছে শুনিয়া এদেশী ইংরেজের সংবাদপত্র অট্টহাস্তে প্রশ্ন করিতেছে, 'ভারত-সচিবদের স্নায়ুবিকার ঘটিল নাকি ? এমন কী উৎপাতের কারণ ঘটিয়াছে যে বজ্রপাত-ডিপার্ট্‌মেন্ট্‌ হইতে হঠাৎ বৃষ্টিপাতের আয়োজন হইতেছে ?' অথচ আমাদের ইস্কুলের কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ধরিয়া যখন দলে দলে আইনহীন রসাতলের নিরালোক ধামে পাঠানো হয় তখন ইহারাই বলেন, 'উৎপাত এত গুরুতর যে, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের আইন হার মানিল, মগের মুন্সেফের বে-আইনের আমদানি করিতে হইল।' অর্থাৎ মারিবার বেলায় যে আতঙ্কটা সত্য, মলম দিবার বেলাতেই সেটা সত্য নয়। কেননা মারিতে খরচ নাই, মলম লাগাইতে খরচা আছে। কিন্তু তাও বলি, মারিবার খরচার বিল কালে মলমের খরচার চেয়ে বড়ো হইয়া উঠিতে পারে। তোমরা জোরের সঙ্গে ঠিক করিয়া আছ যে, ভারতের যে ইতিহাস ভারতবাসীকে লইয়া, সেটা সামনের দিকে বহিতেছে না, তাহা ঘূর্ণির মতো একটা প্রবল কেন্দ্রের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তলার মুখেই ঝুঁকিতেছে। এমন সময় আপিস হইতে বাহির হইবার কালে হঠাৎ এক দিন দেখিতে পাও স্রোতটা তোমাদের নকশার রেখা ছাড়াইয়া কিছু দূর আগাইয়া গেছে। তখন রাগিয়া গর্জাইতে গর্জাইতে বল, 'পাথর দিয়া বাধা উসুকা, বাধ দিয়া উহাকে ধরো।' প্রবাহ তখন পথ না পাইয়া উপরের দিক হইতে নীচের দিকে তলাইতে থাকে— সেই চোরা প্রবাহকে ঠেকাইতে গিয়া সমস্ত দেশের বন্ধ দীর্ঘ দীর্ঘ করিতে থাক।

আমার সঙ্গে এই ছোটো-ইংরেজের বে-একটা বিরোধ ঘটয়াছিল সে কথা বলি। বিনা বিচারে শত শত লোককে বন্দী করার বিরুদ্ধে কিছু দিন আগে একখানি ছোটো চিঠি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে ভারতজীবী

ছোটো ও বড়ো

কোনো ইংরেজি কাগজ আমাকে মিথ্যুক ও extremist বলিয়াছিল। ইহারা ভারতশাসনের শুক্‌মাহীন সচিব, সুতরাং আমাদিগকে সত্য করিয়া জানা ইহাদের পক্ষে অনাবশ্যক, অতএব আমি ইহাদিগকে কমা করিব। এমন কি, আমাদের দেশের লোক যারা বলেন আমার পক্ষেও অর্থ নাই, গণ্ডেও বস্তু নাই, তাঁদের মধ্যেও যে ছুই-একজন ঘটনাক্রমে আমার লেখা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে অন্তত এ কথাটুকু কবুল করিতেই হইবে যে, স্বদেশী উদ্ভেজন্যের দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি অতিশয়-পছার বিরুদ্ধে লিখিয়া আসিতেছি। আমি এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে, অন্তায় করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহাতে কখনোই শেষ পর্যন্ত ফলের দাম পোষায় না, অন্তায়ের ঝণটাই ভয়ংকর ভারি হইয়া উঠে। সে যাই হোক, দিশি বা বিলিতি যে-কোনো কালিতেই হোক-না আমার নিজের নামে কোনো লাঞ্ছনাতে আমি ভয় করিব না। আমার যেটা বলিবার কথা সে এই যে, অতিশয়-পছার বলিতে আমরা এই বুঝি, যে পছা না ভদ্র, না বৈধ, না প্রকান্ত; অর্থাৎ সহজ পথে ফলের আশা ত্যাগ করিয়া অপথে বিপথে চলাকেই একসূত্রিত্বম্ বলে। এই পথটা যে নিরতিশয় গর্হিত সে কথা আমি জোরের সঙ্গেই নিজের লোককে বলিয়াছি; সেইজন্যই আমি জোরের সঙ্গেই বলিবার অধিকার রাখি যে, একসূত্রিত্বম্ গবর্মেণ্টের নীতিতেও অপরাধ। আইনের রাস্তা বাধা রাস্তা বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে গম্যস্থানে পৌঁছিতে সূর পড়ে দটে, কিন্তু তাই বলিয়া বেলজিয়মের বুকের উপর দিয়া সোজা ইঁটিয়া রাস্তা সংকেপ করার মতো একসূত্রিত্বম্ কাহাকেও শোভা পায় না।

ইংরেজিতে যাকে 'শর্টকাট' বলে আদিমকালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল। 'লে আও, উম্‌কো শির লে আও' এই প্রণালীতে গ্রহি খুলিবার বিরুদ্ধি বাচিয়া যাইত, এক কোপে গ্রহি কাটা পড়িত। যুরোপের অহংকার এই যে, সে আবিষ্কার করিয়াছে, এই সহজ প্রণালীতে

কালান্তর

গ্রহি কাটা পড়ে বটে কিন্তু মালের গুরুতর লোকসান ঘটে। সত্যতার একটা দায়িত্ব আছে, সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শান্তি দেওয়ার মধ্যে একটা দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শান্তিটাকে স্তায়বিচার-প্রণালীর ফিল্টারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগধ্বংস ও পক্ষপাত-পরিশুদ্ধ করিয়া সত্যসমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। তাহা না হইলেই লাঠিয়ালের লাঠি এবং শাসনকর্তার স্তায়দণ্ডের মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

স্বীকার করি, কাজ কঠিন হইয়াছে। বাংলাদেশের একদল বাঙ্গল ও যুবক স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশীর সত্য যোগসাধনের বাধা-অতিক্রমের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহার জন্য আমরা লজ্জিত আছি। আরো লজ্জিত এইজন্য যে, দেশের প্রতি কর্তব্যনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির বিচ্ছেদ-সাধন করার অকর্তব্য নাই, এ কথা আমরা পশ্চিমের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য মিথ্যা এবং পলিটিক্সের গুপ্ত ও প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি পশ্চিম সোনার সহিত খাদ মিশানোর মতো মনে করেন, মনে করেন ওটুকু না থাকিলে সোনা শক্ত হয় না। আমরাও শিখিয়াছি যে, মানুষের পরমার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে বসাইয়া ধর্ম লইয়া টিক্‌টিক্‌ করিতে থাকা মূঢ়তা, দুর্বলতা, ইহা সেটিমেন্টালিজম্—বর্বরতাকে দিয়াই সত্যতাকে এবং অধর্মকে দিয়াই ধর্মকে বজবৃত্ত করা চাই। এমনি করিয়া আমরা যে কেবল অধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছি তাহা নহে, আমাদের গুরুশায়দের যেখানে বীভৎসতা, সেই বীভৎসতার কাছে মাথা হেঁট করিয়াছি। নিজের মনের জোরে, ধর্মের জোরে, গুরুশায়ের উপরে দাঁড়াইয়াও এ কথা বলিবার তেজ ও প্রতিভা আমাদের আজ নাই যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশুতি।

ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলন্ত বিনশুতি ॥

ছোটো ও বড়ো

অর্থাৎ অধর্মের দ্বারা মানুষ বাড়িয়া উঠে, অধর্ম হইতে সে আপন কল্যাণ দেখে, অধর্মের দ্বারা সে শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু একেবারে মূল হইতে বিনাশ পায়।— তাই বলিতেছি, গুরুশায়দের কাছে আমাদের ধর্মবুদ্ধিরও যে এত বড়ো পরাস্তব হইয়াছে ইহাতেই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশতন্ত্রের আলোক জলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগসঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার কোণ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে; হুঃসহ নৈরাশ্রের পাষণ্ডের বিদীর্ণ করিয়া অন্ধর আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং ছুর্ত্বহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত বৈধ এক-এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে; নির্ভুর আচারের ভায়ে এ দেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে, অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক একসঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে এ কী হইল? দেশতন্ত্রের আলোক জলিল, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়— এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে দৈন্ত, যে অড়তা, যে এত কুল আমরা পোলিটিকাল তিক্তবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সহুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নববসন্তেও সেই দৈন্ত, সেই অড়তা, সেই আত্ম-অবিশ্বাস পোলিটিকাল চৌর্ধ্ববৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ বনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না? এই চোরের পথ আর বীরের পথ কোনো চৌমাথায় একত্র আসিয়া মিলিবে না। যুরোপীয় সভ্যতার এই দুই পথের সম্মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা ভ্রম করি, কিন্তু বিধাতার

কালান্তর

দরবারে এখনো পথের বিচার শেষ হয় নাই সে কথা মনে রাখিতে হইবে। আর বাহু ফললাভই যে চরম লাভ এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে— বিধাতার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, তার পর পোলিটিকাল মুক্তি যদি পাই তো ভালো, যদি না পাই তবে তার চেয়ে বড়ো মুক্তির পথকে কলুষিত পলিটিক্সের আবর্জনা দিয়া বাধাগ্রস্ত করিব না।

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবী শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে অলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেণ্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিস্তৃত অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধন-মানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সখল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই; ছোটো-ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমতো বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে, এঁ ছুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই। অল্প সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হইয়া দিকে দিকে চলিয়া গেছে, যেখানে শুভ ইচ্ছা এবং শুভ ইচ্ছার কেন্দ্র এই দুইয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেইখানে এই রকমের

ছোটো ও বড়ো

দৃঢ়সংকল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। আত্মঘাতী শতীশ্বের অস্তিত্বের চিঠি পড়িলে বোঝা যায় যে, এ ছেলেকে যে ইংরেজ গান্ধী দিয়াছে সেই ইংরেজের দেশে এ যদি অন্তিত্ত তবে গৌরবে বাঁচিতে এবং ততোধিক গৌরবে মরিতে পারিত। আদিম কালের বা এখনকার কালের যে-কোনো রাজা বা রাজার আমলা এই শ্রেণীর জীবনবান ছেলেদের শাসন করিয়া, দমন করিয়া, দেশকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত অসাড় করিয়া দিতে পারে। ইহাই মহৎ, কিন্তু ইহা শুধু নয়, এবং আমরা অনিরাছি, ইহা ঠিক ইংলিশ নহে। যারা নিরপরাধ অথচ মহৎ, অথবা মহৎ উৎসাহের ক্ষণিক বিকারে যারা পথ ভুল করিয়াছে, যারা উপরে চড়িতে গিয়া নীচে পড়িয়াছে এবং অতঃপর পাইলেই যারা সে পথ হইতে ফিরিয়া এক দিন জীবনকে সার্থক করিতে পারিত, এমন-সকল ছেলেকে সম্বন্ধ মাত্রেয় 'পরে নির্ভর করিয়া চিরজীবনের মতো পন্থ করিয়া দেওয়ার মতো মানবজীবনের এমন নির্মম অপব্যয় আর-কিছুই হইতে পারে না। দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুপ্ত দলনের হাতে নির্বিচারে ছাড়িয়া দেওয়া— এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি? এ-যে পাপকে হীনতাকে রাজপেয়াদার তকমা পরাইয়া দেওয়া। এ যেন রাতছপূরে কাঁচা কসলের খেতে মহিবের পাল ছাড়িয়া দেওয়া। যার খেতে সে কপাল চাপড়াইয়া হার-হার করিয়া যবে, আর যার মহিব সে বুক ফুলাইয়া বলে— বেশ হইয়াছে, একটা আগাছাও আর বাকি নাই।

আর-একটা সর্বনাশ এই যে, পুলিশ একবার যে চারায় অন্নমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনো কালে ফুলও কোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালার বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি তেমনি বিজ্ঞা, তেমনি চরিত্র; পুলিশের হাত হইতে সে বিকৃত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে শুকন বয়সে উন্নাদ

কালান্তর

হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তার কাছে ব্রিটিশরাজের একচুল মাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না, অথচ তার কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তার আশা করিতে পারিত। পুলিশের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। কিছু কাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমের জেলাস্কুলে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিশের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত। আর বেশি কিছু করিবার দরকার নাই; উহাদের নিখাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে শুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিশে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না। এমন কি, যে মরিয়া মানুষকে বৃদ্ধ ক্রম দরিদ্র কুশ্রী কুচরিত্র কেহই কিছু হঠাইতে পারে না, বাংলাদেশের সেই কল্লেখ্যাদায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে। সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিছু দান করিতে বিপদ গণি। দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ষ নষ্ট হইবে।

যে অধ্যক্ষদের 'পরে এই বিভীষিকা-বিভাগের তার তাঁরা তো রক্তমাংসের মানুষ। তাঁরা তো রাগহেববিবজিত মহাপুরুষ নন। রাগ বা আতঙ্কের সময় আমরাও যেমন অল্প প্রমাণেই ছারাকে বস্ত্র বলিয়া ঠাহর করি, তাঁরাও ঠিক তাই করেন। সকল মানুষকে সন্দেহ করাটাই যখন তাঁদের ব্যবসায় হয় তখন সকল মানুষকে অবিভাগ করাটাই তাঁদের স্বভাব হইয়া ওঠে। সংশয়ের সামান্য আভাস মাত্রকেই চূড়ান্ত করিয়া নিরপেদকে পাকা করিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হয়— কেমনা, উপরে তাঁদের দায়িত্ব অল্প, চারি পাশের লোক তবে নিস্তর, আর পিছনে

ছোটো ও বড়ো

ভারতের ইংরেজ হয় উদাসীন নয় উৎসাহদাতা। যেখানে স্বাভাবিক দরদ নাহি অথচ ক্রোধ আছে, এবং শক্তিও অব্যাহত, সেখানে কার্যপ্রণালী যদি গুপ্ত এবং বিচারপ্রণালী যদি বিমূখ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেই যে স্তায়-ধর্ম রক্ষিত হইতেছে এ কথা কি আমাদের ছোটো-ইংরেজও সত্যই বিশ্বাস করেন? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই যে কাজ উদ্ধার হইতেছে। কারণ দেখিয়াছি, জার্মানিও এই বিশ্বাসের জোরে ইন্টারন্যাশনাল আইনকে এবং দয়া-ধর্মকে অগ্রাহ করিয়া যুদ্ধ জিতিবার নিয়মকে সহজ করিয়াছে। তাঁর কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে আজ বড়ো-জার্মানের চেয়ে ছোটো-জার্মানের প্রস্তাব বড়ো হইয়াছে, যে জার্মান কাজ করিবার যত্ন এবং যুদ্ধ করিবার কায়দা মাত্র। আবার বলি, 'শির লে আও' বলিতে পারিলে রাজকার্য উদ্ধার হইতে পারে, যে রাজকার্য উপস্থিতের; কিন্তু রাজনীতির অধঃপতন ঘটে, যে রাজনীতি চিরদিনের। এই রাজনীতির জন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইংরেজ লড়াই করিয়াছে, এই রাজনীতির বাস্তিচায়েই জার্মানির প্রতি মহৎ ঘৃণার উদ্দীপ্ত ইংরেজ যুবক দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে অথও করিয়া দেখিবার অধ্যাত্মদৃষ্টি যাহাতে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বালকদের পক্ষে দুর্বল বা কল্পিত না হয়, আমি এই লক্ষ্য দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছি। তাই এই আশ্রমের শুভকার্যে ইংরেজ সাধকেরও জীবন-উপহার দাবি করিতে আমি কুণ্ঠিত হই নাই। পরম সত্যকে আমি কোনো বড়ো নামের দোহাই দিয়া খণ্ডিত করিতে চাই নাই, ইহাতে আমার ধর্মনীতিকে নিজ্বের ইংরেজ ও এদেশী শিষ্যগণ দুর্বলের ধর্মনীতি ও যুযুঁর সাধনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন। আমাদের অবস্থা স্বাভাবিক; আমাদের বর্তমানের ক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের আশা চারি দিকে সংকীর্ণ;

কালান্তর

আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তিবিকাশের উৎসাহ কীণ ও সুযোগ বাধাগ্রস্ত ; বড়ো বড়ো উচ্চত পদমান ও দায়িত্বের নিম্নতলের আওতার কৃশ খর্ব হইয়া আমরা যে ফল ফলাইয়া থাকি জগতের হাতে তার প্রয়োজন তুচ্ছ, তার দাম যৎকিঞ্চিৎ ; অথচ সেই খর্বতাটাই আমাদের চিরস্থ্যভাব এই অপবাদ দিয়া সেই আওতাটাকে চিরনিবিড় করিয়া রাখা আমাদের মতো গুল্মের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা চলিতেছে— এই অবস্থায় যে অবসাদ আনে তাহাতে দেশের লোকের মন অন্তরে অন্তরে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে । এই কারণেই ভরষেব-বিবর্তিত আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনের উপদেশ এ দেশে আজকাল শ্রদ্ধা পায় না । তবু আমার বিশ্বাস, এই-সকল বাধার সঙ্গে লড়াই করিয়াও আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই । কেননা বাধা ছুরছ হইলেও পরমার্থের সত্যটিকে মানুষের সামনে উপস্থিত করিলে সে তাকে একেবারে অশ্রদ্ধা করিতে পারে না— এমন কি, আমাদের দেশের অত্যন্ত আধুনিক ছেলের পক্ষেও তাহা কঠিন হয় । আমাদের এই স্বভাব সম্বন্ধে পাঞ্জাবের লাটের সঙ্গেও আমার মতের মিল আছে । কিন্তু এক-এক সময়ে এমন দুর্যোগ আসে যখন এই বাঙালির ছেলের মতো অত্যন্ত ভালোমানুষের কাছেও উচ্চতম সত্যের কথা অবজ্ঞাভাজন হইয়া উঠে । কেননা, রিপূর সংঘাতে রিপূ জাগে, তখন প্রমত্ততার উপরে কল্যাণকে স্বীকার করা দুঃসাধ্য হয় । আমাদের আশ্রমে ছুটি ছোটো ছেলে আছে । তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল । বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ জোগাইয়াছে । একছু কাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায়ণ হইয়াছে । এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলেছটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহাৰাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল । এই ছেলে-ছটি কেবল যে নিজের গানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ

ছোটো ও বড়ো

কত তা তারা জানে। যে ব্যথার অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই। বাপকে ম্যালেরিয়ার ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেঁচা করিতেছেন বাতে তাঁকে বাহ্যিকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই-সমস্ত হুঁচিকার হুঁখ এই শিশুছটিকেও পীড়া দিতেছে। এ সম্বন্ধে ছেলেছটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না— কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুঠা বোধ হয়; তখন সেই-সকল লোকের বিক্রমহাস্ত-কুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যারা পাঞ্জাবের লাটের মতোই সাম্বিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন। এমনি করিয়া রিপূর সহিত রিপূর চক্ৰমকি ঠোকার আঙন জলিতেছে; এমনি করিয়া বাংলাদেশের প্রদেশে প্রদেশে হুঁখে আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অস্তরের নিত্যভাঙারে সঞ্চিত করিতেছে। শাসনকর্তার অদৃশ মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলি আগিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিস্তর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু। ইহাদিগকে কি non-combatants বলিবে না ?

যদি জিজ্ঞাসা কর, এই ছুট সমস্তার মূল কোথায়, তবে বলিতেই হইবে— স্বাধীন শাসনের অভাবে। ইংরেজের কাছে আমরা বড়োই পর, এমন কি, চীন-জাপানের সঙ্গেও তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক সামীপ্য অনুভব করেন— এ কথা তাঁদের কোনো কোনো বিদ্বান ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। তার পরে আমাদের আধ্যাত্মিকতা আছে, শুনিতেছি তাঁদের সে বালাই নাই— এত বড়ো মূলগত প্রভেদ মানুষে মানুষে আর-কিছু হইতেই পারে না। তার পরে তাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, আমাদের সঙ্গ রাখেন না। যেখানে এত দূরত্ব, এত কম জানা, সেখানে সতর্ক সন্ধিগ্ধতা একমাত্র পলিসি হইতে বাধ্য। সেখানে

কালান্তর

দেশের যেসব লোক স্বার্থপর ও চতুর, যারা অঐতনিক গুণচরবৃত্তি করাই উন্নতির উপায় বলিয়া জানে, তাদের বিবাক্ত প্রভাব শাসনতন্ত্রের ছিদ্রে ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মিথ্যায় এবং মিথ্যার চেয়ে ভয়ংকর অর্থগত্যে ভরিয়া রাখে। যারা স্বার্থের চেয়ে আত্মসম্মানকে বড়ো জানে, যারা নিজের উন্নতির চেয়ে দেশের মঙ্গলকে শ্রেয় বলিয়া জানে, তারা যতক্ষণ না পুলিশের গ্রাসে পড়ে ততক্ষণ এই শাসনব্যবস্থা হইতে যথাসম্ভব হুরে থাকে। এই নিয়ত পা টিপিয়া চলা এবং চুপিচুপি বলা, এই দিনরাত আড়ে আড়ে চাওয়া এবং ঝোপে ঝাড়ে ঘোরা— আর-কিছু নয়, এই-যে অবিরত পুলিশের সঙ্গ করা— এই কলুষিত হাওয়ার মধ্যে যে শাসনকর্তা বাস করেন তাঁর মনের সন্দেহ কাজে নিদাক্ষণ হইয়া উঠিতে কোনো স্বাভাবিক বাধা পায় না। কেননা, তাঁদের কাছে আমরা একটা অবচ্ছিন্ন সস্তা, আমরা কেবলমাত্র শাসিত সম্প্রদায়। সেইজন্য আমাদের ঘরে যখন মা কাঁদিতেছে, স্ত্রী আত্মহত্যা করিতেছে, শিশুদের শিক্ষা বন্ধ, যখন ভাগ্যহীন দেশের বহু হুঃখের সংচেষ্টাগুলি সি-আই-ডি'র বাক্য ইশারা মাজে চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে— তখন অপর পক্ষের কোনো মানুষের ডিনারের ক্ষুধা বা নিশ্চৈতন্যের ব্যাঘাত ঘটে না এবং ব্রিজ-খেলাতেও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা দোষারোপ করিয়া বলিতেছি না, ইহা স্বাভাবিক। এই-সব মানুষই যেখানে ষোলো-আনা মানুষ, সেখানে আপিসের তুকনো পার্চমেন্টের নীচে হইতে তাঁদের হৃদয়টা সম্ভবত বাহির হইয়া থাকে। ব্যুরোক্রেসি বলিতে সর্বত্রই সেই কর্তাদের বোঝার যারা বিধাতার সৃষ্ট মনুষ্যলোক লইয়া কারবার করে না, যারা নিজের বিধানরচিত একটা কৃত্রিম জগতে প্রভুত্বজাল বিস্তার করে। স্বাধীন দেশে এই ব্যুরোক্রেসি সর্বপ্রধান নয়, এইজন্য মানুষ ইহাদের কাঁকের মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে। স্বাধীন দেশে এই ব্যুরোক্রেসি কোথাও একটুও

ছোটো ও বড়ো

কাঁক রাখিতে চায় না। আমরা যখন খোলা আকাশে বাধা তুলিবার জন্য কাঁকের দরবার করি, তখন ইহাদের ছোটোবড়ো শাখাপ্রশাখা সমুদ্রের এপারে-ওপারে এমনি অচণ্ড বেগে আন্দোলিত হইতে থাকে যে, তখন আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবি— কাঁকে কাজ নাই, এখন ঐ ডালের ঝাপটা খাইয়া ভাঙিয়া না পড়িতে হয়। তবু শেষ কথাটা বলিয়া রাখি— কোনো অস্বাভাবিকতাকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে অত্যন্ত বলবান জাতিও শেষ পর্যন্ত সন্তানের আগার সিধা রাখিতে পারে না। ভার বাড়িয়া ওঠে, হাত ক্লান্ত হয় এবং বিশ্বপৃথিবীর বিপুল ভারাকর্ষণ স্বভাবের অসামঞ্জস্যকে খুলিসাৎ করিয়া দেয়।

স্বাভাবিকতাটা কী? না, শাসনপ্রণালী যেমনি হোক আর যারই হোক, দেশের লোকের সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্রের দায়িত্বের যোগ থাকা, দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতি দেশের লোকের সম্মত থাকা। সেই শাসন নিরবচ্ছিন্ন বাহিরের জিনিস হইলে তার প্রতি প্রজার ঐদাসীন্দ্র বিতৃষ্ণার পরিণত হইবেই হইবে। আবার সেই বিতৃষ্ণাকে ধারা বাহিরের দিক হইতেই দমন করিতে থাকেন তাঁরা বিতৃষ্ণাকে বিধেবে পাকাইয়া তোলেন। এমনি করিয়া সমস্তা কেবলই অটলতর হইতে থাকে।

বর্তমান যুগসত্যের দূত হইয়া ইংরেজ এ দেশে আসিয়াছেন। যে কালের যাহা সব চেয়ে বড়ো বিশ্বসম্পদ তাহা নানা আকারে নানা উপায়ে দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িবেই। ধারা সেই সম্পদের বাহন তাঁরা যদি লোভের বশ হইয়া ক্লপণতা করেন, তবে তাঁরা ধর্মের অভিপ্রায়কে অনর্থক বাধা দিয়া দুঃখ সৃষ্টি করিবেন; কিন্তু তাঁরা যে আশ্রয় বহন করিতেছেন তাকে চাপা দিয়া রাখিতে পারিবেন না। যাহা দিবার তাহা তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে; কেননা এ দানে তাঁহারা উপলক্ষ্য, এ দান এখনকার যুগের দান। কিন্তু অস্বাভাবিকতা হইতেছে এই যে, তাঁদের ঐতিহাসিক গুরু পক্ষের দিকে তাঁরা যে সত্যকে বিকীর্ণ

কালান্তর

করিতেছেন, তাঁদের ঐতিহাসিক কৃষ্ণ পক্ষের দিকে তাঁরাই সেই সত্যকে শাসনের অঙ্ককারে আচ্ছন্ন করিতেছেন। কিন্তু নিজের প্রকৃতির এক অংশকে তাঁরা আর-এক অংশ দিয়া কিছুতেই প্রবঞ্চিত করিতে পারিবেন না। বড়ো-ইংরেজকে ছোটো-ইংরেজ চিরদিন স্বার্থের বাধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিলে দুঃখদুর্গতি বাড়াইতে থাকিবেন। ঐতিহাসিক খেলায় হাতের কাগজ দেখাইয়া খেলা হয় না। তার পরিণাম সমস্ত হিসাবের বিরুদ্ধে হঠাৎ দেখা দিয়া চমক লাগায়। এইজন্য মোটের উপর এই তত্ত্বটা বলা যায় যে, কোনো অস্বাভাবিকতাকে দীর্ঘকাল প্রশ্রয় দিতে দিতে যখন মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, আমার তৈরি নিয়মই নিয়ম, তখনই ইতিহাস হঠাৎ একটা সামান্ত ঠোকর খাইয়া উল্টাইয়া পড়ে। শত বৎসর ধরিয়! মানুষ মানুষের কাছে আছে অথচ তার সঙ্গে মানবসম্বন্ধ নাই, তাকে শাসন করিতেছে অথচ তাকে কোনো-মতেই আশ্বাস করিতেছে না, পূর্বদরণীর প্রাচীর ভাঙিয়া পশ্চিম একে-বারে তার গোলাবাড়ির ভিতরে আসিয়া পড়িল অথচ এ যন্ত্র ছাড়িল না যে 'never the twain shall meet' — এত বড়ো অস্বাভাবিকতার দুঃখকর বোঝা বিশ্বে কখনোই অটল হইয়া থাকিতে পারে না। যদি ইহার কোনো স্বাভাবিক প্রতিকার না থাকে তবে একটা ঐতিহাসিক ট্রাজেডির পঞ্চমাকে ইহার যবনিকাপতন হইবে। ভারতবর্ষে আমাদের দুর্গতির যে মর্মান্তিক ট্রাজেডি তারও তো পালা অনেক যুগ ধরিয়! এমনি করিয়া রচিত হইয়াছিল। আমরাও মানুষকে কাছাকাছি রাখিয়াও দূরে ঠেকাইবার বিস্তারিত আয়োজন করিয়াছি; যে অধিকারকে সকলের চেয়ে মূল্যবান বলিয়া নিজে গ্রহণ করিলাম অন্তকে কেবলই তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি; আমরাও 'স্বধর্ম' বলিয়া একটা বড়ো নাম দিয়া মানুষের অবমাননা করিয়া নিত্যধর্মকে পীড়িত করিয়াছি। শাস্ত্রবিধির অতি কঠিন বাধন দিয়াও

ছোটো ও বড়ো

এই অস্বাভাবিকতাকে, এই অপবিত্র দেবজ্ঞোহকে আমরা নিজের ইতিহাসের অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমাদের বল এইখানেই; কিন্তু এইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতা। এইখানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা প্রতি পদে কেবল আপনাকে মারিতে মারিতে মরিয়াছি।

বর্তমানের চেহারা যেমনি হোক, তবু এই আশা, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিয়াছি যে, পশ্চিম পূর্বের সহিত মিলিবে। কিন্তু এইখানে আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমরা যদি ছোটো হইয়া তর পাই তবে ইংরেজও ছোটো হইয়া তর দেখাইবে। ছোটো-ইংরেজের সমস্ত জোর আমাদের ছোটো শক্তির উপরে। পৃথিবীর সেই ভাবী যুগ আসিয়াছে, অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রকে দাঁড়াইতে হইবে। সেদিন যে মারিতে পারিবে তার ক্ষিত হইবে না, যে মারিতে পারিবে তারই তর হইবে। সেদিন ছুঃখ দেয় যে মানুষ তার পরাস্ত হইবে, ছুঃখ পায় যে মানুষ তারই শেষ গৌরব। সেদিন মাংসপেশীর সহিত আশ্বার শক্তির সংগ্রাম হইয়া মানুষ জানাইয়া দিবে যে, সে পশু নয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম সে অতিক্রম করিয়াছে। এই মহত্ব প্রমাণ করিবার তার আমাদের উপর আছে। পূর্ব-পশ্চিমের যদি মিলন ঘটে তবে একটা মহৎ আইডিয়ালের উপর হইবে। তাহা নিছক অক্ষুণ্ণের উপরে হইবে না। এবং কামান বন্দুক এবং রণতরীর উপরও হইবে না। ছুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, যত্নকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে যত্নের আমাদের সহায় হইবেন। আমরা যদি শক্তি না পাই, তবে অশক্তের সহিত শক্তের মিলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। একতরুণা আধিপত্যের যোগ যোগই নহে। আমাদেরকে নিজের শক্তিতেই পরের শক্তির সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে। সেই শক্তি ধার-করা শক্তি, তিকা-করা শক্তি না হউক। তাহা সত্যের অস্ত, সত্যের অস্ত ছুঃখ সহিবার অপরিণীম

কালান্তর

শক্তি হউক। অগতে কাহারও সাধ্য নাই— চুঃখের শক্তিকে, ত্যাগের শক্তিকে, ধর্মের শক্তিকে বলির পশুর যতো শিকল দিয়া বাধিয়া রাখিতে পারে। তাহা হারিয়া জেতে, তাহা মরিয়া অমর হয়, এবং মাংসপেশী আপন জয়স্বস্ত্র নির্মাণ করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিতে পায় সে পক্ষাঘাতে অচল হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৪

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

দেড় শো বৎসর পার হইয়া গেল, ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষকে আগাগোড়া দখল করিয়া বসিয়াছে। এ শাসনে ভারতের কল্যাণ হইয়াছে কি না, তার ধনসম্পদ শিল্পবাণিজ্য পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে কি না তার আত্মশক্তির ও আত্মশাসনের সুযোগ বিস্তৃত হইয়াছে কি না, সে তর্কে আমাদের কোনো লাভ নাই, কারণ এ তর্কে অতীত মুছিব না এবং বর্তমানের চুঃখ মুছিব না। ঐতিহাসিক কৌতূহলের তরফ হইতেও ইহার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ, অনেক তথ্য আছে যাহা গোপনে এবং নীরবে ছাড়া স্বরণ করিয়া রাখিবার হুকুম আমাদের নাই। অতএব এমন আলোচনার আমার দরকার কী যার পরিণাম শুভ বা সন্তোষজনক না হইতে পারে ?

কিন্তু একটা কথা আছে যার সম্বন্ধে কোনো ঢাকাঢাকি নাই। এ কথা সকল পক্ষেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এত কালের সম্বন্ধে পূর্ব ও পশ্চিম মেলে নাট, বরং তাদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়াই চলিল। যখন দুই জাতি পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে বাধ্য অথচ উভয়ের মধ্যে সত্যকার মিলন অসম্ভব, তখন এ সংশ্রব হইতে যত উপকারই পাই ইহার বোঝা বড়ো ভারি। অতএব যখন আমরা বলি যে এই অস্বাভাবিক বিচ্ছেদের জড়তারে চাপা পড়িয়া আমাদের হাড়ে-মাংসে এক হইল, তখন সে কথা আমাদের শাসনতন্ত্রের অতিপ্রায় বা প্রশালীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভাবে বলি না। আজকের দিনে সে কথাটা আমাদের ভারতবর্ষের ভালোমনকে ছাড়াইয়াও অনেক দূর প্রসারিত। আমাদের নিজের ব্যথা হইতে মুক্তি পাবি, আজ এমন একটা প্রবল সত্যতা জগৎ জুড়িয়া আপন জাল বিস্তার করিতেছে বা

কালান্তর

শোষণ করিতে পারে, শাসন করিতে পারে, কিন্তু যার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে শক্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলাইয়া দেয়— যে সত্যতা অবজ্ঞার সহিত বাহির হইতে আমাদের মাথার উপর উপকার বর্ষণ করে অথচ আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা উচ্ছতভাবে দাবি করিতে থাকে, অর্থাৎ যাহা দানের সঙ্গে হৃদয় দেয় না অথচ প্রতিদানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সত্যতার মধ্যে বুদ্ধিসম্পদ যথেষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু ইহাতে এমন একটি সত্যের কমতি আছে যে সত্য মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। এইজন্যই যেসব জাত এই আধুনিক সত্যতার হাতে গড়িয়া উঠিল তারা কোনো মুশকিলে ঠেকিলেই প্রথমেই বাহিরের দিকে হাংড়ায়— মনে করে তাদের আপিসে, তাদের কার্যপ্রণালীতে একটা-কিছু লোকসান ঘটিয়াছে; মনে করে সেই প্রণালীটাকেই সারিয়া লইলে তারা উদ্ধার পাইবে। তাদের বিশ্বাস, মানুষের সংসারটা একটা সত্তরঞ্চ খেলা, বড়েগুলোকে বুদ্ধিপূর্বক চালাইলেই বাজি মাত করা যায়। তারা এটা বুঝিতে পারে না যে, এই বুদ্ধির খেলায় যাকে জিত বলে মানুষের পক্ষে সেইটেই সব চেয়ে বড়ো হার হইতে পারে।

মানুষ এক দিন স্পষ্ট হটক, অস্পষ্ট হটক, এই একটি বিশ্বাসে আসিয়া পৌছিয়াছিল যে, কোনো-একটি সত্তা আছেন যার সঙ্গে সঙ্কট থাকতেই আমাদের পরম্পরের প্রতি সঙ্কট সত্য হইয়াছে। সেই দিন হইতেই তার ইতিহাস শুরু হইয়াছে। যুরোপের বৈজ্ঞানিক-বুদ্ভি বলে, এই বিশ্বাসের গোড়া ভূতের বিশ্বাসে। কিন্তু আমরা জানি, গুটা একেবারেই বাজে কথা। মানুষের পরম্পরের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য আছে, সেই ঐক্যবোধের ভিতরেই ঐ বিশ্বাসের মূল; এবং এই ঐক্যবোধই মানুষের কর্তব্যনীতির ভিত্তি। এই একটি সত্যের উপলব্ধিই মানুষের

স্বাধিকারপ্রমত্ত:

সমস্ত নৃজনীশক্তির মধ্যে প্রাণ ও জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছে, ইহাতেই সে আপন আত্মানুভূতির মধ্যে অসীমের স্পর্শ লাভ করিল।

স্বভাবতই ইতিহাসের আরম্ভে মানুষের ঐক্যবোধ এক-একটি জাতির পরিধির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যেমন বড়ো খেতের মধ্যে চারা রোপণ করিবার আগে ছোটো খেতের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়, এও ঠিক তেমনি। এইজন্য গোড়ায় মানুষ আপন দেবতাকে স্বজাতির বিশেষ দেবতা বলিয়াই গণ্য করিত, এবং তার কর্তব্যের দায়িত্ব বিশেষ ভাবে তার স্বজাতির সীমার মধ্যেই সংকীর্ণ ছিল।

আর্যরা যখন ভারতে আসিলেন তখন তাঁরা যে দেবতা ও যে পূজাবিধি সঙ্গে আনিলেন সে যেন তাঁদের নিজের বিশেষ সম্পত্তির মতোই ছিল। অন্যদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই বাধিল— সে লড়াই কিছুতেই মিটিতে চায় না, অবশেষে যখন আর্যসাধক সর্বভূতের মধ্যে সর্বভূতাত্মাকে উপলব্ধি ও প্রচার করিলেন তখনি ভিতরের দিক হইতে বিরোধের গোড়া কাটা পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে মনীষা না জাগিলে বিঃদের মধ্যে মিলন আসে কী করিয়া ?

মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাকল্যের ভিতরে ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্‌বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধধর্মের অশোকের মতো যোগল-সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সূফির অভ্যাস হইয়াছিল ধারা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাচার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।

কালান্তর

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সঙ্কল্পের সাধনা আত্মিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্বী আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা ; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণ করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্বী আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মার সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আরো অনেক বড়ো লোক এবং বুদ্ধিমান লোক আমাদের কালে দেখিয়াছি। তাঁরা পশ্চিমের গুরুত্ব কাছে শিক্তা পাইয়াছেন। এই পশ্চিমের বিস্তারিত নিজেদের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত ভীত করিয়া অক্ষুণ্ণ করিতে শেখায়— এই শিক্তায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অল্প জাতির প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ পার্থক্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য এই শিক্তা জগতের যেখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই পরজাতির প্রতি সন্দেহসংকুল বিরুদ্ধতা জাগিয়াছে ; সেইখানেই মানুষ অল্প দেশের মানুষকে ছলে বলে ঠেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত সুযোগ নিজে পূরা দখল করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উত্তত করিয়া তুলিতেছে। এই-যে একটা প্রকাণ্ড ব্যহবন্ধ অহংকার ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই-যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার দৃষ্টিকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার চেষ্টা, ইহা আজ বিলিতি মদ এবং আর-আর পণ্যত্রব্যের সঙ্গে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিক্তায় বিপুল ও প্রবল মিথ্যার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে সেটুকু আমাদের কাছে লইতে হইবে ; নহিলে আমাদের প্রকৃতি এককোঁকা হইয়া পড়িবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও মনে

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

রাখা চাই যে, ভারত যদি এমন কোনো সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে যাহার অভাবে অন্য দেশের সত্যতা আপন সামঞ্জস্য হারাইয়া টলিয়া পড়িতেছে, তবে আজ সেই সত্যকে বলের সঙ্গে প্রকাশ করাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ ।

আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে । এই মহৎ ঘটনার অন্ত তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই । তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিধে জীর্ণ, পারস্ত পদদলিত ; তাই কঙ্গোর যুরোপীয় বণিকের দানবগীলা এবং পিকিনে বঙ্গার যুদ্ধে যুরোপীয়দের বীভৎস নিদাক্রমতা দেখিয়াছি । ইহার কারণ, যুরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে সত্য বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে । ইহাতে কিছু দূর পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পার করিবে না । বালকবয়সে এক প্রকার দুর্দান্ত আত্মসম্মতি তেমন অসংগত হয় না, কিন্তু বয়স হইলে সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করিবার সময় আসে ; তখনো যদি মানুষ পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে না শেখে তবে তাহাতে অন্তরও অসুবিধা ঘটে এবং তাহারও চিরদিন সুবিধা ঘটে না ।

আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেস করিয়া বুঝিতেছে, স্বাভাবিকতা বলিতে কী বুঝায় । এত দিন যে স্বাভাবিকতার সমস্ত সুবিধাটুকু ইহারা নিজে ভোগ করিয়াছে এবং সমস্ত অসুবিধার বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে, আজ তাহার ধাক্কা ইহাদের নিজের গৃহপ্রাচীরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ।

এত দিন মানুষ বলিতে ইহারা মুখ্যত আপনাদিগকেই বুঝিয়াছে । তাহাতে ইহাদের আত্মোপলব্ধি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যে প্রচণ্ডরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ; এবং এই সীমার বাহিরে নিজের সুবিধা এবং

কালান্তর

অসুবিধা অনুসারে, নিজের লাভক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া, ইহারা ধর্মবুদ্ধিকে কমাইয়া বাড়াইয়া বেশ সহজ করিয়া আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু সুবিধার মাপে সত্যকে ছাঁটিতে গেলে সত্যও আমাদের কাছে ছাঁটিতে আসে। কিছু দিন ও কিছু দূর পর্যন্ত সে অবজ্ঞা সহ করিয়া যায়। তার পরে এক দিন হঠাৎ সে স্তূদে আসলে আপনার পাওনা আদায় করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন সময়ে আগে যেটা অত্যন্ত অসুবিধার সময়, এমন উপলক্ষ্যে আসে যেটা হয়তো অত্যন্ত তুচ্ছ। তখন সেটাকে আমরা বিধাতার অবিচার মনে করি। অধর্মের টাকায় ভদ্র সমাজে যে মানুষ গোরবে বয়স কাটাইল, হঠাৎ এক দিন যদি তার খাতা ধরা পড়ে তবে সেটাকে সে অস্বাভাবিক অত্যাচার বলিয়াই মনে করে। বড়ো বড়ো সত্য জ্ঞানি তেমনি আপন সমৃদ্ধিকে এমনি স্বাভাবিক এবং সুসংগত বলিয়া মনে করে যে, দুর্দিন যখন তার সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস লইয়া কৈফিয়ত তলব করে তখন সেটাকে সে সুবিচার বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

এইজন্য দেখিতে পাই, যুরোপ যখন কঠিন সংকটে পড়ে তখন বিধাতার রাজ্যে এত দুঃখ কেন ঘটে তা লইয়া সে ভাবিয়া কুল পায় না। কিন্তু পৃথিবীর অন্ত অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অপমান ভোগ করে, সে কথা লইয়া বিধাতাকে কিবা নিজেকে তেমন জোরের সঙ্গে এরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। তা হউক, এই সহজ সত্যটুকু তার ভালো করিয়াই জানা দরকার ছিল যে, মানুষের জিনিস একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে। সেটাকে যখন কেহ স্বার্থের বা স্বজাতির খাতিরে খণ্ডিত করে তখন শীঘ্রই হোক, বিলম্বেই হোক, তার আঘাত এক দিন নিজের বক্ষে আসিয়া পৌঁছে। ঐ মানুষের উপলক্ষী কী পরিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা লইয়াই সত্যতার বিচার হইবে— নহিলে, তার আমদানি-রফতানির প্রাচুর্য, তার রণতরীর দৈর্ঘ্য,

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

তার অধীন দেশের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের এই বিচারে আমরা পূর্বদেশের লোকেরা প্রধান সাক্ষী। আমাদেরকে অসংকোচে সত্য বলিতে হইবে, তার কল আমাদের পক্ষে যত কঠিন এবং অন্তদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের বাণী প্রভুত্বের বাণী নয়, তার পশ্চাতে শস্ত্রবল নাই। আমরা সেই উচ্চ রাজতন্ত্রে দাঁড়াই নাই যেখন হইতে দেশ বিদেশ নতশিরে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা রাজসভার বাহিরে সেই পথের ধারে ধুলার উপরে দাঁড়াইয়া আছি, যে পথে যুগযুগান্তের যাত্রা চলিতেছে— যে পথে অনেক কঠিন প্রভাতে অরক্ষিত উড়াইয়া দিগ্দিগন্তে ধূলা ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সন্ধ্যাবেলায় তারা ভয় দণ্ড এবং জীর্ণ কন্যার যাত্রা শেষ করিল— কত সাম্রাজ্যের অহংকার ঐ পথের ধূলায় কালের রথচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, আজ তার সন-তারিখের ভাঙা টুকরাগুলো কুড়াইয়া ঐতিহাসিক উল্টা-পাল্টা করিয়া জোড়া দিয়া বসিতেছে। আমাদের বাণী বেদনার বাণী— সত্যের বলে যার বল, এক দিন যাহা অস্ত-সকল কলগর্জনের উর্ধ্বে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসনতলে আসিয়া পৌঁছবে।

এক দিন ছিল যখন যুরোপ আপন আত্মাকে ধুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। তখন নানা চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও সে এ কথা বুঝিয়াছিল যে, বাহিরের লাভের দ্বারা নয় কিন্তু অস্তরে সত্য হইয়া মানুষ আপন চরম সম্পদ পায়। সে জানিত, এ লাভের মূল্য কেবল আমাদের মনগড়া নয়, কিন্তু ইহার মূল্য সেই পরম প্রেমের মধ্যে যাহা চিরদিন মানুষের সংসারের মধ্যে সচেষ্ট হইয়া আছে। তার পরে এমন দিন আসিল যখন বিজ্ঞান বহির্জগতের মহিমা প্রকাশ করিয়া দিল এবং যুরোপের নিষ্ঠাকে আত্মার দিক হইতে বস্তুর দিকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল।

মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের খুব একটা বড়ো তাৎপর্য আছে। প্রকৃতির

কালান্তর

নিয়মের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সহযোগিতা আছে, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করে। প্রকৃতির নিয়মের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের অধীনতা কাটাইয়া মানুষ আপন ধর্মবিবেকের স্বাধীন নির্বাচনের গৌরব লাভ করিতে পারে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। প্রকৃতি যে মানুষের পরিপূর্ণতা-লাভের পথে অস্তরায় নহে, প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার করিয়া তবেই আমাদের চিন্ময়কে রূপদান করিয়া তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, যুরোপের প্রতি এই সত্য-প্রচারের ভার আছে।

বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব-মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান বিশ্বজনের কাছে গিয়া পৌছায়, সেখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু, যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ংকর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ড রূপে প্রবল যে, আমাদের ধর্মবুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাভাৱতা ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পড়িয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অল্প জাতির সংঘর্ষ দুর্বলের দিকে দলন-বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অস্ত্রহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে; সকল দেশে বুদ্ধ ও যুদ্ধের উদ্‌যোগ নিত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার অস্তরে অস্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।

তথাপি এই আশা করি, যুরোপের এত দিনের তপস্কার ফল আজ বস্ত্রলোভের ভীষণ বন্দের মধ্যে পড়িয়া পায়ের তলার ধূলা হইয়া যাইবে না। আজিকার দিনের প্রচণ্ড সংকটের বিপাকে যুরোপ আর-কোনো-একটা নূতন প্রণালী, আর-একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজিয়া

স্বাধিকারপ্রমত্ত:

বেড়াইতেছে। কিন্তু বারবার মৃত্যুর পাঠশালায় শিক্ষালাভের পরে যুরোপকে আর না হয় তো আর-এক দিন এ কথা মানিতেই হইবে যে, কেবল কার্যপ্রণালীর পিরামিড-নির্মাণের প্রতি আস্থা রাখা অন্ধ পৌত্তলিকতা; তাহাকে এ কথা বুঝিতে হইবে, বাহিরের প্রণালীকে নয়, অন্তরের সত্যকে পাওয়া চাই; এ কথা বুঝিতে হইবে যে, ক্রমাগতই বাসনা-হতাশির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে এক দিন জগদব্যাপী অগ্নিকাণ্ড না ঘটয়া থাকিতে পারে না। এক দিন জাগিয়া উঠিয়া যুরোপকে তার লুক্কিতা এবং উন্নত অহংকারের সীমা বাধিয়া দিতে হইবে; তার পরে সে আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উপকরণই যে সত্য তাহা নয়, অমৃতই সত্য।

ঈর্ষার অন্ধতার যুরোপের মহত্ত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। তার স্থানসন্নিবেশ, তার জলবায়ু, তার জাতিসম্বন্ধ, এমন তাবে ঘটিয়াছে যে, সহজেই তার ইতিহাস শক্তি সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্যপরতার সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানকার প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং মৃদুতার এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিকে দ্বন্দ্ব আত্মান করিয়া আনে, আর-এক দিকে তাহার চিত্তকে অভিত্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদে দীক্ষিত করে না। এক দিকে তাহা যুরোপের সম্মানদের চিত্তে এমন তেজের উদ্রেক করিয়াছে যে, তাহাদের উদ্ভয় ও সাতল কোথাও আপন দাবির কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না; অপর দিকে তাহাদের বুদ্ধিতে অপ্রমাদ, তাহাদের কল্পনাবৃত্তিতে সুসংযম, তাহাদের সকল রচনার পরিমিতি এবং তাহাদের জীবনের লক্ষ্যের মধ্যে বাস্তবতাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহারা একে একে বিশ্বের গূঢ় রহস্যসকল বাহির করিতেছে, তাহাকে মাণিয়া ওজন করিয়া আয়ত্ত করিতেছে; তাহারা প্রকৃতির মধ্যে অন্তরতর যে-একটি ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধ্যানযোগে বা তর্কের বলে নয়— তাহা

কালান্তর

বাহিরের পর্দা ছিন্ন করিয়া, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহার নিজেই শক্তিতে রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির মহাশক্তিভাণ্ডারের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং লুক্ক হস্তে সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতেছে।

নিজের এই শক্তি সম্বন্ধে যুরোপের দম্ভ অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই, কোথায় যে তার ন্যূনতা তাহা সে বিচার করে না। বাহ্যপ্রকৃতির রূপ যে দেশে অতিমাত্র বৃহৎ বা প্রচণ্ড সে দেশে যেমন মানুষের চিত্ত তাহার কাছে অভিভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, তেমনি মানুষ নিজকৃত বস্তুসম্বন্ধে এবং বাহ্য রচনার অতিবিপুলতার কাছে নিজে মোহাবিষ্ট হইয়া পরাস্ত হইতে থাকে। বাহিরের বিশালতার ভারে অন্তরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইতে হইতে এক দিন মানুষের সমৃদ্ধি ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে ধুলায় লুটাইয়া পড়ে। রোম এক দিন আপন সাম্রাজ্যের বিপুলতার দ্বারাই আপনি বিহ্বল হইয়াছিল। বস্তুর অপরিমিত বৃহত্ত্বের কাছে তার সত্য যে প্রতিদিন পরাভূত হইতেছিল, তাহা সে নিজে জানিতেই পারে নাই। অথচ সেদিন যিহুদি ছিল রাষ্ট্রব্যাপারে পরতন্ত্র, অপমানিত। কিন্তু, সেই পরাদীন জাতির একজন অধ্যাতনামা অকিঞ্চন যে সত্যের সম্পদ উদ্ঘাটিত করিয়া দিল তাহাই তো নৃপাকার বস্তুসম্বন্ধের উপরে জয়লাভ করিল। যিহুদি উত্তম রোমকে এই কথাটুকু মাত্র স্বরণ করাইয়া দিয়াছিল যে, 'আপন আত্মাকে তুমি আপন ধনের চেয়ে বড়ো করিয়া জানো।' এই কথাটুকুতেই পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন যুগ আসিল।

দরিদ্রের কথায় আপনার উপর মানুষের শ্রদ্ধা জন্মিল, আত্মাকে লাভ করিবার জন্য সে বাহির হইল। বাহিরে তাহার বাধা বিস্তর, তবু নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে অমৃতলোকের দিব্য সম্পদ অর্জন করিবার জন্য সে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহার তপস্বী ভ্রম

স্বাধিকারপ্রমত্ত:

করিবার অন্ত বাহিরের দিক হইতে আবার আসিল প্রলোভন। বাহিরের অগৎকে তার হাতে তুলিয়া দিবার অন্ত বিজ্ঞান তার সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুরোপ আবার আত্মার চেয়ে আপন বস্তুসংগ্রহকে বড়ো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বস্তু চারি দিকে বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, ইহাই অসত্য। যেমন করিয়া, যে নাম দিয়াই এই বাহিরকে মহীয়ান করিয়া তুলি-না কেন, ইহা আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা ক্রমাগতই সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতারণা, অন্ধ অহংকার এবং অবশেষে অপঘাতমৃত্যুর মধ্যে মানুষকে লইয়া বাইবেই ; কেননা মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য এই যে : তদেতৎ প্রয়ো বিস্তাং অস্তরতরং যদয়মাত্মা। অস্তরতর এই-যে আত্মা, বাহিরের সকল বিস্তার চেয়ে ইহা প্রিয়।

যুরোপে ইতিহাস এক দিন নূতন করিয়া আপনাকে যে সৃষ্টি করিয়াছিল, কোনো নূতন কার্যপ্রণালী, কোনো নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে তাহার মূলভিত্তি ছিল না। মানুষের আত্মা অন্ত সব-কিছুর চেয়ে সত্য, এই তত্ত্বটি তাহার মনকে স্পর্শ করিবা মাত্র তাহার সৃজনী-শক্তি সকল দিকে জাগিয়া উঠিল। অন্ধকার ভীষণ ছুদিনে যুরোপকে এই কথাই আর-একবার স্মরণ করিতে হইবে। নহিলে একটার পর আর-একটা মৃত্যুবাণ তাহাকে বাজিতে থাকিবে।

আর, আমরা আজ এই মৃত্যুশেলবিহীন পশ্চিমের কাছ হইতে স্বাধীনতা তিকা করিবার অন্ত ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, এই যুযুর্ আনাদিগকে কী দিতে পারে ? পূর্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল, তাহার বদলে আর-এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ? কিন্তু মানুষ কি কোনো সত্যকার বড়ো জিনিস একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া লইতে পারে ? মানুষ যে-কোনো সত্যসম্পদ লয় তাহা মনের তিতরেই লয়, বাহিরে

কালান্তর

না। ভিক্ষার দানে আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না। স্বাধীনতা অস্তরের সামগ্রী।

যুরোপ কেন আমাদের মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার লোভের অস্ত্র কোথায়? যে হাত দিয়া সে কোনো সত্যবস্তু দিতে পারে লোভে তার সে হাতকে বাধিয়া রাখিয়াছে— সত্য করিয়া তার দিবার সাধ্যই নাই, সে যে রিপূর দাস। যে মুক্ত সেই মুক্তি দান করে।

যদি সে বিষয়বুদ্ধির পরামর্শ পাইয়া আমাদের কিছু দিতে আসে তবে সে নিজের দানকে নিজে কেবলই খণ্ডিত করিবে। এক হাত দিয়া যত দিবে আর-এক হাত দিয়া তার চেয়ে বেশি হরণ করিবে। স্বার্থের দানকে পরীক্ষা করিয়া লইবার বেলা দেখিব তাহাতে এত ছিদ্র যে, সে আমাদের ভাসাইয়া রাখিবে কি, তাহাকে ভাসাইয়া রাখাই শক্ত।

তাই এই কথা বলি, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, এমন ভুল যদি মনে আঁকড়িয়া ধরি তবে বড়ো ছুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙিবে। ত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অস্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে। আপনার দেশকে আমরা অতি সামান্তই দিতেছি, সেইজন্তই আপনার দেশকে পাই নাই। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, এ কথা যে বলে সে লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন লোককে ছুঃখ দিই, অপমান করি, অবজ্ঞা করি, বঞ্চনা করি, বিশ্বাস করি না— সেইজন্তই আপন পর হইয়াছে, বাহিরের কোনো আকস্মিক কারণ হইতে নয়।

যিহুদি যখন পরাধীন ছিল তখন রোমের হাত হইতে দক্ষিণাত্যরূপে তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। পরে এমন ঘটিয়াছে যে, যিহুদি দেশছাড়া

স্বাধিকারপ্রেমসুত:

হইয়া বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার রাষ্ট্রও নাই, রাষ্ট্রতন্ত্রও নাই। কিন্তু তাহার ইতিহাসে এইটেই সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। ইহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা এই যে, তাহার কাছ হইতে প্রাণের বীজ উড়িয়া আসিয়া যুরোপকে নূতন যক্ষুণ্ণ দান করিয়াছে। সে বাহা দিয়াছে তাহাতেই তাহার সার্থকতা। বাহা হারাইয়াছে, বাহা পায় নাই, সেটা সম্বন্ধে সে বড়ো, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

বাহিরের পরিমাণে মানুষের পরিমাণ নহে, এ কথা আমরা বার বার ভুলি কিন্তু তবু ইহা বার বার মনে করিতে হইবে। চীনদেশকে যুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিধ্বংস করিয়াছে, সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত এক দিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল। ভারত আজ যদি সমুদ্রের তলার ডুবিয়া যায় তবু বাহা সে দান করিয়াছে তাহার জোরেই সে মানুষের চিত্তলোকে রহিল। বাহা সে ভিক্ষা করিয়াছিল, চুরি করিয়াছিল, স্তূপাকার করিয়াছিল, তাহার জোরে নয়।

তপস্কার বলে আমরা সেই দানের অধিকার পাইব, ভিক্ষার অধিকার নয়, এ কথা যেন কোনো প্রলোভনে না ভুলি। মানুষ বেহেতু মানুষ এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না। সত্যের দ্বারা সে বাঁচে। এই সত্যই তাহার যে : তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নাশ্চ : পশ্চা বিস্ততে অয়নায় : তাহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার উদ্ধারের অন্ত কোনো উপায় নাট। এই সত্যকে দান করিবার জন্য আমাদের উপর আহ্বান আছে। মন্টেগ্যুর ডাক খুব বড়ো ডাক, আজ এই কথা বলিয়া ভারতের সভা হইতে সত্য, সংবাদপত্র হইতে সংবাদপত্রে ঘোষণা চলিতেছে। কিন্তু এই ভিক্ষার ডাকে আমরা মানুষ হইব না। আমাদের পিতামহেরা অমরলোক হইতে আমাদের আহ্বান করিতেছেন, বলিতেছেন, 'তোমরা যে অমৃতের পুত্র

কালান্তর

এই কথা জানো এবং এই কথা জানাও ; মৃত্যুছাড়াছন্ন পৃথিবীকে এই
সত্য দান করো যে, কোনো কর্মপ্রণালীতে নয়, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়, বাণিজ্য-
ব্যবস্থায় নয়, যুদ্ধ-অস্ত্রের নিদারুণতায় নয়—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ।

নান্তঃ পস্থা বিদ্বতে অয়নায় ॥

মাঘ ১৩২৪

বাতায়নিকের পত্র

এক দিকে আমাদের বিশ্বজগৎ, আর-এক দিকে আমাদের কর্মসংসার। সংসারটাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা, জগৎটাকে নিয়ে আমাদের কোনো দায় নেই। এইজন্মে জগতের সঙ্গে আমাদের অহেতুক আত্মীয়তার সম্বন্ধটাকে যতটা পারি আড়াল করে রাখতে হয়, নইলে সংসারের ভাগে মনোযোগের কমতি প'ড়ে কাজের কতি হয়। তাই আমাদের আপিস থেকে বিশ্বকে বারো মাস ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে এমনি হয় যে, দরকার পড়লেও আর তার উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না।

দরকার পড়েও। কেননা বিশ্বটা সত্য। সত্যের সঙ্গে কাজের সম্বন্ধ নাও যদি থাকে, তবু অল্প সম্বন্ধ আছেই। সেই সম্বন্ধকে অল্পমনস্ক হয়ে অস্বীকার করলেও তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কর্মে ক্লান্তি আসে, দিনের আলো ম্লান হয়, সংসারের বহু আয়তনের মধ্যে গুমট অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। তখন মন তার হিসাবের পাকা পাতা বন্ধ ক'রে বলে ওঠে, 'বিশ্বকে আমার চাই, নইলে আর বাঁচি নে।'

কিছু নিকটের সব দরজাগুলোর তালায় মরচে পড়ে গেছে, চাবি আর খোলে না। রেলভাড়া ক'রে দূরে যেতে হয়। আপিসের ছাদটার উপরেই এবং তার আশেপাশেই যে আকাশ নীল, যে ধরণী শ্যামল, যে জলের ধারা মুখরিত, তাকেই দেখবার জন্মে ছুটে যেতে হয় এটোয়া কাটোয়া ছোটোনাগপুরে।

এত কথা হঠাৎ আমার মনে উদয় হল কেন বলি। তোমরা সবাই জান, পুরাকালে এক সময়ে আমি সম্পূর্ণ বেকার ছিলাম। অর্থাৎ আমার প্রধান সম্বন্ধ ছিল বিশ্বজগতের সঙ্গে। তার পরে কিছু কাল থেকে সেই আমার প্রথম বয়সের সমস্ত অকৃত কর্মের বকেয়া শোধে লেগে

কালান্তর

গিয়েছিলুম। অর্থাৎ এখনকার প্রধান সম্বন্ধ হল সংসারের সঙ্গে। অর্থাৎ তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের যে এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটেছে, কাজ করতে করতে তা ভুলে গিয়েছিলুম। এই ভোলবার ক্ষমতাই হচ্ছে মনের বিশেষ ক্ষমতা। সে দু নৌকোর পা দেয় না ; সে যখন একটা নৌকোর থাকে তখন অন্য নৌকোটাকে পিছনে বেঁধে রাখে :

এমন সময় আমায় শরীর অসুস্থ হল। সংসারের কাছ থেকে কিছু দিনের মতো ছুটি মিলল। দোতলা ঘরের পূর্ব দিকের প্রান্তে খোলা জানলার ধারে একটা লম্বা কেদারায় ঠেস দিয়ে বসা গেল। ছুটো দিন না যেতেই দেখা গেল, অনেক দূরে এসে পড়েছি, রেলভাড় দিয়েও এত দূরে আসা যায় না।

যখন আমেরিকায় যাই, জাপানে যাই, ভ্রমণের কথায় ভ'রে ভ'রে তোমাদের চিঠি লিখে পাঠাই। পথ-খরচাটার সমান ওজনের গৌরব তাদের দিতে হয়। কিন্তু এই-যে আমার নিখরচার যাত্রা কাজের পার থেকে অকাজের পারে, তারও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা চলে— মাঝে মাঝে লিখব। মুশকিল এই যে, কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে, কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। আরো একটা কথা এই যে, আমার এই নিখরচার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিনা-কড়ি দামের উপযুক্ত নেহাত হান্কা হওয়া উচিত— লেখনীর পক্ষে সেই হান্কা চাল ইচ্ছা করলেই হয় না, কারণ লেখনী স্বভাবতই গজেন্দ্রগামিনী।

জগৎটাকে কেজো অভ্যাসের বেড়ার পারে ঠেলে রেখে অবশেষে ক্রমে আমার ধারণা হয়েছিল, আমি খুব কাজের লোক। এই ধারণাটা জন্মালেই মনে হয়, আমি অত্যন্ত দরকারি, আমাকে না হলে চলে না। মানুষকে বিনা মাইনের খাটিয়ে নেবার জন্যে প্রকৃতির হাতে যে-সমস্ত উপায় আছে এই অহংকারটা সকলের সেবা। টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে, সেটা একটা বাধা

বাতায়নিকের পত্র

পরিমাণ ; কাজেই তাদের ছুটি মেলে, বরাদ্দ ছুটির বেশি কাজ করাকে তারা লোকসান ব'লে গণ্য করে। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই ; লোকসানকেও তারা লোকসান জ্ঞান করে না।

আমাকে নইলে চলে না, এই কথা মনে করে এত দিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলেছে, 'এইখানেই বাস করো, একটু ধামো।' আমি বলেছি, 'আমি ধামলে চলে কই?' ঠিক এমন সময়ে চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে ধামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র গুরতে গুরতে চলেছে ; না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাধা করে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে হল স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে, এমন লক্ষণ তো দেখি নে। 'আমি-নইলে-চলে-না'র দেশ থেকে 'আমি-নইলে-চলে'র দেশে ধাঁ করে এসে পৌঁচেছি, কেবলমাত্র ঐ ভেঙ্কের থেকে এই জানলার ধারটুকুতে এসে।

কিন্তু কথাটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারব না। মুখে যদি বা মানি, মন মানেনা। আমি থাকলেও বা আমি গেলেও তা, এইটেই যদি সত্য হবে তবে আমার অহংকার এক মুহূর্তের অন্তেও বিশ্ব কোথাও স্থান পেল কী করে? তার টিকে থাকবার জোর किसের উপরে? দেশকাল জুড়ে আয়োজনের তো অস্ত নেই, তবু এত ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাকে কেউ বরখাস্ত করতে পারলে না। আমাকে না হলে

কালান্তর

চলে না তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে আমি আছি।

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যত ক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি তত ক্ষণ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সমস্ত দায়, সমস্ত দুঃখ অনবরত বহন করে চলেছি। সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেছে, এই অহংকারটাকে বিসর্জন করলেই টিকে থাকার মূল মেয়ে দেওয়া হয়, কেননা তখন আর টিকে থাকার মজুরি পোষায় না।

যাই হোক, এই মূল্য তো কোনো-একটা ভাঙার থেকে জোগানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি থাকি এরই গরজ কোনো-এক জায়গায় আছে; সেই গরজ অনুসারেই আমাকে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আমি থাকি এই ইচ্ছার আনুচর্য সমস্ত বিশ্ব করেছে, বিশ্বের সমস্ত অণুপরমাণু। সেই পরম-ইচ্ছার গৌরবেই আমার অহংকারে বিকশিত। সেই ইচ্ছার গৌরবেই এই অতিক্রম আমি বিশ্বের কিছুই চেয়েই পরিমাণ ও মূল্যে কম নই।

এই ইচ্ছাকে মানুষ দুই রকম ভাবে দেখেছে। কেউ বলেছে এ হচ্ছে শক্তিময়ের খেয়াল, কেউ বলেছে এ হচ্ছে আনন্দময়ের আনন্দ। আর যারা বলেছে এ হচ্ছে দায়া অর্থাৎ যা নেই তারই থাকা, তাদের কথা ছেড়ে দিলাম।

আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ না প্রীতির প্রকাশ, এইটে যে যেমন মনে করে সে সেই ভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। শক্তিতে আমাদের যে মূল্য দেয় তার এক চেহারা, আর প্রীতিতে আমাদের যে মূল্য দেয় তার চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। শক্তির জগতে আমার অহংকারের যে দিকে গতি প্রীতির জগতে আমার অহংকারের গতি ঠিক তার উল্টো দিকে।

শক্তিকে মাপা যায়; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম

বাতায়নিকের পত্র

ব'লে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্তেই সিঁছিলাভের কামনায় এরা অস্ত্রের অর্থ, অস্ত্রের প্রাণ, অস্ত্রের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

বস্তুতন্ত্রের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তার বাহ্য প্রকাশের পরিমাপ্যতা— অর্থাৎ তার সীমিততা। মানুষের ইতিহাসে যত-কিছু দেওয়ানি এবং ফৌজদারি মামলা তার অধিকাংশই এই সীমানার চৌহদ্দি নিয়ে। পরিমাণের দিকে নিজের সীমানা অত্যন্ত বাড়াতে গেলেই পরিমাণের দিকে অস্ত্রের সীমানা কাড়তে হয়। অতএব শক্তির অহংকার যেহেতু আয়তন-বিস্তারেরই অহংকার সেইজন্তে এই দিকে দাঁড়িয়ে খুব লম্বা দূরবীন কবলেও লড়াইয়ের রক্তসমুদ্র পেরিয়ে শক্তির কূল কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এই-যে বস্তুতাত্ত্বিক বিশ্ব, এই-যে শক্তির ক্ষেত্র, এর আয়তনের অঙ্কগুলো যোগ দিতে দিতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখি তেরিঅটা একটানা বেড়ে চলবার দিকেই ছুটছে না। বেড়ে চলবার তন্ত্রের মধ্যে হঠাৎ উচোট খেয়ে দেখা যায় সুষমার তন্ত্র পথ আগলে। দেখি কেবলই গতি নয়, যতিও আছে। ছন্দের এই অমোঘ নিয়মকে শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে অতিক্রম করতে যায় তখনি তার আত্মঘাত ঘটে। মানুষের ইতিহাসে এইরকম বার বার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্তে মানুষ বলেছে : অতি দর্পে হতা লভা। সেইজন্তে ব্যাবিলনের অত্যাচারিত গৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

তবেই দেখছি, শক্তিতন্ত্র, যার বাহ্যপ্রকাশ আয়তনে, সেটাই চরম তন্ত্র এবং পরম তন্ত্র নয়। বিশ্বের ভাল মেলাবার বেলায় আপনাকে তার

কালান্তর

খামিয়ে দিতে হয়। সেই সংঘমের সিংহদ্বারই হচ্ছে কল্যাণের সিংহদ্বার। এই কল্যাণের মূল্য আয়তন নিয়ে নয়, বহুলতা নিয়ে নয়। যে একে অস্তরে জেনেছে সে ছিন্ন কঙ্কায় লজ্জা পায় না, সে রাজমুকুট ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে।

শক্তিতত্ত্ব থেকে সুষমাতত্ত্বে এসে পৌঁছিয়েই বুঝতে পারি, ভুল জায়গায় এত দিন এত নৈবেদ্য জুগিয়েছি। বলির পশুর রক্তে যে শক্তি ফুলে উঠল সে কেবল ফেটে মরবার জগ্ৰেই। তার পিছনে যতই সৈন্ত, যতই কামান লাগাই-না কেন, রণতরীর পরিধি যতই বৃদ্ধির দিকে নিয়ে চলি, লুঠের ভাগকে যতই বিপুল করে তুলতে থাকি, অঙ্কের জোরে মিথ্যাকে সত্য করা যাবে না, শেষকালে ঐ অতি বড়ো অঙ্কেরই চাপে নিজের বস্তার নীচে নিজে গুঁড়িয়ে মরতে হবে।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন জিনিসপত্র বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে এই অঙ্ক-কষার রাজ্যে মৈত্রেয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখনই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামূতা শ্চাম্ কিমহং তেন কুর্ধাম্! বহু, বহু, বহু—সব বহুকে জুড়ে জুড়েও, অঙ্কের পর অঙ্ক যোগ ক'রে ক'রেও তবু তো অমৃত্যে গিয়ে পৌঁছনো যায় না। শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা হল হংকার; আর শব্দকে সুর দিয়ে, লয় দিয়ে, সংঘত সম্পূর্ণতা দান করলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সংগীত। ঐ হংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায়; আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

এই অমৃতের ক্ষেত্রে মানুষের অহংকারের স্রোত নিজের উন্টো দিকে, উৎসর্জনের দিকে। মানুষ আপনার দিকে কেবলই সমস্তকে টানতে টানতে প্রকাণ্ডতা লাভ করে, কিন্তু আপনাকে সমস্তর দিকে উৎসর্গ করতে করতে সে সামঞ্জস্য লাভ করে। এই সামঞ্জস্যই

বাতায়নিকের পত্র

শাস্তি। কোনো বাহ্য ব্যবস্থাকে বিস্তীর্ণতর করার দ্বারা, শক্তিমানের সঙ্গে শক্তিমানকে জোড়া দিয়ে পুঞ্জীভূত করার দ্বারা, কখনোই সেই শাস্তি পাওয়া যাবে না যে শাস্তি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, যে শাস্তি অলোভে, যে শাস্তি সংযমে, যে শাস্তি ক্ষমায়।

প্রশ্ন তুলেছিলুম, আমার সস্তার পরমমূল্যটি কোন্ সত্যের মধ্যে। শক্তিমানের শক্তিতে না আনন্দমানের আনন্দে ?

শক্তিকেই যদি সেই সত্য ব'লে বরণ করি তা হলে বিরোধকেও চরম ও চিরস্থান ব'লে মানতেই হবে। যুরোপের অনেক আধুনিক লেখক সেই কথাই স্পর্ধাপূর্বক প্রচার করছেন। তাঁরা বলছেন, শাস্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, দুর্বলের আশ্রয় করা করবার কৃত্রিম দুর্গ; বিশ্বের বিধান এই দুর্গকে খাতির করে না, শেষ পর্যন্ত শক্তিরই জয় হয়—অতএব ভীক ধর্মভাবকের দল যাকে অধর্ম ব'লে নিন্দা করে, সেই অধর্মই কৃতার্থতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

অন্য দল সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না; সমস্ত মেনে নিয়েই তারা বলে—

অধর্মৈগৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি।

ঐশ্বর্যগর্বেও মানুষের মন বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার দারিদ্র্যের দুঃখে ও অপমানেও মানুষের সমস্ত লোলুপ প্রবৃত্তি বাহিরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই দুই অবস্থাতেই মানুষ সকল দেবতার উপরে সেই শক্তিকে আসন দিতে লক্ষিত হয় না, যে ক্রুর শক্তির দক্ষিণহস্তে অগ্রায়ের এবং বামহস্তে ছলনার অস্ত্র। প্রতাপসুরামস্ত যুরোপের পলিটিক্‌স্ এই শক্তিপূজা। এইজন্য সেখানকার ডিপ্লোমেসি কেবলই প্রকাশ্যতাকে এড়িয়ে চলতে চায়; অর্থাৎ সেখানে শক্তি যে মূর্তি ধারণ করেছে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ মূর্তি নয়; কিন্তু তার লেলিহান রসনার উলঙ্গতা

কালান্তর

কোথাও ঢাকা নেই। ঐ দেখো পীসু-কন্ফারেন্সের সভাকক্ষে তা লক্কলক্ক করছে।

অপর পক্ষে একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় উচ্ছ্বলতার সময় ভীত পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়ে শক্তিরই স্তবগান করিয়েছে। কবিকঙ্কণচণ্ডী, অনন্যদামঙ্গল, মনসার ভাসান, প্রকৃতপক্ষে অধর্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে অগ্ন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নির্ধূর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পরাভবগানকেই মঙ্গলগান নাম দেওয়া হল।

আজকের দিনেও দেখি আমাদের দেশে সেই হাওয়া উঠেছে। আমরা ধর্মের নাম করেই এক দল লোক বলছি, ধর্মভীরুতাও ভীকতা। বলছি, যারা বীর, অগ্ন্যায় তাদের পক্ষে অগ্ন্যায় নয়। তাই দেখি সাংসারিকতায় যারা কৃতার্থ এবং সাংসারিকতায় যারা অকৃতার্থ, দুইয়েরই পুর এক জায়গায় এসে মেলে। ধর্মকে উভয়েই বাধা বলে জানে, সেই বাধা গায়ের জোরে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু গায়ের জোরই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো জোর নয়।

এই বড়ো ছঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না; তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব। সেই মনুষ্যত্বের অভিমান আমাদের হোক, যে অভিমানে মানুষ এই স্থূল বস্তুজগতের প্রবল প্রকাণ্ডতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে বলতে পারে, আমার সম্পদ এখানে নয়; বলতে পারে, শৃঙ্খলে আমি বন্দী হই নে, আঘাতে আমি আহত হই নে, মৃত্যুতে আমি মরি নে; বলতে পারে, যেনাহং নামৃতঃ স্তাম্ কিমহং তেন কুর্ষাম্। আমাদের পিতামহেরা বলে গেছেন : এতদমৃতমভয়ং শাস্ত্র উপাসীত। যিনি অমৃত, যিনি অভয় তাঁকে উপাসনা করে শাস্ত্র হও। তাঁদের উপদেশকে আমরা মাথায় লই, এবং মৃত্যু ও সকল ভয়ের অতীত যে শাস্তি সেই শাস্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করি।

বাতায়নিকের পত্র

২

কারো উঠোন চবে দেওয়া আমাদের ভাষায় চূড়ান্ত শাস্তি বলে গণ্য। কেননা উঠোনে মানুষ সেই বৃহৎ সম্পদকে আপন করেছে যেটাকে বলে ফাঁক। বাহিরে এই ফাঁক ছুর্লভ নয়, কিন্তু সেই বাহিরের জিনিসকে ভিতরের ক'রে, আপনার ক'রে না তুললে তাকে পেয়েও না পাওয়া হয়। উঠোনে ফাঁকটাকে মানুষ নিজের ঘরের জিনিস করে তোলে; ঐখানে সূর্যের আলো তার ঘরের আপনার আলো হয়ে দেখা দেয়, ঐখানে তার ঘরের ছেলে আকাশের চাঁদকে হাততালি দিয়ে ডাকে। কাজেই উঠোনকেও যদি বেকার না রেখে তাকে ফসলের খেত বানিয়ে তোলা যায় তা হলে যে বিশ্ব মানুষের আপন ঘরের বিশ্ব, তারই বাসা ভেঙে দেওয়া হয়।

সত্যকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ধনী এই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে। যে-সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে ধনী আপনার ঘর বোঝাট করে তার দাম খুব বেশি, কিন্তু যে ফাঁকটা দিয়ে তার আঙিনা হয় প্রশস্ত, তার বাগান হয় বিস্তীর্ণ সেইটেই হচ্ছে সব চেয়ে দামি। সদাগরের দোকানঘর জিনিসপত্রে ঠাসা; সেখানে ফাঁক রাখবার শক্তি তার নেই। দোকানে সদাগর রূপণ, সেখানে লক্ষপতি হয়েও সে দরিদ্র। কিন্তু সেই সদাগরের বাসের বাড়িতে ঘরগুলো লম্বায় চওড়ায় উঁচুতে সকল দিকেই প্রয়োজনকে ধিক্কার ক'রে ফাঁকটাকেই বেশি আদর দিয়েছে, আর বাগানের তো কথাই নেই। এইখানেই সদাগর ধনী।

শুধু কেবল জায়গার ফাঁকা নয়, সময়ের ফাঁকাও বহুমূল্য। ধনী তার অনেক টাকা দিয়ে এই অবকাশ কিনতে পারে। তার ঐশ্বর্যের প্রধান লক্ষণ এই যে, লম্বা লম্বা সময় সে ফেলে রাখতে পারে। হঠাৎ কেউ তার সময়ের উঠোন চবতে পারে না।

কালান্তর

আর-একটা ফাঁকা যেটা সব চেয়ে দামি সে হচ্ছে মনের ফাঁকা। যা-কিছু নিয়ে মন চিন্তা করতে বাধ্য হয়, কিছুতেই ছাড় পায় না, তাকেই বলে চুশ্চিন্তা। গরিবের চিন্তা, হতভাগার চিন্তা মনকে একেবারে আঁকড়ে থাকে; অশখগাছের শিকড়গুলো ভাঙা মন্দিরকে যে রকম আঁকড়ে ধরে। দুঃখ জিনিসটা আমাদের চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দেয়। শরীরের সুস্থ অবস্থা তাকেই বলে যেটা হচ্ছে শারীর চৈতন্যের ফাঁকা ময়দান। কিন্তু হোক দেখি বা পায়ের ক'ড়ে আঙুলের গাঁটের প্রান্তে বাতের বেদনা, অমনি শারীর চৈতন্যের ফাঁক বুজে যায়, সমস্ত চৈতন্য ব্যথায় ভরে ওঠে। মন যে ফাঁকা চায় দুঃখে সেই ফাঁকা পায় না।

স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়। সেই ছোটো-সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখে।

আজকের দিনে ভারতবাসী হয়ে নিজের সকলের চেয়ে বড়ো দৌর্ভাগ্য অনুভব করছি এই জানলার কাছটাতে এসে। আমাদের ভাগ্যে জানলার ফাঁক গেছে বুজে; জীবনের এ কোণে, ও কোণে একটু-আধটু যা ছুটির পোড়ো জায়গা ছিল তা কাটাগাছে ভরে গেল।

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ এক দিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সব চেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই স্পষ্ট করে দেখছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ।

কিন্তু আজকের দিনে ভারতবর্ষের সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট

বাতায়নিকের পত্র

হল। আজকের দিনে ভারতবাণীর আর ছুটি নেই; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসটি শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

তাই আজ যখনই এই বাতায়নে এসে বসেছি অমনি দেখি, আমাদের আঙিনা থেকে উঠছে দুর্বলের কান্না; সেই দুর্বলের কান্নায় আমাদের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, সমস্ত অবকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ংকর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে এমন আর কোনো দিনই ছিল না।

বিজ্ঞানের কৃপায় বাহুবল আজ নিদারুণ দুর্জয়। পালোয়ান আজ জল স্থল আকাশ সর্বত্রই সিংহনাদে তাল ঠুকে বেড়াচ্ছে। আকাশ এক দিন মানুষের হিংসাকে আপন সীমানায় ঢুকতে দেয় নি। মানুষের ক্রুরতা আজ সেই শূন্যকেও অধিকার করেছে। সমুদ্রের তলা থেকে আরম্ভ করে বায়ুমণ্ডলের প্রান্ত পর্যন্ত সব জায়গাতেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্ত বয়ে চলল।

এমন অবস্থায়, যখন সবলের সঙ্গে দুর্বলের বৈষম্য এত অত্যন্ত বেশি তখনো যদি দেখা যায়, এত বড়ো বলবানেরও ভীকতা ঘুচল না, তা হলে সেই ভীকতার কারণটা ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখা দরকার এইজন্যে যে, যুরোপে আজকের যে শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে সেই শাস্তি টেকসই হবে কি না সেটা বিচার করতে হলে এই সমস্ত বলিষ্ঠদের মনস্তত্ত্ব বুঝে দেখা চাই।

যুদ্ধ যখন প্রবল বেগে চলছিল, যখন হারের আশঙ্কা জিতের আশার চেয়ে কম ছিল না, তখন সেই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় সন্ধির শর্তভঙ্গ, অস্ত্রাদি-প্রয়োগে বিধিবিহীনতা, নিরস্ত্র শত্রুদের প্রতি বায়ুৰথ থেকে অস্ত্রবর্ষণ প্রভৃতি কাণ্ডকে এ পক্ষ 'ক্রাইম' অর্থাৎ অপরাধ বলে অভিযোগ করে-ছিলেন। মানুষ ক্রাইম কখন করে? যখন সে ধর্মের গরজের চেয়ে

কালান্তর

আর-কোনো একটা গরজকে প্রবল বলে মনে করে। যুদ্ধে জয়লাভের গরজটাকেই জার্মানি ত্রায়াচরণের গরজের চেয়ে আশু গুরুতর বোধ করেছিল। এ পক্ষ যখন সেজন্তে আঘাত পাচ্ছিলেন তখন বলছিলেন, জার্মানির পক্ষে কাজটা একেবারেই ভালো হচ্ছে না; হোক-না যুদ্ধ, তাই বলে কি আইন নেই, ধর্ম নেই? আর, যখন বিজিত প্রদেশে জার্মানি লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিতে দয়াবোধ করে নি তখন আশু প্রয়োজনের দিক থেকে জার্মানির পক্ষে তার কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এ পক্ষে বলেছিল, আশু প্রয়োজন-সাধনাটাই কি মানুষের চরম মনুষ্যত্ব? সভ্যতার কি একটা দায়িত্ব নেই? সেই দায়িত্বরক্ষার চেয়ে যারা উপস্থিত কাজ-উদ্ধারকেই বড়ো মনে করে তারা কি সভ্যসমাজে স্থান পেতে পারে?

ধর্মের দিক থেকে এ-সকল কথার একেবারে জবাব নেই। শুনে আমাদের মনে হয়েছিল, যুদ্ধের অগ্নিতে এবার বুঝি কলিযুগের সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে গেল; এত দিন পরে মানুষের দশা ফিরবে, কেননা তার মন ফিরছে। মন না ফিরলে কেবলমাত্র অবস্থা বা ব্যবস্থা -পরিবর্তনে কখনোই কোনো ফল পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের তখন হিসাবে একটা ভুল হয়েছিল। আমাদের দেশে শ্মশানবৈরাগ্যকে লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। তার কারণ, প্রিয়জনদের আশু মৃত্যুতে মন যখন দুর্বল তখনকার বৈরাগ্যে বিশ্বাস নেই, সবল মনের বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। তেমনি যুদ্ধফলের অনিশ্চয়তায় মন যখন দুর্বল তখনকার ধর্মবাক্যকে ষোলো আনা বিশ্বাস করা যায় না।

যুদ্ধে এ পক্ষের জিত হল। এখন কী করলে পৃথিবীতে শান্তির ভিত্তি পাকা হয় তাই নিয়ে পঞ্চায়েত বসে গেছে। কথো-কাটাকাটি, প্রস্তাব-চালাচালি, রাজ্য-ভাগাভাগি চলছে। এই কারখানাঘর থেকে 'কী আকার এবং কী শক্তি নিয়ে কোন্ যন্ত্র বেরবে তা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

বাতায়নিকের পত্র

আর-কিছু না বুঝি একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে ; এত আগুনেও কলিযুগের অস্ত্যুষ্টিসংকার হল না, মন-বদল হয় নি। কলি-যুগের সেই সিংহাসনটা আজ কোন্‌খানে ? লোভের উপরে। পেতে চাই, রাখতে চাই, কোনোমতেই কোথাও একটুও কিছু ছাড়তে চাই নে। সেইজন্মেই অতিবড়ো বলিষ্ঠের ভয়, কী জানি যদি দৈবাৎ এখন বা সুদূর কালেও একটুখানি লোকসান হয়। যেখানে লোকসান কোনোমতেই সহবে না সেখানে আইনের দোহাই, ধর্মের দোহাই মিথ্যে। সেখানে অন্তায়কে কর্তব্য ব'লে আপনাকে ভোলাতে একটুও সময় লাগে না ; সেখানে দোষের বিচার দোষের পরিমাণের দিক থেকে নয়, আইনের দিক থেকে নয়, নিজের লোভের দিক থেকে।

এই ভয়ংকর লোভের দিনে সবলকে সবল যখন ভয় করতে থাকে, তখন উচ্চতানের ধর্মের দোহাই দিয়ে রফারফির কথা হতে থাকে ; তখন আইনের মধ্যে কোনো ছিদ্র কোনো জায়গায় যাতে একটুও না থাকতে পারে সেই চেষ্টা হয়। কিন্তু দুর্বলকে যখন সেই সময়েই সেই লোভেরই তাড়ায় সবল একটুকু পরিমাণেও ভয় করে, তখন শাসনের উদ্ভেজনা কোনো দোহাই মানতে চায় না ; তখন আইনের মধ্যে বড়ো বড়ো ছিদ্র খনন করা হয়।

প্রবলের ভয়ে এবং দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা ভ্যাকুয়াম আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে। সকলেই জানেন, কিছুকাল থেকে পশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসংকট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এট যে, প্রবলের লোভ সন্তোষ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোনো-এক দিন প্রবল বাধা পায়। বাধা পাবার সম্ভাবনা কিসে ? যদি আর-কোনো জাতি এই প্রবলদেরই মতো সকল বিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের মতো বড়ো হওয়া একটা সংকট— এইটে নিবারণ

কালান্তর

করবার অন্তে অন্তদের চেপে ছোটো করে রাখা দরকার। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই নীতি নিয়ে বাকি জগতের সঙ্গে কারবার করছে। এই নীতিতে নিরন্তর যে ভয় জাগিয়ে রাখে তাতে শাস্তি টিকতে পারে না।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস লিখছেন—

It does not, however, appear at first sight that the Yellow Peril at which European economists are terrified is to be compared to the White Peril suspended over Asia. The Chinese do not send to Paris, Berlin, and St. Petersburg missionaries to teach Christians the Fung-Chui, and sow disorder in European affairs. A Chinese expeditionary force did not land in Quiberon Bay to demand of the Government of the Republic extra-territoriality, i. e., the right of trying by a tribunal of mandarins cases pending between Chinese and Europeans. Admiral Togo did not come and bombard Brest Roads with a dozen battleships, for the purpose of improving Japanese trade in France..... He did not burn Versailles in the name of a higher civilisation. The army of the Great Asiatic Powers did not carry away to Tokio and Peking the Louvre paintings and the silver service of the Elysee.

No indeed ! Monsieur Edmond They himself admits that the yellow men are not sufficiently civilised to imitate the whites so faithfully. Nor does he foresee that they will ever rise to so high a moral culture. How could it be possible for them to possess our virtues ? They are not Christians. But men entitled to speak consider that the Yellow Peril is none the less to be dreaded for all that it is economic. Japan and China, organised by Japan, threaten us in all the markets of Europe, with a competition fright-

বাতায়নিকের পত্র

ful, monstrous, enormous, and deformed, the mere idea of which causes the hair of the economists to stand on end.

অর্থাৎ লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। সেইজন্মে যে নীচে আছে তাকে চিরকালই নীচে চেপে রাখতে চায়, এবং যে প্রবল হয়ে ওঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাকে অকল্যাণ বলেই গণ্য করে।

যত ক্ষণ এই লোভ আছে তত ক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস-কনফারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে অনেক জিনিস তৈরি হচ্ছে কিন্তু কলে-তৈরি শান্তিকে বিশ্বাস করি নে। কর্মিক-ধনিকদের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজ্য - অন্য রাজ্যের মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, আবার রাজ্য ও প্রজার মধ্যে যে অশান্তি তারও কারণ লোভ। তাই শেষকালে দাঁড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

এমন অবস্থায় সবলপক্ষীয়েরা যখন আপোষনিষ্পত্তির যোগে শান্তি-কামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা বাধ বেঁধে এবং অন্যদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের স্রোতটাকে নিজেদের দিক থেকে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়। বস্তুত্বরাকে এমন জায়গায় পরম্পর বধরা করে নিতে চায় যে জায়গাটা যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই যেখানে দাঁত বসে, এবং ছিঁড়তে গিয়ে নখে যদি আঘাত লাগে নখ তার শোধ তুলতে পারে। কিন্তু জোর করে বলা যায় এমন ভাবে চিরদিন চলবে না; ভাগ সমান হবে না, লোভের ক্ষুধা সব জায়গায় সমান করে ভরবে না, পাপের ছিদ্র নানা জায়গায় থেকে যাবে; হঠাৎ এক দিন ভরাডুবি হবে।

বিধাতা আমাদের একটা দিকে নিশ্চিত করেছেন, ঐ বলের দিকটার আমাদের রাস্তা একেবারে শেষ কাঁকটুকু পর্যন্ত বন্ধ; যে আশা রাস্তা না পেলেও উড়ে চলে সেই আশারও ডানা কাটা পড়েছে। আমাদের জন্মে কেবল একটা বড়ো পথ আছে, সে হচ্ছে হুঃখের উপরে যাবার

কালান্তর

পথ। রিপু আমাদের বাইরে থেকে আঘাত দিচ্ছে দিক, তাকে আমরা অন্তরে আশ্রয় দেব না। যারা মারে তাদের চেয়ে আমরা ষখন বড়ো হতে পারব তখন আমাদের মার-খাওয়া ধন্য হবে। সেই বড়ো হবার পথ না লড়াই করা, না দরখাস্ত লেখা।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ধ্রুবম্ অধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥

৩

অন্তের সঙ্গে কথা কওয়া এবং অন্তের সঙ্গে চিঠি লেখার ব্যবস্থা আছে সংসার জুড়ে। আর নিজের সঙ্গে? সেটা কেবল এই বাতায়ন-টুকুতে। কিন্তু নিজের মধ্যে কার সঙ্গে কে কথা কয়?

একটা উপমা দেওয়া যাক। মাটির জলের খানিকটা সূক্ষ্ম হয়ে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখান থেকে সেই নির্মল দূরত্বের সংগীত এবং উদার বেগ নিয়ে ধারায় ধারায় পুনবার সে মাটির জলে ফিরে আসতে থাকে।

এই জলেরই মতো মানুষের মনের একটা ভাগ সংসারের উর্ধ্ব আকাশের দিকে উড়ে যায়, সেই আকাশচারী মনটা মাঝে মাঝে আবার যদি এই ভূচর মনের সঙ্গে মিলতে পারে তবে তাতেই পূর্ণতা ঘটে।

কিন্তু এমন-সকল মরুপ্রদেশ আছে যেখানে প্রায় সমস্ত বৎসর ধরেই অনাবৃষ্টি। বাষ্প হয়ে যা উপরে চলে গেল বর্ষণ হয়ে তা আর ধরায় নেমে আসে না। নীচের মনের সঙ্গে উপরের মনের আর মিলন হয় না। সেখানে খাল-কাটা জলে কাজ চলে যায়; কিন্তু সেখানে আকাশের সঙ্গে মাটির স্তম্ভসংগমের সংগীত এবং শঙ্খধ্বনি কোথায়? সেখানে বর্ষণমুখরিত রসের উৎসব হল না। সেখানে মনের মধ্যে চিরবিরহের একটা গুহতা রয়ে গেল।

বাতায়নিকের পত্র

এ তো গেল অনাবৃষ্টির কথা। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কাদাবৃষ্টি রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি নানা উৎপাতের কথা শোনা যায়। আকাশের বিস্তৃততা যখন চলে যায়, বাতাস যখন পৃথিবীর নানা আবর্জনার পূর্ণ হয়ে থাকে, তখনই এইসব কাণ্ড ঘটে। তখন আকাশের বাণীও নির্মল হয়ে পৃথিবীকে পবিত্র করে না। পৃথিবীরই পাপ পৃথিবীতে ফিরে আসতে থাকে।

আজকের দিনে সেই দুর্যোগ ঘটেছে। পৃথিবীর পাপের ধূলিতে আকাশের বর্ষণও আবিল হয়ে নামছে। নির্মল ধারার পুণ্যান্নানের জন্তে অনেক দিনের যে প্রতীক্ষা তাও আজ বারে বারে ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে কাদা লাগছে এবং রক্তের চিহ্ন এসে পড়ছে; বার বার কত আর যুঁহব।

রক্তকলঙ্কিত পৃথিবী থেকে ঐ-যে আজ একটা শাস্তির দরবার উঠেছে, উর্ধ্ব-আকাশের নির্মল নিঃশব্দতা তার বেস্বরকে ধুয়ে দিতে পারছে না।

শাস্তি? শাস্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্তে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্তে, লাভেরই জন্তে যাদের দশ আঙুল অঙ্গুর সাপের দশটা লেজের মতো কিল্বিল্ব করছে তারা শাস্তি চায় বটে, কিন্তু সে কাকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শাস্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শাস্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীরসরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলদের জিম্মায়। এইজন্য যে তাগশীলতার সত্যকার শাস্তি সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। যেখানে শক্ত পাহারা সেখানে লোভ দমন করতে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। সেখানে মানুষ সংযত হয় এবং নিজেকে খুব ভালো ছেলে বলেই মনে করে। কিন্তু আলগা পাহারা যেখানে সেখানে ভয়ও থাকে না, লজ্জাও

কালান্তর

চলে যায়। এমন-সব জায়গা আছে যেখানে ভালো ছেলে বলে নিজের পরিচয় দিলে লাভ আছে; কিন্তু দুর্বলের সঙ্গে যেখানে কারবার সেখানে বেচারী প্রবল পক্ষের ভালো হওয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব'লেই যে কত কঠিন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের লেখা থেকে একটা জায়গা উদ্ধৃত করি। তিনি চীনদেশের সঙ্গে যুরোপের সম্বন্ধ-আলোচনা উপলক্ষে লিখছেন—

In our own times, the Christian acquired the habit of sending jointly or separately into that vast Empire, whenever order was disturbed, soldiers who restored it by means of theft, rape, pillage, murder, and incendiarism, and of proceeding at short intervals with the pacific penetration of the country with rifles and guns. The poorly armed Chinese either defend themselves badly or not at all, and so they are massacred with delightful facility..... In 1901, order having been disturbed at Peking, the troops of the five Great Powers, under the command of a German Field-Marshal, restored it by the customary means. Having in this fashion covered themselves with military glory, the five Powers signed one of the innumerable treaties by which they guarantee the integrity of the very China whose provinces they divide among themselves.

পীকিনে যে ভাঙচুর লুটপাট ও উৎপাত হয়েছিল মানুষের দুঃখ এবং অপমানের পক্ষে সে বড়ো কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে লজ্জা পাওয়া এবং লজ্জা দেওয়ার পরিমাণ আধুনিক যুরোপীয় যুদ্ধঘটিত আলোচনার তুলনায় কতই অণুপরিমাণমাত্র তা সকলেই জানেন। এর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ভালো হওয়ার যে কঠিন আদর্শ মানুষের মনুষ্যত্বকে উর্ধ্বে ধারণ ক'রে রাখে দুর্বলের সংসর্গে সেইটে নেমে যায়। মানুষ নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে একটা সন্ধিপত্র লেখাপড়া করে নেয়; বলে, ভালোমানুষ

বাতায়নিকের পত্র

বিচার নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের যে-একটা নিরন্তর লড়াই চলছে অমুক-অমুক চৌহদ্দির মধ্যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণে টিল দেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে আমরাও এ কাজ করেছি; শূদ্রকে ব্রাহ্মণ এত দুর্বল করেছিল যে তার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের না ছিল লজ্জা, না ছিল ভয়। আমাদের সংহিতাগুলি আলোচনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। দেশ জুড়ে আজ তার যে ফল ফলেছে তা বোঝবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে, দুর্গতি এত গভীর।

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনি ভয়ংকর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না ব'লেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নীচের দিকে টেনে নেয়। শক্তির আয়তন যত প্রকাণ্ড, তার ভার যতই বেশি, তার প্রতি অশক্তির নীচের দিকের টান ততই ভয়ংকর। যে মাটি বাধা দেয় না তাকে পদাঘাত যত জোরেই করবে, পদের পক্ষে ততই বিপদ ঘটবে।

যে জায়গায় হাওয়া হালকা সেই জায়গাই হচ্ছে ঝড়ের কেন্দ্র। এইজন্মে যুরোপের বড়ো বড়ো ঝড়ের আসল জন্মস্থান এশিয়া, আফ্রিকা। ঐখানে বাধা কম, ঐখানে ত্রায়পরতার যুরোপীয় আদর্শ খাড়া রাখবার প্রেরণা দুর্বল। এবং আশ্চর্য এই যে, সেই ত্রায়পরতার আদর্শ যে নেমে চলেছে, বলদর্পে মানুষ সেটা বুঝতেই পারে না। এইটেই হচ্ছে দুর্গতির পরাকাষ্ঠা।

এই অসাড়তা, এই অন্ধতা এত দূর পর্যন্ত যায় যে, এক-এক সময়ে তার কাণ্ড দেখে বড়ো হুঃখেও হাসি আসে। যুরোপের স্তুড়িখানা থেকে পোলিটিকাল মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন একদল যুবক আমাদের দেশে আছে। তারা নিজদের মধ্যে খুনোখুনি করে। তাই দেখে অনেকবার এই কথাই ভেবেছি, মানুষের স্বদেশী পাপের তো অভাব নেই, এর উপরে যারা বিদেশী পাপের আমদানি করছে তারা

কালান্তর

আমাদের কলুষের ভার আরো ছর্ব্বহ করে তুলছে। এমন সময়ে আমাদের বাংলাদেশের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা এই-সমস্ত পোলিটিক্যাল হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্য করে বলে বসলেন, খুন করা সম্বন্ধে বাংলাদেশের ধর্মবুদ্ধি যুরোপের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন, বাঙালি জানে, খুন করা আর-কিছুই নয়, মানুষকে এক লোক থেকে আর-এক লোকে চালান করে দেওয়া মাত্র।’ যে পাশ্চাত্যদের কাছে বাঙালি ছাত্র এই-সমস্ত অপকর্ম শিখেছে অবশেষে তাঁদেরই কাছ থেকে এই বিচার! পলিটিক্সের হাতে তাঁরা মানুষের প্রাণ যে কিরকম ভয়ংকর সস্তা করে তুলেছেন, সেটা বোধ হয় অভ্যাসবশত নিজে তেমন করে দেখেন না, বাইরের লোকে যেমন দেখতে পায়। এই-সব পলিটিক্স-বিলাসীদের কি কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্ব নেই? তাঁদের সেই মনস্তত্ত্বের শিকারিটাই আজ সমস্ত পৃথিবীময় খুন ছড়িয়ে চলেছে, এ কথা তাঁরাও ভুললেন?

ওরা আমাদের থেকে আলাদা, একেবারে ভিতরের দিক থেকে আলাদা, এই কথা যারা বলে তারা এরা-ওরার সম্বন্ধে গোড়া ঘেষে কলুষিত করে। এদের সম্বন্ধে যে নিয়ম এদের সম্বন্ধে সে নিয়ম চলতেই পারে না বলে তারা নিজের ধর্মবুদ্ধিকে ঠাণ্ডা রাখে; অন্ত্রায়ের মধ্যে, নিষ্ঠুরতার মধ্যে যতটুকু চক্ষুলাজ্ঞা এবং অস্বস্তি আছে সেটুকু তারা মেরে রাখতে চায়। যত দিন ধরে প্রাচ্যদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের সম্বন্ধ হয়েছে তত দিন থেকেই এইসব বুলির উৎপত্তি। গায়ের জোরে যাদের প্রতি অন্ত্রায় করা সম্বন্ধ, তাদের সম্বন্ধে অন্ত্রায় করতে পাছে মনের জোরেও কোথাও বাধে, সেইজন্তে এরা সে রাস্তাটুকুও সাফ রাখতে চায়।

১ ১৯১২ খৃস্টাব্দে বৃটিশ দ্বীপে প্রতি লক্ষ লোকে ১৭ অংশ লোকের খুনের অভিযোগে বিচার হয়েছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রতি লক্ষ লোকে ০৮ অংশ লোকের খুনের চার্জে বিচার হয়েছিল। হাতের কাছে বই না থাকতে সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারলাম না।

বাতায়নিকের পত্র

আমি পূর্বেই বলেছি, দুর্বলের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়— নিজেদের এক আদর্শে বিচার করি, অন্যদের অন্য আদর্শে। নিজেদের ছাত্রেরা যখন গোলমাল করে তখন সেটাকে স্নেহপূর্বক বলি যৌবনোচিত চাঞ্চল্য, অন্যদের ছাত্ররাও যখন মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে সেটাকে চোখ রাঙিয়ে বলি নষ্টামি। পরজাতিবিষেবের লেশমাত্র লক্ষণে ভয়ংকর রাগ হয় যখন সেটা দেখি দুর্বলের তরফে, আর নিজের তরফে তার সাতগুণ বেশি থাকলেও তার এত রকমের সংগত কারণ পাওয়া যায় যে, সেটার প্রতি স্নেহই জন্মায়। আবার আনাতোল ফ্রান্সের ষারস্ব হচ্ছে। তার কারণ, চিন্তা তার স্বচ্ছ, কল্পনা তার দীপ্যমান, এবং যেটা অসংগত সেটা তার কৌতুকদৃষ্টিতে মুহূর্তে ধরা পড়ে; পররাজ্যশাসনের বালাই তার কোনো দিন ঘটে নি। চীনেদের কথাই চলছে—

They are polite and ceremonious, but are reproached with cherishing feeble sentiments of affections for Europeans. The grievances we have against them are greatly of the order of those which Mr. Du Chaillu cherished towards his Gorilla. Mr. Du Chaillu, while in a forest, brought down with his rifle the mother of a Gorilla. In its death the brute was still pressing its young to its bosom. He tore it from its embrace, and dragged it with him in a cage across Africa, for the purpose of selling it in Europe. Now, the young animal gave him just cause for complaint. It was unsociable, and actually starved itself to death. "I was powerless," says Mr. Du Chaillu, "to correct its evil nature."

তাই বলছি, সবলের সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে দুর্বলের কাছে। দুর্বল তার ধর্মবুদ্ধি এমন করে অপহরণ করে যে, সবল তা দেখতেই পার না, বুঝতেই পারে না। আজকের দিনে এই বিপদটাই পৃথিবীতে সব

কালান্তর

চেয়ে বেড়ে উঠছে। কেননা হঠাৎ বাহুবলের অতিরিক্তি ঘটেছে। দুর্বলকে শাসন করা ক্রমেই নিরতিশয় অবাধ হয়ে আসছে। এই শাসন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এতই আটঘাট-বাধা যে এর জালে যে বেচারী পড়েছে কোথাও কোনো কালে এতটুকু কাঁক দিয়ে একটুখানি বেরবার তার আশা নেই। তবুও কিছুতেই আশ মিটছে না, কেননা লোভ যে ভীক, সে অতিবড়ো শক্তিমানকেও নিশ্চিন্ত হতে দেয় না। শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে শাসনের ইঙ্গু-কলে এমনি কবে প্যাচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চাঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। কিন্তু শাসনকে এত বেশি সহজ করে ফেলে যারা, নিজের মনুষ্যত্বের তহবিল ভেঙে এই অতিসহজ শাসনের মূল্য তাদের জোগাতে হবে। প্রতিদিন এই-যে তহবিল ভেঙে চলা এর ফলটা প্রতিদিন নানা আকারে নিজের ঘরেই দেখা দেবে। এখনো দেখা দিচ্ছে কিন্তু তার হিসাব কেউ মিলিয়ে দেখছে না।

এই তো প্রবল পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য। আমাদের পক্ষে এসব কথা বেশি করে আলোচনা করতে বড়ো লজ্জা বোধ হয়, কেননা বাইরে থেকে এর আকারটা উপদেশের মতো, কিন্তু এর ভিতরের চেহারাটা মার খেয়ে কান্নারই রূপান্তর। এক দিকে ভয়, আর-এক দিকে কান্না, দুর্বলের এইটেই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা। প্রবলের সঙ্গে লড়াই করবার শক্তি আমাদের নেই কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই আমাদের করতেই হবে। আর যাই করি, ভয় আমরা করব না, এবং কথা বলা যদি বন্ধ করে দেয় তবে সমুদ্রের এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত নাকি সুরে কান্না আমরা তুলব না।

হুঃখের আগুন যখন জ্বলে তখন কেবল তার তাপেই জ্বলে মরব আর তার আলোটা কোনো কাজেই লাগাব না, এটা হলোই সব চেয়ে

বাতায়নিকের পত্র

বড়ো লোকসান। সেই আলোটাতে মোহ-আঁধার ঘুচুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো। নিজের মনকে একবার জিজ্ঞাসা করো, ঐ বীভৎস শক্তিমান মানুষটাকে যত বড়ো দেখাচ্ছে সে কি সত্যিই তত বড়ো। বাইরে থেকে সে ভাঙচুর করতে পারে, কিন্তু ভিতর থেকে মানুষের জীবনের সম্পদ লেশমাত্র যোগ করে দিয়ে যাবার সাধ্য ওর আছে? ও সন্ধি করতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে কি? ও অভিভূত করতে পারে, কিন্তু শক্তি দান করতে পারে কি? আজ প্রায় দু হাজার বছর আগে সামান্য একদল জালজীবীর অখ্যাত এক গুরুকে প্রবল রোম-সাম্রাজ্যের একজন শাসনকর্তা চোরের সঙ্গে সমান দণ্ডকাঠে বিঁধে মেরেছিল। সে দিন সেই শাসনকর্তার ভোজের অর্থে কোনো ব্যক্তির ক্রটি হয় নি এবং সে আপন রাজপালকে আরামেই ঘুমতে গিয়েছিল। সে দিন বাইরে থেকে বড়ো দেখিয়েছিল কাকে? আর আজ? সেদিন সেই মশানে বেদনা এবং মৃত্যু এবং ভয়, আর রাজপ্রাসাদে ভোগ এবং সমারোহ। আর আজ? আমরা কার কাছে মাথা নত করব? কসৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

৪

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয়টা হচ্ছে, এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর-এক দেবতার অভ্যুদয়। সহজেই এই কথা মনে হয় যে, দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তা হলে সেটা ধর্মনীতিগত আদর্শেরই তারতম্য নিয়ে। যদি মানুষের ধর্মবুদ্ধিকে নূতন দেবতা পুরাতন দেবতার চেয়ে বেশি তৃপ্তি দিতে পারেন তা হলেই তাঁকে বরণ করবার সংগত কারণ পাওয়া যায়।

কিন্তু এখানে দেখি একেবারেই উল্টো। এক কালে পুরুষদেবতা

কালান্তর

যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, 'আমার পুজো চাই।' অর্থাৎ 'যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই।' তোমার দলিল কী? গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে? যে উপায়েই হোক। তার পরে যে-সকল উপায় দেখা গেল মানুষের সদ্বুদ্ধিতে তাকে সহুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই-সকল উপায়েই জয় হল। ছলনা অস্তায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়, কবিদের দিয়ে মন্দির বাজিয়ে চামর ছুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে। লজ্জিত কবির কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'কী করব, আমার উপর স্বপ্নে আদেশ হয়েছে।' এই স্বপ্ন এক দিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল।

সেদিনকার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ইতিহাসের যে-একটা আবছায়া দেখতে পাচ্ছি সেটা এই রকম—বাংলা সাহিত্য যখন তার অব্যক্ত কারণসমূহের ভিতর থেকে প্রবালদ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে, বিদীর্ণ হয়ে, টুকরো টুকরো হয়ে নানা প্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে। স্বপ্নে যেমন এক থেকে আর হয়, তেমনি করেই বুদ্ধ তখন শিব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শিব ত্যাগী, শিব ভিক্ত, শিব বেদবিরুদ্ধ, শিব সর্বসাধারণের। বৈদিক দর্শনের সঙ্গে এই শিবের বিরোধের কথা কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গলের গোড়াতেই প্রকাশিত আছে। শিবও দেখি বুদ্ধের মতো নির্বাণমুক্তির পক্ষে; প্রলয়েই তাঁর আনন্দ।

কিন্তু এই শক্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। যুগোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, 'যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা. অমন নেহাত ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে; যেমন

বাতায়নিকের পত্র

ক'রে হোক যে নিজেকে আহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পার
বাধা, না করে লক্ষ্য।' কিন্তু যুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের
পানসভার বুলি? যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো
টুকরো ক'রে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।

আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু
এ বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয়
নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল।
কখন? যখন—

নারায়ণ, পরাশর, এড়াইল দামোদর,
উপনীত কুচট্যানগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান, করিলুঁ উদকপান,
শিশু কাদে ওদনের তরে।
আশ্রম পুথরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া,
পূজা কৈলুঁ কুমুদ প্রসূনে।
কুধাতর পরিশ্রমে, নিত্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।

সেদিনকার শক্তির স্বপ্ন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল কুধা তর পরিশ্রমের
মধ্যে।

শোনা গেছে, ইতিহাসের গান অমিত্রাকরে হয় না, এর চরণে চরণে
মিল। সেই পাঁচ শো বছর পূর্বের এক চরণের সঙ্গে আজ-পাঁচ শো বছর
পরের এক চরণের চমৎকার মিল শোনা যাচ্ছে না কি? যুরোপের
শক্তিপূজক আজ বুক কুলিয়ে বড়ো সমারোহেই শক্তির পূজা করছেন—
মদে তাঁর ছই চক্ষু জ্বাকুলের মতো টকটক করছে, খাঁড়া শাণিত,
বলির পশু রূপে বাধা। তাঁরা কেউ কেউ বলছেন 'আমরা ষিঙকে মানি
নে'; আবার কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের মতো গোঁজামিলন দিয়ে বলছেন,

কালান্তর

যিগুর সঙ্গে শক্তির সঙ্গে ভেদ করে দেওয়া ঠিক নয়, অধনারীশ্বর মূর্তিতে দুজনকেই সমান মানবার মন্ত্র আছে। অর্থাৎ, এক দল মদ খাচ্ছেন রাজাসনে ব'সে, আর-এক দল পল্লিপিতে চ'ড়ে।

আর আমরাও বলছি, শিবকে মানব না। শিবকে মানা কাপুরুষতা। আমরা চণ্ডীর মঙ্গল গাইতে বসেছি। কিন্তু সে মঙ্গলগান স্বপ্নলক। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমের স্বপ্ন। জয়ীর চণ্ডীপূজায় আর পরাজিতের চণ্ডীগানে এই তফাত।

স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী? ঐ দেখো-না ব্যাধের দশা, তার স্ত্রী কুল্লরার বারমাস্তা একবার শোনো। কিন্তু, হল কী! হঠাৎ খামখেয়ালি শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙুটি দিলেন যে, ঘরে আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সানাত্ত বাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হুমুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা' ক'রে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্তায় মানে না; সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না; সে যেন-তেন প্রকারে ছোট্টোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্তে যোগ্য হবার দরকার নেই, অস্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না: যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলমুত্তরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে। কেবল করজোড়ে তারস্বরে বলতে হবে—
মা, মা, মা!

যখন মোগলপাঠানের বস্তা দেশের উপর ভেঙে পড়ল, তখন সংসারের যে বাহু রূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পেল সেটা শক্তিরই

বাতায়নিকের পত্র

রূপ । সেখানে ধর্মের হিসাব পাওয়া যায় না, সেখানে শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় । মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে ‘আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না’, তা হলেই মানুষের জিত হয় । টান্দ-সদাগর কিংবা ধনপতির বিজ্রোহের মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল । মারের পর মার খেয়েছে কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি । মিথ্যা এবং অন্ত্যায় চার দিক থেকে তাদের আক্রমণ করলে ; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত ক’রে, দুঃখে জর্জর ক’রে, ক্ষতিতে দুর্বল ক’রে, ‘মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জোর ক’রে আমার পূজা আদায় করবই ।’ নইলে : ‘নইলে আমার প্রেষ্টিজ যায় ।’ ধর্মের প্রেষ্টিজের জন্তে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তাঁর প্রেষ্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার প্রেষ্টিজ । অতএব মারের পর মার, মারের পর মার ।

অবশেষে দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, তখন শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে আধমরা সদাগর মাথা হেঁট করলে । শক্তি তাদের এত দিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল সে দুঃখে তেমন অপমান নেই যেমন অপমান শেষকালে এই মাথা হেঁট ক’রে । যে আত্মা অতন্ন, যে আত্মা অমর, সে আপন প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা ব’লে, আপনার চেয়ে বড়ো ব’লে মানলে । এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল ।

আমরা আজ যুরোপের দেবতাকে স্বপ্নে পূজা করতে বসেছি, এইটেতেই যুরোপের কাছে আমাদের সব চেয়ে পরাভব হয়েছে । যদি সে আমাদের আঘাত করতে চায় করুক, আমরা সহ্য করব, কিন্তু তাই বলে পূজা করব ? সে চলবে না ; কেননা পূজা করতে হবে ধর্মরাজকে । সে দুঃখ দেবে, দিক গে । কিন্তু, হারিয়ে দেবে ? কিছুতে না । মরার

কালান্তর

বাড়া গাল নেই ; কিন্তু মরেও অমর হওয়া যায় এই কথা যদি কিছুতে ভুলিয়ে দেয়, তা হলে তার চেয়ে সর্বনেশে মৃত্যু আর নেই ।

মহাস্তং বিভূম্ আত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।

মানুষের ইতিহাসের রথ আজ যত বড়ো ধাক্কা খেয়েছে এমন আর কোনো দিনই যায় নি । তার কারণ আধুনিক ইতিহাসের রথটা কলের গাড়ি, বহু কৌশলে ওর লোহার রাস্তা বাঁধা, আর এক-একটা এঞ্জিনের পিছনে গাড়ির শ্রেণী প্রকাণ্ড লম্বা হয়ে বাঁধা পড়েছে । তার পরে ওর পথ চলেছে জগৎ জুড়ে, নানা জায়গায় নানা পথে কাটাকাটি । কাজেই কলে কলে যদি একবার সংঘাত বাধল, যদি পরস্পরকে বাঁচিয়ে চলতে না পারল, তা হলে সেই দুর্ঘোণে ভাঙচুরের পরিমাণ অতি ভয়ানক হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ধরধর করে কাঁপতে থাকে ।

এই কলের গাড়ির সংঘাত এবারে খুব প্রবল ধাক্কা খেটেছে ; কি মাল কি সওয়ারি নাস্তানাবুদ হয়ে গেল । তাই চারি দিকে প্রশ্ন উঠেছে, এ কী হল, কেমন করে হল, কী করলে ভবিষ্যতে এমন আর না হতে পারে ?

মানুষের ইতিহাসে এই প্রশ্ন এবং বিচার যখন উঠে পড়েছে তখন আমাদেরও কি ভাবতে হবে না ? তখন, শুধুই কি পরের নামে নালিশ করব ? নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করব না ?

আমি পূর্বেও আভাস দিয়েছি, এখনও বলছি, দুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক । বাতাসে যেখানে যা-কিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে দুর্বল তাকেই আতিথ্য দান করে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে । ভীক

বাতায়নিকের পত্র

কেবল ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমানকে সৃষ্টি করে।

চোখে যেখানে আমরা দেখতে পাই নে সেখানে আমাদের ব্যথা পৌঁছয় না ; মাটির উপর যে-সব পোকামাকড় আছে তাদের আমরা অবাধে মাড়িয়ে চলি, কিন্তু যদি সামনে একটা পাখি এসে পড়ে তার উপরে পা ফেলতে সহজে পারি নে। পাখির সম্বন্ধে যে বিচার করি পিপড়ের সম্বন্ধে সে বিচার করি নে।

অতএব মানুষের প্রধান কর্তব্য, তাকে এমনটি হতে হবে যাতে তাকে মানুষ বলে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ কর্তব্য কেবল তার নিজের সুবিধের জন্তে নয়, পরের দায়িত্বের জন্তেও। মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে এটা, যে লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারণ পক্ষে কল্যাণের নয়। আপনাকে যে খর্ব করে সে যে কেবল নিজেকেই কমিয়ে রাখে তা নয়, মোটের উপর সমস্ত মানুষের মূল্য সে হ্রাস করে। কেননা, যেখানেই আমরা মানুষকে বড়ো দেখি সেখানেই আপনাকে বড়ো বলে চিনতে পারি ; এই পরিচয় যত সত্য হয় নিজেকে বড়ো রাখবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে তত সহজ হয়।

প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্তে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে, এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। সে মানুষ যারই সামনে আছুক তার চোখে সে পড়বেই, কাজেই ব্যবহারের বেলায় তার সঙ্গে ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতেই হবে। তাকে বিচার করবার সময় কেবলমাত্র বিচারকের নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই যে ভরসা তা নয়, যথোচিত বিচার পাবার দাবি তার নিজের মধ্যেই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

অতএব যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই

কালান্তর

যে, ক্রমশই সে জাতির প্রত্যেক বিভাগের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারিত্ব চলে যাচ্ছে। যথাগন্তব্য তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এইজন্মেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং ষথেষ্ট অবকাশ ও স্বাভিজ্ঞ্য লাভ করবে।

কিন্তু, আমাদের দেশে কী হয়েছে? আমরা বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। তারা যে খাটো এটা কোনো তর্ক বা বিচারের উপরে নির্ভর করে না, এটাকে বিধিমতে সংস্কারগত করে তুলেছি। এমনি হয়েছে যে, যাকে ছোটো করেছি সে নিজে হাত জোড় করে বলছে, 'আমি ছোটো।' সমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সমতুল্য করতে চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি; তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না। বরঞ্চ তাদের চালচলন যদি উপরের আদর্শ অবলম্বন করতে যায়, তা হলে সেটাতে বিরক্তি বোধ হয়।

তার পরে এই-সব চির-অপমান-দীক্ষিত মানুষগুলো যখন মানব-সভায় স্বভাবতই জোর-গলায় সম্মান দাবি করতে না পারে, যখন তারা এত সংকুচিত হয়ে থাকে যে বিদেশী উদ্ধতভাবে তাদের অবজ্ঞা করতে অন্তরে বাহিরে বাধা বোধ না করে, তখন সেটাকে কি আমাদের নিজেরই কৃতকর্ম বলে গ্রহণ করব না?

আমরা নিজেরা সমাজে যে অজ্ঞায়কে আটেঘাতে বিধিবিধানে বেঁধে

বাতায়নিকের পত্র

চিরস্থায়ী করে রেখেছি সেই অন্তায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্তের হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে, তখন সেটার সহকে সর্বতোভাবে আপত্তি করবার জোর আমাদের কোথায় ?

জোর করি সেই বিদেশীরই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে । সে দোহাইয়ে কি লজ্জা বেড়ে ওঠে না ! এ কথা বলতে কি মাথা হেঁট হয়ে যায় না যে 'সমাজে আমাদের আদর্শকে আমরা ছোটো করে রাখব, আর পলিটিক্সে তোমাদের আদর্শকে তোমরা উঁচু করে রাখো' ? 'আমরা দাসত্বের সমস্ত বিধি সমাজের মধ্যে বিচিত্র আকারে প্রবল করে রাখব আর তোমরা তোমাদের ঔদার্যের দ্বারা প্রভুত্বের সমান অধিকার আমাদের হাতে নিজে তুলে দেবে ; যেখানে আমাদের এলেকা সেখানে ধর্মের নামে আমরা অতি কঠোর ক্লেশতা করব, কিন্তু যেখানে তোমাদের এলেকা সেখানে সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে অপর্যাপ্ত বদান্ধতার জন্তে তোমাদের কাছে দরবার করতে থাকব' এমন কথা বলি কোন্ মুখে ? আর যদি আমাদের দরবার মঞ্জুর হয় ? যদি আমরা আমাদের দেশের লোককে প্রত্যাহ অপমান করতে কুণ্ঠিত না নই, অথচ বিদেশের লোক এসে আপন ধর্মবুদ্ধিতে সেই অপমানিতদের সম্মানিত করে. তা হলে ভিতরে বাহিরেই কি আমাদের পরাভব সম্পূর্ণ হয় না ?

আজকের দিনে যে কারণে হোক দুঃখ এবং অপমানের বেদনা নিরতিশয় প্রবল হয়ে উঠেছে ; এই উপলক্ষে আমাদের মনে একটা কথা আশা করবার আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, ধর্মবুদ্ধিতে যখন অল্প পক্ষের পরাভব হচ্ছে তখন সেইখানে আমরা এদের উপরে উঠব । তা হলে এদের হাতের আঘাতে আমাদের গৌরব-হানি করবে না বরং বাড়াবে । কিন্তু সেখানেও কি আমরা বলব, 'ধর্মবুদ্ধিতে তোমরা আমাদের চেয়ে বড়ো হয়ে থাকো, নিজেদের সহকে আমরা যে রকম ব্যবহার করবার

কালান্তর

আশা করি নে আমাদের সম্বন্ধে তোমরা সেই রকম ব্যবহারই করো' ? অর্থাৎ, 'চিরদিনই নিজের ব্যবস্থায় আমরা নিজের খাটো করে রাখি, আর চিরদিনই তোমরা নিজগুণে আমাদের বড়ো করে তোলো।' সমস্ত বরাতই অস্ত্রের উপরে, আর নিজের উপরে একটুও নয় ? এত অশ্রদ্ধা নিজেকে, আর এতই শ্রদ্ধা অস্ত্রকে ? বাহুবলগত অধমতার চেয়ে এই ধর্মবুদ্ধিগত অধমতা কি আরো বেশি নিকৃষ্ট নয় ?

অল্প কাল হল একটা আলোচনা আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তার সিদ্ধান্ত এই যে, পরস্পরের মধ্যে পাকা দেওয়ালের ব্যবধান থাকে সত্ত্বেও এক চালের নীচে হিন্দু মুসলমান আহার করতে পারবে না, এমন কি সেই আহারে হিন্দু-মুসলমানের নিষিদ্ধ কোনো আহার্য যদি নাও থাকে। যারা এ কথা বলতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময় তাঁরাই সন্দেহ করেন যে বিদেশী কর্তৃপক্ষেরা এই বিরোধ ঘটাবার মূলে। এই সন্দেহ যখন করেন তখন ধর্মবিচারে তাঁরা বিদেশীকে দণ্ডনীয় মনে করেন। এর একমাত্র কারণ, ধর্মের দাবি নিজের উপরে তাঁদের যতটা বিদেশীর উপরে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বদেশে মানুষে মানুষে ব্যবধানকে আমরা দুঃসহরূপে পাকা করে রাখব সেইটেই ধর্ম, কিন্তু বিদেশী সেই ব্যবধানকে কোনো কারণেই কোনো মতেই নিজের ব্যবহারে লাগালে সেটা অধর্ম। আত্মপক্ষে দুর্বলতাকে সৃষ্টি করব ধর্মের নামে, বিরুদ্ধপক্ষে সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করলেই সেটাকে অস্ত্র বলব।

যদি জিজ্ঞাসী করা যায়, পাকা দেওয়ালের অপর পারে যেখানে মুসলমান খাচ্ছে দেওয়ালের এ পারে সেখানে হিন্দু কেন খেতে পারে না, তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই আবশ্যিক হবে না। হিন্দুর পক্ষে এ প্রশ্নে বুদ্ধি খাটানো নিষেধ এবং সেই নিষেধটা বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে কত অদ্ভুত ও লজ্জাকর তা মনে উদয় হবার শক্তি পর্যন্ত চলে গেছে।

বাতায়নিকের পত্র

সমাজের বিধানে নিজের বারো-আনা ব্যবহারের কোনোপ্রকার সংগত কারণ নির্দেশ করতে আমরা বাধ্য নই, যেমন বাধ্য নয় গাছপালা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী। পলিটিক্সে বিদেশীর সঙ্গে কারবারে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখেছি, সে ক্ষেত্রে সকল রকম বিধিবিধানের একটা বুদ্ধিগত জবাবদিহি আছে ব'লে মানতে অভ্যাগ করছি; কিন্তু সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার, যার উপরে পরস্পরের গুরুতর সুখদুঃখ শুভাশুভ প্রভ্যহ নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে বুদ্ধির কোনো কৈফিয়ত, নেওয়া চলে, এ কথা আমরা ভাবতেও একেবারে ভুলে গেছি।

এমনি ক'রে যে দেশে ধর্মবুদ্ধিতে এবং কর্মবুদ্ধিতে মানুষ নিজেকে দাসামুদাস করে রেখেছে সে দেশে কর্তৃষের অধিকার চাইবার সত্যকার জোর মানুষের নিজের মধ্যে থাকতেই পারে না। সে দেশে এই-সকল অধিকারের জন্তে পরের বদান্যতার উপরে নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি, মানুষ যেখানে নিজেকে নিজে অত্যন্ত ছোটো এবং অপমানিত ক'রে রাখে সেখানে তার কোনো দাবি স্বভাবত কারও মনে গিয়ে পৌঁছয় না। সেইজন্তে তাদের সঙ্গে যে-সকল প্রবলের ব্যবহার চলে সেই প্রবলদের প্রতিদিন দুর্গতি ঘটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের আদর্শ তাদের না নেমে গিয়ে থাকতে পারে না। ক্রমশই তাদের পক্ষে অণ্ডায় ঔদ্ধত্য এবং নিষ্ঠুরতা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে। নিজের ইচ্ছাকে অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে একান্ত সহজ হওয়াতেই মানবস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা নিজের অগোচরেই তাদের মনে শিথিল হয়ে আসে। ক্রমতা যতই অবাধ হয় ক্রমতা ততই মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। এইজন্তে ক্রমতাকে যথোচিত পরিমাণে বাধা দেবার শক্তি যার মধ্যে নেই তার দুর্বলতা সমস্ত মানুষেরই শত্রু। আমাদের সমাজ মানুষের ভিতর থেকে সেই

কালান্তর

বাধা দূর করবার একটা অতি ভয়ংকর এবং অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র । এই যন্ত্র এক দিকে বিধান-অক্ষৌহিণী দিয়ে আমাদের চার দিকে বেড়ে ধরেছে ; আর-এক দিকে, যে বুদ্ধি, যে যুক্তি দ্বারা আমরা এর সঙ্গে লড়াই করে মুক্তিলাভ করতে পারতুম সেই বুদ্ধিকে, সেই যুক্তিকে একেবারে নির্মূল করে কেটে দিয়েছে । তার পরে অল্প দিকে অতি লঘু ক্রটির জন্তে অতি গুরু দণ্ড । খাওয়া শোওয়া ওঠা বসার তুচ্ছতম স্থলন সম্বন্ধে শাস্তি অতি কঠোর । এক দিকে মৃত্যুর ভারে অল্প দিকে ভয়ের শাসনে মানুষকে অভিভূত করে জীবনযাত্রার অতিক্রম খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তার স্বাভিকৃতি ও স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে । তার পরে ? তার পরে শিক্ষা, ভিক্ষা না মিললে কান্না । এই ভিক্ষা যদি অতি সহজেই মেলে, আর এই কান্না যদি অতি সহজেই থামে, তা হলে সকল প্রকার মারের চেয়ে, অপমানের চেয়ে সে আমাদের বড়ো দুর্গতির কারণ হবে । নিজেকে আমরা নিজে ছোটো করে রাখব, আর অল্পে আমাদের বড়ো অধিকার দিয়ে প্রশ্রয় দেবে, এই অভিশাপ বিধাতা আমাদের দেবেন না ব'লেই আমাদের এত দুঃখের পর দুঃখ ।

জাহাজের খোলের ভিতরটায় যখন জল বোঝাই হয়েছে তখনই জাহাজের বাইরেরকার জলের মার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে । ভিতরকার জলটা তেমন দৃশ্যমান নয়, তার চালচলন তেমন প্রচণ্ড নয় ; সে মারে ভারের দ্বারা, আঘাতের দ্বারা নয়, এইজন্যে বাইরের চেউয়ের চড়-চাপড়ের উপরেই দোষারোপ করে তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে । কিন্তু হয় মরতে হবে নয় এক দিন এই সুবুদ্ধি মাথায় আসবে যে, আসল মরণ ঐ ভিতরকার জলের মধ্যে, ওটাকে যত শীঘ্র পারা যায় সঁচে ফেলতেই হবে । কাজটা যদি দুঃসাধ্যও হয় তবু এ কথা মনে রাখা চাই যে, সমুদ্র সঁচে ফেলা সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ খোলের জল সঁচে ফেলা । এ কথা মনে রাখতে হবে, বাইরে বাধাবিহীন বিকল্পতা

বাতায়নিকের পত্র

চিরদিনই থাকবে, থাকলে ভালো বই মন্দ নয়, কিন্তু অন্তরে বাধা থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এইজন্যে ভিষ্কার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে; তাতে অপমানও বাবে, ফলও পাব।

আষাঢ় ১৩২৬

শক্তিপূজা

বাতায়নিকের পত্রে আমি শক্তিপূজার যে আলোচনা করেছি সে সম্বন্ধে সাময়িক-পত্রে একাধিক লোকে প্রতিবাদ লিখেছেন।

আমাদের দেশে শিব এবং শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই। তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক এবং আর-একটিকে লৌকিক বলা যেতে পারে। শাস্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী। লৌকিক শিব উন্মত্ত, উচ্ছ্বল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে পাই। এমন কি, রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অনন্যদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত সে আর্যসমাজসম্মত নয়।

শক্তির যে শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় আমি তা স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সে লৌকিক, এবং তার ভাব অন্তরূপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত, অথচ এই পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসংগত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা স্বেচ্ছাচারিণী নির্ধুর শক্তির অগ্নায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে—এবং সেই ঈর্ষাপরায়ণা শক্তিকে স্তবের দ্বারা, পূজার দ্বারা, শাস্ত করবার আশাই এই-সকল মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা।

প্রচণ্ড দেবতার স্বেচ্ছাচারের বিতীর্ণিকা মানবজাতির প্রথম পূজার মূলে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ মানুষ তখনো বিশ্বের মূলে বিশ্ব-নিয়মকে দেখতে পায় নি এবং তখন সে সর্বদাই ভয়বিপদের দ্বারা বেষ্টিত। তখন শক্তিমানের আকস্মিক ঐশ্বর্যলাভ সর্বদাই চোখে পড়ছে, এবং আকস্মিকতারই প্রভাব মানবসমাজে সব চেয়ে উগ্রভাবে দৃশ্যমান।

যে সময়ে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী অনন্যদামঙ্গল লিখিত হয়েছে সে সময়ে

শক্তিপূজা

মানুষের আকস্মিক উত্থানপতন বিশ্বয়কর রূপে প্রকাশিত হত। তখন চার দিকেই শক্তির সঙ্গে শক্তির সংঘাত চলছে, এবং কার ভাগ্যে কোন্ দিন যে কী আছে তা কেউ বলতে পারছে না। যে ব্যক্তি শক্তিমানকে ঠিকমতো স্তব করতে জানে, যে ব্যক্তি সত্যমিথ্যা স্মার-অস্মার বিচার করে না, তার সমৃদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত তখন সর্বত্র প্রত্যক্ষ। চণ্ডীশক্তিকে প্রসন্ন করে তাকে নিজের ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের অমুকুল করা তখন অন্তত এক শ্রেণীর ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল; তখনকার ধনীমানীরাই বিশেষত এই শ্রেণীভুক্ত ছিল, কেননা তখনকার শক্তির ঝড় তাদের উচ্চ চূড়ার উপরেই বিশেষ করে আঘাত করত।

শাস্ত্রে দেবতার যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে সেইটেই যে আদিম এবং লৌকিকটাই যে আধুনিক, এ কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত মানা যায় না। আমার বিশ্বাস, অনার্যদের দেবতাকে একদিন আর্ষভাবের দ্বারা শোধন ক'রে স্বীকার ক'রে নেবার সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময়ে যে-সব দেবতা ভারতবর্ষের সাধুসমাজে প্রবেশ করেছিল তাদের চরিত্রে অসংগতি একেবারে দূর হতে পারে নি; তাদের মধ্যে আজও আর্ষ অনার্য দুই ধারা মিশ্রিত হয়ে আছে এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই অনার্যধারারই প্রবলতা অধিক।

ধৃষ্টধর্মের বিকাশেও আমরা এই জিনিসটি দেখতে পাই। য়িহদির জিহোবা এক কালে মুখ্যত য়িহদিজাতিরই পক্ষপাতী দেবতা ছিলেন। তিনি কিরকম নির্ধূর ঈর্ষাপরায়ণ ও বলিপ্রিয় দেবতা ছিলেন তা ওল্ড টেস্টামেন্ট, পড়লেই বোঝা যায়। সেই দেবতা ক্রমশ য়িহদি সাধুঋষিদের বাণীতে এবং অবশেষে য়িহুধর্মের উপদেশে সর্বমানবের প্রেমের দেবতা হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন। কিন্তু, তাঁর মধ্যে আজও যে দুই বিরুদ্ধতাব জড়িয়ে আছে তা লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজও তিনি যুদ্ধের দেবতা, ভাগ্যজাগির দেবতা, সাম্রাজ্যিক দেবতা। অধৃষ্টানের

কালান্তর

প্রতি খৃষ্টানের অবজ্ঞা ও অবিচার তাঁর নামের জোরে যত সজীব হয়ে আছে এমন আর-কিছুতে নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক্তধর্মসাধনা এবং বৈষ্ণবধর্মসাধনার মধ্যে ছুই স্বতন্ত্র ভাব প্রাধান্য লাভ করেছে। এক সাধনার পশুবলি এবং মাংসভোজন, অন্য সাধনার অহিংসা ও নিরামিষ আহার—এটা নিতান্ত নিরর্থক নয়। বিশেষ শাস্ত্রে এই পশু এবং অপরাপর মকারের যে ব্যাখ্যাই থাক, সাধারণ ব্যবহারে তা প্রচলিত নেই। এইজন্যেই 'শক্তি' শব্দের সাধারণ যে অর্থ, যে অর্থ নানা চিহ্নে অনুষ্ঠানে ও ভাবে শক্তিপূজার মধ্যে ওতপ্রোত এবং বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যে যে অর্থ প্রচারিত হয়েছে আমি সেই অর্থই আমার রচনায় গ্রহণ করেছি।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দস্যুর উপাস্ত্র দেবতা শক্তি, ঠগীর উপাস্ত্র দেবতা শক্তি, কাপালিকের উপাস্ত্র দেবতা শক্তি। আরো একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা নিজের রক্তপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার ক'রে মানত দেবার প্রথা শক্তিপূজায় প্রচলিত। মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জাতিশত্রুর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল প্রকার প্রার্থনাই শক্তিপূজায় স্থান পায়। এক দিকে দেবচরিত্রের হিংস্রতা, অপর দিকে মানুষের ধর্মবিচারহীন ফলকামনা, এই দুইয়ের যোগ যে পূজায় আছে, তার চেয়ে বড়ো শক্তিপূজার কথা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে নিগূঢ় আছে কি না সেটা আমার আলোচ্য ছিল না। শক্তিপূজার যে অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত সে অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে—অন্যায় অসত্য সে পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য, এবং হিংসা তার পূজোপচার। এই লোভ মন্দ নয়, ভালোই; হিংস্রশক্তি মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক—এমন সকল তর্ক শক্তিপূজক যুরোপে স্পর্ধার সঙ্গে চলছে,

শক্তিপূজা

ইউরোপের ছাত্ররূপে আমাদের মধ্যেও চলছে— সে সম্বন্ধে আমার বা বলবার অন্তর্য বন্দেছি; এখানে এইটুকু বক্তব্য যে, সাধারণ লোকের মনে শক্তিপূজার সঙ্গে একটি উল্লস নিদারুণতার ভাব, নিজের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বলপূর্বক দুর্বলকে বলি দেবার ভাব সংগত হয়ে আছে, বাস্তবনিকের পক্ষে আমি তারই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, কোনো ধর্মসাধনার উচ্চ অর্থ যদি দেশের কোনো বিশেষ শাস্ত্র বা সাধকের মধ্যে কথিত বা জীবিত থাকে তবে তাকে সম্মান করা কর্তব্য। এমন কি, ভূরিপরিমিত প্রচলিত ব্যবহারের চেয়েও তাকে বড়ো বলে জানা চাই। ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়। স্বল্পমপাস্ত্র ধর্মস্ত্র জায়তে মহতো ভয়াৎ।

কাৰ্তিক ১৩২৬

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি; দিন দিন দেখছি, আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুষোগমতো পেল হর। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ঐ'ই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুষোগ এ পর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোনো একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ ক'রে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনি আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব, শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না; বিদ্যাটা দখল করা চাই, তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো, এক বাপের ছুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলের মধ্য মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে, গাড়ি চলে কী ক'রে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে স্তম্ভিতরে বাপের পারের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর ছুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন

শিক্ষার মিলন

করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং এক দিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হাঁশই তার রইল না। তাই ব'লেই তার বাপ যে তাকে তলব ক'রে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়টি তার পাকা ফসলের খেত লগুতগু করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে ছুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে রোথে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে 'মরণং ধ্বং'। তখনো সে বাপের পায়ে দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর-কিছুতে দরকার নেই।'

কিন্তু, দরকার নেই ব'লে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাতো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঞ্জী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাধা নিয়মের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি ক'রে বা মূর্খতা ক'রে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—

কালান্তর

বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিজ্ঞা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে ব'লে বিশ্বভোক্তার প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে। আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে ঝাদের বেলা ঝয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোক যে-বিজ্ঞার জ্বারে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিজ্ঞাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিজ্ঞা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল, শুধু তো বিজ্ঞা নয়, বিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে, তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ঝদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জঙ্ঘরা আহাৰ পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু, মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জঙ্ঘরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে বা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় সেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত ব'লে স্বীকার করে নি ব'লেই ভীষের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটনিতার দলে গিয়ে ভতি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটেছে এ-সমস্তই একটা অদ্বিত জাদুশক্তির জ্বারে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

শিক্ষার মিলন

সেই জাহ্নমের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে— মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তাঁরাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ক্রটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাহ্নকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাহ্ন শরণাপন্ন হবার জন্তে যাদের মন ঝাঁকে, বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্ত হলে গ্রহশাস্তির জন্তে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলা দেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্তে মারণ উচাটন-মন্ত্র আঙড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুনেছি না কি, মন্ত্র-গুণে পালকে পাল ভেড়া মেয়ে ফেলা যায়; সে কি সত্য?' ভল্টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন. 'নিশ্চয়ই মেয়ে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেকো বিষ থাকে চাই।' যুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাহ্নমের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই, এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদীসম্মত। এই-জন্তেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহ্যিক যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ক্রটিবিহীন বিশ্ব-নিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি

কালান্তর

করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে, এইজন্তে এই নিয়মের 'পরে' অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত—এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মার্শ্ব আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্তে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে, বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না, তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়; এইজন্তে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিশের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীকৃতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিকাল স্বাভাবিকতার যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সন্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘ কাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকেই মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনি আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁৎরিয়ে নিয়ে ছুঁতকের মরুভাঙায় আধমরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাহিরে নয়, যে-আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

শিকার মিলন

আমি এক দিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললুম, 'কপাল নয় রে, কুরোর অভাব। পাড়ায় একখানা কুরো দিস নে কেন?' তারা তখনই বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে ক'রে হোক এরা একটা কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই, এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্মেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সঙ্ক্ষে বলেছেন : যথা তথ্যতো হর্ষান্ ব্যদধাৎ শাস্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্ধের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথা তথ্য, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাস্ত কালের, আজ এক রকম কাল এক রকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্ধরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্মে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচলধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত, কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে-দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে : যথা তথ্যতো হর্ষান্ ব্যদধাৎ শাস্তীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্ত কাল থেকে অনন্ত কালের

কালান্তর

অন্ত অর্ধের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বঙ্গরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়াবুম ; এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও ; অন্ন হোক তোমার ; এ রাজ্য তোমারই হোক, এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদণ্ড স্বরাজ্য যে গ্রহণ করেছে অন্ত সকল রকম স্বরাজ্য সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু, নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা, পোলিটিকাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তার আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজ্যে রাজ্যের পর রাজ্যের আমদানি হবে, কেবল ছোট্ট ঐ 'স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অন্ধুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে, তার বাগাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক, তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনীবিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যক্রূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে ; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয় ; অড়ের অত্যাচার, অন্ধুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে।

শিক্ষার মিলন

এই বিজ্ঞা যথাতথ বিধির বিজ্ঞা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে— অল্প উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ব্রহ্মতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুরো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুরোর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুলমাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিতৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একবারেই ভালো নয়, কারণ যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না, স্মরণ্য কর্তা না হলে তাদের চলেই না। আর-একটি কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুরোর জল অপরিষ্কার করে' না ব'লে যেই বলা হয় 'অপবিত্র করে' তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিস অপরিষ্কার করে কি না করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে হলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া; হিন্দুর কুরোর জল, মুসলমানের কুরোর জল; হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য— যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অস্তরের কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত

কালান্তর

দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাভ্যতস্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম, তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি; সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ ক'রে উভয়ের কুয়ো উভয়েই বাবহার করতে পারে, সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহুবস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্তেই এ সমস্তকে সাধারণের বাইরে নির্ধারিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মুঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য এই দুয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এই রকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্তে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিমদুয়ারি ব'লে যদি খামকা ব'লে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র', তা হলে যে বিজ্ঞা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিজ্ঞা অস্তুরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশ্চিম প'রে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি, বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ-পারে ও-পারে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত, আমরা কি তখন স্বরাজ্যশাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি। কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্ত্রবিজ্ঞা ও নিয়মতন্ত্র ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলাম। পশ্চিম পরতে যে বিজ্ঞা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞার দরকার; পশ্চিমেরে খেতে যে বিজ্ঞা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে

শিক্ষার মিলন

অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দক্ষ্যবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্য-চালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্টে গিয়ে থাকে, তার মধ্যে দৈবের কোনো কঁাকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়া-কলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমগ্রা শিক্ষাসমগ্রা। অতএব, স্ত্রীচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনিদ্রা সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। দানব মন অধঃ বলছি নে, ইংরাজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশতলা বাড়ির কুকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষীর অস্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অস্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অষ্টগুণে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে—সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উন্নয়নের ঝোঁকের মাঝখানে যে প'ড়ে গেছে তার রোধ চেপে

কালান্তর

যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাছুরির মস্ততায় সে ভেঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

এক দিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজ্রার জ্ঞানলায় বসে ছিলাম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে? খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দূন চৌদূন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, ছুপুর বাজে, ধরা ধামতেই চায় না। কেননা, ধামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমস্ত থাকত। কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শাস্তি নেই; উত্তেজনা আছে, পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের দল প্রতি ক্ষণেই ভাবছিল, ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলাম তাওবের বাইরে; আমিই বুঝছিলাম, গানহীন তালের দৌরাখ্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি ক'রেই আটলান্টিকের ও পারে ইটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচর অস্ব নেই, কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই— এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগেনা। তাই সে দিন সেই জুকুটিকুটিল অত্রভেদী ঐশ্বর্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিকারের সঙ্গে বলেছে, ততঃ কিম্!

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শূন্য বুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অস্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর তাল রসের সংযমরক্ষা করে,

শিকার মিলন

বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছ্বল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনার ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগির যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলাম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন দৃংপদের মাঝখানে স্নন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম, খেলা, তার বাসা, আসবাব, তার শিষ্টাচার, ধর্মামুষ্ঠান, সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে, সেই স্নন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মানুষের দল আড্ডা করেছে; তালের যে প্রচণ্ড ঝামচ উঠেছে স্নন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাতে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের

কালান্তর

মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা ; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায় ; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত— যেখানে মানুষ, বস্তুকে নয়, আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে ; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না ; সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

যুগোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাধা নিয়ম। নিয়ম এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা টিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তর্ভুক্তি মিল আছে। নিয়মকে কাছে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সতর্ক ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিতৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরূপ সত্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে গুঁড়িয়ে ফেলে। কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে ; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায় ? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিম-দেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্তে আর জায়গা রাখলে না। একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্য দুর্বলতার কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিতৌতিক চালে এক পারে লাফিয়ে মহুশ্যত্বের সার্বকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে ?

শিক্ষার মিলন

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সঙ্ক
তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা
আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির
হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পার না। কেননা ভালোমানুষ
লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই
আগেভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে— তা সে বৃহস্পতিবারের বার-
বেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর
চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু, এই নেহাত ভালোমানুষেরও
একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপকার; সেখানে দাঁড়িয়ে সে
বলতে পারে, 'সাত জনে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই,
ভগবান, আমার 'পরে এই দয়া করো।' অথচ, এই অনবচ্ছিন্ন চা-
বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুঁত ক'রে উপকার করতে জানে।
জানে তাদের কুলির বসুতি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা
লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়ারখানা ডাক্তারখানা
হাটবাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুশিক
সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে, কিন্তু
নাশ্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সঙ্ক
নিয়েই এই কথাটা বলছি। ষাট্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো ক'রে
তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসঙ্কের বিল্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্কু দিয়ে
খাঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনার এবং চেষ্টার প্রধান ক'রে
তুললে অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে
পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে
থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাধার আশ্চর্য সফলতা আছে;
তাতে পণ্যক্রম্য রানীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে

কালান্তর

কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার সুযোগসাধন বল, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের বোলো আনা জিত হয়। কেননা, পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্তে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে, মানুষতে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু, লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধনলাভ করে, বরলাভ করে, সুবিধা-সুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্য। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়ার সাহেব নীল রঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর

শিকার মিলন

শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড়্গড়্ শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রার মানুষের আনন্দ নেই, কেননা, কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই ব'লেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সহ্যেতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিষে এসেছে, এ কথা স্পষ্ট। ভারত আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্য সমাজকে নির্জীব করেছে; যুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্য সমাজকে সে বিলিষ্ট করেছে। কেননা, আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিও বলেছেন, 'আমি আর আমার পিতা এক।' এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভূমীধা মা গৃধঃ কস্তবিদ্বনম্ ।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিগের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন, মা গৃধঃ, লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাইবা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভূমীধাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পছন্দ নেই। তা হলে সভ্যতা কী? সত্য

কালান্তর

হচ্ছে এই 'ঈশাবাস্তমিদং সর্বং', 'সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হ'ত, তার বাইরে আর কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হ'ত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু, ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন, এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা ; আর, তেন ত্যক্তেন ভূম্বীধাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বকোবিদারী ঐশ্বর্যপূরীতে বসে এই সাধনার উন্টো পথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্তমিদং সর্বং' সেইটেই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্তেই সেখানে 'ভূম্বীধাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে ; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অস্তুরাত্মাকে শূণ্য বাখে। সেইজন্তে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, স্তূত্রাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়, 'আরো' 'আরো' হাঁকতে হাঁকতে হাঁপাতে হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার ঘোড়দৌড় করাতে করাতে ঘূর্ণি লাগে ; ভুলেই যেতে হয়, অস্ত্র যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায় ? তার উত্তর এক দিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে— একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল-পড়ার অস্ত্রবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল-পড়ার সত্যকে পাওয়া যায়, এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন খাকা দিয়ে বলবে, ততঃ কিম্ ! তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রপ্নের উত্তরও

শিকার মিলন

মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতন্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, বাস, হয়েছে।

এই তো গেল আপেল-পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অস্বহীন সংখ্যায়? এই প্রশ্নের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মশ্বেবামুপশ্ৰুতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগপসতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত; আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। যমুগুপ্তের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনে এক অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এসে এট ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনে যত্নদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, 'ওই কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে ভাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্তে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিজ্ঞাকেই মানে, আমরা বিজ্ঞাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিকাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।'

কালান্তর

এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন ভৈধতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া ।

বিষয়েষু প্রজুষ্ঠানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥

বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিতৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিস্ময়রূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন: অবিদ্যা মৃত্যুঃ তীর্থা বিদ্যামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্য-পাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিম-মহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ের জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খস্টা কোদাল নিয়ে এমনি ক'রে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুর্ত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর দ্বারা শুষ্ক তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি।

শিকার মিলন

বস্তুবিশেষে সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতন্ত্রকে যে না জানে সেই বন্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিশ্বরাজ্যে আমরা যে বাহু বন্ধন করনা করি সেও যারা; এই যারা থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিম-মহাদেশ বাহুবিশেষে যারামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা কুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্তের মূল ধুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে যা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে বাহুবন্ধে রক্ষা করবার চেষ্টা। আর, পূর্বমহাদেশ অস্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিন্তা যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উত্তমই বার্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোত্তরং সহ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীক্ষ্ণা বিদ্যায়া মৃতমন্তে ॥

যং বিদ্বৎ অগত্যাং অগং, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই; ঈশাবাস্তমিদং সৎ, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উত্তরকে মেলাবার কথা যখন কবি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্তপীড়িত, সে নির্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্লান্ত, সে নিরানন্দ

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পেরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সম্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে

কালান্দুর

স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমস্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাভাব্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর যুরোপ যখন শান্তির জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাভাব্য দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নব্যযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাভাব্য উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নব্যযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্তেই তাদের স্বাভাব্য সাধনা করতে হবে; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্তরে আপনার মতো জেনেছে, ন ততো বিজুগুপসতে, তারাই প্রকাশ পেয়েছে— এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়'তেই দেখি, মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যত্নবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে ফুটল; অমনি মানুষের

শিকার মিলন

সত্যের সমস্তা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি বাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে ? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্ভোগ। সেই মহাদুর্ভোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহুশক্তি হু-হু ক'রে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারী ড্রাইভারটা 'আরে আরে, হাঁ হাঁ' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে, কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, 'সাবাস, একেই তো বলে উন্নতি !' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ, যারা ধীরমন গমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা, যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থা বিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষয় বেদনার সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত হুঃখেও হুঃখের প্রতিকার হয় না কেন ? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডীর বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডীর পূজা ধরে ; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে ; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে ; কিন্তু স্ত্রাশনালিজম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডীদেবতার পূজার অঙ্কঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যত দিন বিদেশী বলি ভুঁটত তত দিন কোনো

কালান্তর

কথা ছিল না ; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার অন্তে স্বয়ং
যজ্ঞমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে
সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, 'একেই কি বলে ইষ্টদেবতা ? এ যে ঘর পর
কিছুই বিচার করে না।' এ যখন এক দিন পূর্বদেশের অন্ধ-প্রত্যঙ্গের
কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্টু যথা ইক্কু
খায়, ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল,
সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের
কেউ কেউ ভাবছে, 'এর পুজো আমাদের বংশে সইবে না।' বুদ্ধ যখন
পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ
মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে
সন্ধিপত্রের মুখোষ প'রে। কিফিক্যাকাওে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে
বিখব্রক্যাওে আঁংকে উঠেছিল আজ লঙ্কাকাওের গোড়ায় দেখি, সেই
লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ শুড়ানো
চলেছে। বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারও
ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত
হয়ে বলছেন যে, যে ছর্ব্বু কি থেকে ছর্ব্বটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও
তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই ছর্ব্বুছিরই নাম ন্যাশনালিজম,
দেশের সর্বজনীন আত্মশ্রুতি। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উন্টো
দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু, জাতিতে জাতিতে
আজ একত্র হয়েছে, এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত
বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন
সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো ক'রে দিতে পারে
না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপুটাকে
এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যুতের ডিপ্লমাসিতে বারে
বারে সে কুককেত্র বাধিয়ে দেবে।

শিক্ষার মিলন

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডী-দেবতার দ্বারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিত্তর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মশ্রুতির চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মনি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে; সেইজন্মে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাভাভ্যের ডিমে তা দেবার ইনকুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্তর্দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সে দিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মশ্রুতির কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের গিনি মানা।

স্বাভাভ্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা, কালকের দিনের ইতিহাস সর্বজাতিক সহযোগিতার অধায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু, যে-সকল চিন্তার অভ্যাগ ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামীকালের জন্মে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে, এক দিন আমার দেশে সাধকেরা যে যন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার যন্ত্র। তখনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্ণের মধ্যে যোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল তার জন্মে আমাদের আজ এমন নিদাক্ষণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে

কালান্তর

তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক ।’

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आश्चर्यात्तद् विजानतः ।

तत्र को! मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ বাকুল হয়ে বলছে, ‘শান্তি চাই ।’ এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য । এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমঐতম্ । ঐতমই শান্ত, কেননা ঐতমই শিব । স্বদেশের গৌরব-বুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনার সন্নিবেশ ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে আগতে শুরু করেছে, আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রভাবেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তার অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি । যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সর্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় ঐতম, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই ? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথমপ্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না ?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্বানিকেতন পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অস্তরের কামনা । বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না । সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই । যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার ক্লমতা, সে দীনাত্মা । শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অত্যাধিকার করে সে ধন্য হবে । শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা ।

শিক্ষার মিলন

দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি, আতিথ্য করে না ব'লে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্মেই বিশ্বের আতিথ্য করে না ব'লে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিক্ষারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারও নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের ঘারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্সমুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই অর্ধসভ্যতার দণ্ড করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাস্তুর কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল বিকারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্য-সাধনার অতিবিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অস্তুরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে—কোনো সুবিধার জন্তে নয়, সম্মানের জন্তে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্তে। মানুষের সেই প্রকাশভঙ্গিটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে

কালান্তর

হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব—
নবযুগের উদ্বোধন করে আমরা জরায়ুক্ত হব । আমাদের শিক্ষালয়ের
সেই শিক্ষামন্ত্রটি এই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মগোবাহুপশ্ৰুতি ।

সর্বভূতেষু চাখ্যানং ন ততো বিজুগুপসতে ॥

ভাদ্র ১৩২৮

সত্যের আস্থান

পরাসক্ত কীট বা অন্ধ পরের রস রক্ত শোষণ করে বাঁচে, খাণ্ডকে নিজের শক্তিতে নিজ দেহের উপকরণে পরিণত করবার দেহবন্ধ তাদের বিকল হয়ে যায় ; এমনি করে শক্তিকে অলস করবার পাপে প্রাণিলোকে এই-সকল জীবের অধঃপতন ঘটে । মানুষের ইতিহাসেও এই কথা খাটে । কিন্তু পরাসক্ত মানুষ বলতে কেবল যে পরের প্রতি অড়ভাবে আসক্ত মানুষকেই বোঝায় তা নয় । চিরদিন যা চলে আসছে তার সঙ্গে যে আপনাকে জুড়ে রেখে দেয়, প্রচলিতের শ্রোতের টানে যে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, সেও পরাসক্ত । কেননা বাহির আমাদের অন্তরের পক্ষে পর ; সে যখন কেবল অভ্যাসের তাগিদে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায় তখন আমাদের পরাসক্ত অন্তর নিরুচ্চম হয়ে ওঠে এবং মানুষের 'পরে অসাধাসাধন করবার যে তার আছে সে সিদ্ধ হয় না ।

এই হিসাবে অন্ধরা এ অগতে পরাসক্ত । তারা প্রচলিতের ধারায় গা-ভাগান দিবে চলে । তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের শাসনে বাঁচে মরে, এগায় বা পিছায় । এইজন্মেই তাদের অন্ধঃকরণটা বাড়তে পারল না, বেঁটে হয়ে রইল । লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে মৌমাছি যে চাক তৈরি করে আসছে সেই চাক তৈরি করার একটানা ঝোক কিছুতেই সে কাটিয়ে বেঁচে পারছে না । এতে ক'রে তাদের চাক নিখুঁত-মতো তৈরি হচ্ছে ; কিন্তু তাদের অন্ধঃকরণ এই চিরাত্যাসের গভীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছে, সে আপনাকে নানা দিকে মেলে দিতে পারছে না । এই-সকল জীবের সম্বন্ধে প্রকৃতির যেন সাহসের অভাব দেখতে পাই । সে এদের নিজের আঁচলে ঢেকে চালায় ; পাছে নিজে চলতে গেলে বিপদ বাধিয়ে বসে এই ভয়ে এদের অন্তরের চলশক্তিকে হেঁটে রেখে দিয়েছে ।

কালান্তর

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার জীবরচনা-পরীক্ষায় মানুষের সম্বন্ধে হঠাৎ খুব একটা সাহস দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তার অস্ত্র:করণটাকে বাধা দিলেন না। বাহিরে প্রাণীটিকে সর্বপ্রকারে বিবস্ত্র নিরস্ত্র দুর্বল করে এর অস্ত্র:করণকে ছেড়ে দেওয়া হল। এই মুক্তি পাওয়ার আনন্দে সে বলে উঠল, 'আমি অসাধ্য সাধন করব।' অর্থাৎ, 'যা চিরদিন হয়ে আসছে তাই যে চিরদিন হতে থাকবে সে আমি সহিব না, যা হয় না তাও হবে।' সেইজন্মে মানুষ তার প্রথম যুগে যখন চার দিকে অতিকায় জন্তুদের বিকট নখদন্তের মাঝখানে পড়ে গেল তখন সে হরিণের মতো পালাতে চাইল না, কচ্ছপের মতো লুকোতে চাইল না, সে অসাধ্যসাধন করলে— চকমকি পাথর কেটে কেটে ভীষণতর নখদন্তের সৃষ্টি করলে। যেহেতু জন্তুদের নখদন্ত তাদের বাহিরের দান, এইজন্মে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'পরেই এই নখদন্তের পরিবর্তন বা উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের নখদন্ত তার অস্ত্র:করণের সৃষ্টি; এইজন্মে সেই পাথরের বর্শাফলকের 'পরেই সে ভর করে রইল না, তার সমস্ত হাতিয়ার পাথরের কোঠা থেকে লোহার কোঠায় এসে পৌঁছল। এতে প্রমাণ হয়, মানুষের অস্ত্র:করণ সন্ধান করেছে; যা তার চারি দিকে আছে তাতেই সে আসক্ত হয়ে নেই, যা তার হাতের কাছে নেই তাকে হাতের তলার আনছে। পাথর আছে তার সামনে, তাতে সে সঙ্কট নয়; লোহা আছে মাটির নীচে, সেখানে গিয়ে সে ধাক্কা দেয়। পাথরকে ঘষে-মেছে তার থেকে হাতিয়ার তৈরি করা সহজ; কিন্তু তাতেও তার মন উঠল না, লোহাকে আগুনে গলিয়ে, হাতুড়িতে পিটিয়ে, ছাঁচে ঢালাই করে যা সব চেয়ে বাধা দেয় তাকেই আপনার সব চেয়ে অমুগত করে তুললে। মানুষের অস্ত্র:করণের ধর্মই হচ্ছে এই, আপনাকে খাটিয়ে কেবল যে তার সফলতা তা নয়, তার আনন্দ; সে কেবলই উপরিতল থেকে গভীরতলে পৌঁছতে চায়, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ, সহজ থেকে কঠিনে, পরাসক্তি থেকে

সত্যের আহ্বান

আত্মকর্তৃত্বে, প্রযুক্তির তাড়না থেকে বিচারের ব্যবস্থায়। এমনি করে সে জয়ী হয়েছে। কিন্তু কোনো এক দল মানুষ যদি বলে 'এই পাথরের ফলা আমাদের বাপ-পিতামহের ফলা, এ ছাড়া আর যা কিছু করতে বাব তাতে আমাদের জাত নষ্ট হবে', তা হলে একেবারে তাদের মনুষ্যত্বের মূলে ঘা লাগে; তা হলে যাকে তারা জাতরক্ষা বলে তা হতে পারে, কিন্তু তাদের সব চেয়ে যে বড়ো জাত মনুষ্যজাত সেইখানে তাদের কৌলীন্ড মারা যায়। আজও যারা সেই পাথরের ফলার বেশি এগোয় নি মানুষ তাদের জাতে ঠেলেছে, তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তারা বহিরবস্থার কাছে পরাসক্ত, তারা প্রচলিতের দিন-লাগামের টানে চোখে ঠুলি লাগিয়ে চলে; তারা অস্তরের স্বরাজ পায় নি, বাহিরের স্বরাজের অধিকার থেকে তাই তারা ভ্রষ্ট। এ কথা তারা জানেই না যে, মানুষকে আপনার শক্তিতে অসাধ্যসাধন করতে হবে; যা হয়েছে তার মধ্যে সে বন্ধ থাকবে না, যা হয় নি তার দিকে সে এগোবে— তাল চুকে বুক ফুলিয়ে নয়, অস্তঃকরণের সাধনার বলে, আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে।

আজ ত্রিশ বৎসর হয়ে গেল, যখন 'সাধনা' কাগজে আমি লিখছিলাম তখন আমার দেশের লোককে এই কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। তখন ইংরেজি-শেখা ভারতবর্ষ পরের কাছে অধিকার-ভিকার কাজে বিষম ব্যস্ত ছিল। তখন বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে, মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অস্তরের জীব, অস্তরেই সে কর্তা; বাহিরের লাতে অস্তরে লোকসান ঘটে। আমি বলেছিলাম, অধিকারবঞ্চিত হবার চুঃখভার আমাদের পক্ষে তেমন বোঝা নয় যেমন বোঝা আমাদের মাথার উপরে 'আবেদন আর নিবেদনের খালা'। তার পরে যখন আমার হাতে 'বঙ্গদর্শন' এসেছিল

কালান্তর

তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উত্তলা । মনের কোণে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন ক'রে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল । বেহেতু ইংরেজ-সরকারের 'পরে' অভিমান ছিল এই বঙ্গবর্জনের মূলে, সেইজন্মে সেই দিন এই কথা বলতে হয়েছিল 'এহ বাহ' । এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ্য ; এর মুখ্য উদ্দেশ্যনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ । সে দিন দেশের লোককে এই কথা বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা । এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া । মায়াকে তত ক্ষণ অত্যন্ত বড়ো দেখায় যত ক্ষণ, রাগেই হোক বা অমুরাগেই হোক, বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকিয়ে থাকি । তেড়ে গিয়ে তার পায়ে দাঁত বসিয়ে দেওয়া সেও একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে তার পা জড়িয়ে ধরা সেও তথৈবচ ; তাকে চাই নে বললেও তার ধ্যানে আমাদের সমস্ত হৃদয় রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আর চাই বললে তো কথাই নেই । মায়া জিনিসটা অন্ধকারের মতো ; বাইরের দিক থেকে কলের গাড়ি চালিয়েও তাকে অতিক্রম করতে পারি নে, তাকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে চাইলে সাত' সমুদ্র তেরো নদী শুকিয়ে যাবে । সত্য আলোর মতো, তার শিখাটা জলবা মাত্র দেখা যায়, মায়া নেই । এইজন্মেই শাস্ত্র বলেছেন,—

স্বপ্নমপ্যস্ত ধর্মস্ত জায়তে মহতো ভয়াৎ ।

ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা, তাকে না'এর দিক থেকে নিকেশ করা যায় না ; উপস্থিতমতো তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আর-একটা কারণরূপে সে জন্ম নেয় । ধর্ম হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকতা ; তার অগ্নিমাত্র আবির্ভাবে হাঁ প্রকাণ্ড না'কে একেবারে মূলে

সত্যের আহ্বান

গিরে অভিস্কৃত করে। ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুক্রমী; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশে লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরভ্রমতাকে ধর্মবর্ষণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হরণ করে তুলবে। কিন্তু, আমার দেশ আছে এইটি হল সত্য; এইটিকে পাওয়ার দ্বারা বাহিরের মায়া আপনি নিরস্ত হয়।

আমার দেশ আছে, এই আশ্চর্যকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু, যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলাম যে, 'আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।' বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিন্তার সৃষ্টি, এইজন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি, আত্মার প্রকাশ।

যে দেশে জন্মেছি কী উপায়ে সেই দেশকে সম্পূর্ণ আমার আপন করে তুলতে হবে, বহু কাল পূর্বে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেই আলোচনাতে যে-কোনো ক্রটি থাকুক, এই কথাটি জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে 'যে, দেশকে জয় করে নিতে

কালান্তর

হবে পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈকর্য্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে দেশের যে-কোনো উন্নতি-সাধনের জন্তে যে উপলক্ষে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষেই আমাদের নৈকর্য্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র। কারণ, ইংরেজ-রাজসরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়; এইজন্ত বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে আমরা হারাই, অর্থাৎ আত্মার মূল্যে সফলতা পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ।

আত্মনস্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি ॥

দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এইজন্তই দেশ আমার প্রিয়—এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।

আমি সেদিন দেশকে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ-কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা কটু শোনায়। কিন্তু, আর-কারণে মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে, আমার এই-সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্ত এবং শিষ্টশাস্ত্র ব্যক্তিরাত্ত আমায় সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন নি। এর দুটি মাত্র কারণ—প্রথম ক্রোধ, দ্বিতীয় লোভ। ক্রোধের তৃপ্তি-সাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাৎলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাবায় আমাদের কোনো আক্র

সত্যের আহ্বান

রাখছি নে। এই-সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন আপানি আমাকে এক দিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সহুপায় নয়।' তার জবাবে সেই আপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মস্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না। যাই হোক, সে দিন ঠিক যে সময়ে বাঙালি কিছু কালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভোগে বিশেষ বিমগ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাঙ্গন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরো একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব— হাত-ঝোড়-করা তিকের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো তিকের দ্বারা পাব, এই কন্দির আনন্দে সে দিন দেশ যেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale, সে দিন যেন ভাগ্যের হাতে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেই রকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবা মাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা, সে দিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল, ধ্যান ছিল ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, 'আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টু'টিতে, আর-এক হাত তার পায়ে।' অর্থাৎ কোনো হাতই

কালান্তর

বাকি ছিল না দেশের জন্ত। তৎকালে এবং তার পরবর্তীকালে এই বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে, আর এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার হাঁই বল আর না'ই বল, দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

সে দিন চারি দিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়বেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়বেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে— সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অস্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অস্তঃকরণকে সে দিন তাগানো হল না, সেইজন্তে এত বড়ো একটা হৃদয়বেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়বেগ, আর-এক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অস্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করে নি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্তে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়বেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাহুমন্ত্র-আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অস্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

অস্তঃকরণের জড়তায় যে ক্ষতি সে ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ

সত্যের আহ্বান

করা যায় না। কোনোমতে বখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অন্ধের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুহব গুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না, এ কথা খুব জোরের সঙ্গে সে মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অধচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্তে তার উত্তম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে বখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে। সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চীৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বাস্ত করা হল।

সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে এক দল যুবক রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্দেশ্যে উদ্ভোগ করেছিলেন। আর যাই হোক, এই প্রলয়হতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন, এইজন্তে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্ত। তাঁদের নিষ্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জল। তাঁরা পরম ত্যাগে, পরম দুঃখে আজ একটা কথা স্পষ্ট জেনেছেন যে, রাষ্ট্র বখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্র-বিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা; পথের চেয়ে অপথ মাপে ছোটো, কিন্তু সেটাকে অমুসরণ করতে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না, মাঝের থেকে পাছটাকে কাটার কাটার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়। যে জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে পারলে দাম তো যায়ই, জিনিসও জোটে না। সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক যুবকেরা ভেবে-ছিলেন, সমস্ত দেশের হয়ে তাঁরা কয়জন আত্মোৎসর্গ দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন; তাঁদের পক্ষে এটা সর্বনাশ, কিন্তু দেশের পক্ষে এটা সস্তা। সমস্ত দেশের অস্তঃকরণ থেকে সমস্ত দেশের উদ্ধার জেগে ওঠে, তার

কালান্তর

কোনো একটা অংশ থেকে নয়। রেলযানে ফার্স্ট ক্লাস গাড়ির মূল্য এবং সৌষ্ঠব যেমনি থাক, সে তার নিজের সঙ্গে সংযুক্ত থার্ড ক্লাস গাড়িকে কোনোমতেই এগিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হয় তাঁরা আজ বুঝেছেন, সমগ্র দেশ ব'লে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকের সৃষ্টি; এই সৃষ্টি তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। এ হচ্ছে যোগলব্ধ ধন, অর্থাৎ যে যোগের দ্বারা মানুষের সকল বৃত্তি আপন সৃষ্টির মধ্যে সংহত হয়ে রূপলাভ করে। পোলিটিকাল যোগ বা ইকনমিক যোগ পূর্ণ যোগ নয়, সর্বশক্তির যোগ চাই। অন্য দেশের ইতিহাস যখন লক্ষ্য করে দেখি তখন পোলিটিকাল ঘোড়াটাকে সকলের আগে দেখি, মনে মনে ঠিক করি ঐ চতুষ্পদটারই টানে সমস্ত জাত এগিয়ে চলেছে। তখন হিসাব করে দেখি নে— এর পিছনে দেশ বলে যে গাড়িটা আছে সেটা চলবার যোগ্য গাড়ি, তার এক চাকার সঙ্গে আর-এক চাকার সামঞ্জস্য আছে, তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের ভালোরকম জোড় মেলানো আছে। এই গাড়িটি তৈরি করে তুলতে শুধু আগুন এবং হাতুড়ি-করাত এবং কলকন্ডা লেগেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেক দিনের অনেক লোকের অনেক চিন্তা, অনেক সাধনা, অনেক ত্যাগ আছে। আরো এমন দেশ আমরা দেখেছি, সে বাহ্যত স্বাধীন কিন্তু পোলিটিকাল বাহনটি যখন তাকে টানতে থাকে তখন তার ঝড় ঝড় খড়খড় শব্দে পাড়ার ঘুম ছুটে যায়, কাঁকানির চোটে সওয়ারির বুকে পিঠে খিল ধরতে থাকে, পথ চলতে চলতে দশবার করে সে ভেঙে ভেঙে পড়ে, দড়িদড়া দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে দিন কাবার হয়ে যায়। তবু ভালো হোক আর মন্দ হোক, ক্রু আলাগা হোক আর চাকা বাঁকা হোক, এ গাড়িও গাড়ি। কিন্তু যে জিনিসটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতার ভয়া, তাকে উপস্থিতমতো ক্রোধ হোক বা লোভ হোক

সত্যের আহ্বান

কোনো-একটা প্রবৃত্তির বাহু বন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছু ক্ষণের অন্তে তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশদেবতার রথ-যাত্রা বলে ? এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেকসই জিনিস ? অতএব ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আপাতত এই গড়াপেটার কাজটাই কি সব চেয়ে দরকার নয় ? যমের কাঁসি-বিভাগের সিংহদ্বার থেকে বাংলা-দেশের যে-সব যুবক ঘরে ফিরে এসেছেন তাঁদের লেখা প'ড়ে, কথা শুনে আমার মনে হয় তাঁরা এই কথাই ভাবছেন। তাঁরা বলছেন, সকলের আগে আমাদের যোগসাধন চাই, দেশের সমস্ত চিন্তবৃত্তির সম্মিলন ও পরিপূর্ণতা-সাধনের যোগ। বাইরের দিক থেকে কোনো অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা এ হতেই পারে না, ভিতরের দিক থেকে জ্ঞানালোকিত চিন্তে আত্মোপলব্ধি দ্বারাই এ সম্ভব। যা-কিছুতে সমস্ত দেশের অস্তঃকরণ উদ্‌বোধিত হয় না, অভিতূত হয়, এ কাজের পক্ষে তা অস্তরায়।

নিজের সৃষ্টিশক্তির দ্বারা দেশকে নিজের করে তোলবার যে আহ্বান সে খুব একটা বড়ো আহ্বান। সে কোনো-একটা বাহু অনুষ্ঠানের অন্তে তাগিদ দেওয়া নয়। কারণ, পূর্বেই বলেছি, মানুষ তো মৌমাছির মতো কেবল একই মাপে মৌচাক গড়ে না, মাকড়সার মতো নিরন্তর একই প্যাটার্নে জাল বোনে না ; তার সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি হচ্ছে তার অস্তঃকরণে— সেই অস্তঃকরণের কাছে তার পুরো দাবি, জড় অভ্যাগ-পরতার কাছে নয়। যদি কোনো লোভে পড়ে তাকে আজ বলি 'তুমি চিন্তা কোরো না, কর্ম করো', তা হলে যে-মোহে আমাদের দেশ মরেছে সেই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। এত কাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে, মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে, অলস হয়ে বসে আছি। বলেছি, 'আমরা সমুদ্রপারে যাব না, কেননা মনুতে তার নিষেধ ; মুসলমানের পাশে বসে খাব না, কেননা শাস্ত্র তার বিরোধী।' অর্থাৎ, যে প্রণালীতে চললে

কালান্তর

মানুষের মন ব'লে জিনিসের কোনোই দরকার হয় না, যা কেবলমাত্র চিন্তাহীন অভ্যাগনিষ্ঠতার কাজ, আমাদের সংসারযাত্রার পনেরো আনা কাজই সেই প্রণালীতে চালিত। যে মানুষ সকল বিষয়েই দাসের প্রতি নির্ভর করে চলে তার যে রকম পজুতা, যারা বাহু আচারের দ্বারাই নিয়ত চালিত তাদেরও সেই রকম। কেননা পূর্বেই বলেছি, অস্তরের মানুষই প্রভু, সে যখন একান্তভাবে বাহু প্রথার পরাসক্ত জীব হয়ে ওঠে তখন তার দুর্গতির সীমা থাকে না। আচারে-চালিত মানুষ কলের পুতুল, বাধ্যতার চরম সাধনায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে। পরতন্ত্রতার কারখানা-ঘরে সে তৈরি; এইজন্তে এক চালকের হাত থেকে তাকে নিষ্কৃতি দিতে গেলে আর-এক চালকের হাতে তাকে সমর্পণ করতে হয়। পদার্থ-বিদ্যায় যাকে ইনর্শিয়া বলে, যে মানুষ তারই একান্ত সাধনাকে পবিত্রতা ব'লে অভিমান করে তার স্বাবরতাও যেমন অঙ্গমতাও তেমন, উত্তরেই তার নিজের কর্তৃত্ব নেই। অস্তঃকরণের যে জড়ত্ব সর্বপ্রকার দাসত্বের কারণ, তার থেকে মুক্তি দেবার উপায় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বাধ্যতাও নয়, কলের পুতুলের মতো বাহ্যান্তরানও নয়।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরো অনেক বড়ো; সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। বহু দিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাস্প-রচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক. গ্লাড্‌স্টোন ম্যাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে— তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ

সত্যের আহ্বান

একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে? আত্মীয় মধ্যে যে শক্তির ভাণ্ডার আছে তা খুলে যায় সত্যের স্পর্শমাত্র। সত্যকার প্রেম ভারতবাসীর বহু দিনের ক্লান্ত হারে যে-মুহুর্তে এসে দাঁড়ালো অমনি তা খুলে গেল। কারও মনে আর কার্পণ্য রইল না, অর্থাৎ সত্যের স্পর্শে সত্য জেগে উঠল। চাতুরি দ্বারা যে রাষ্ট্রনীতি চালিত হয় সে নীতি বন্ধা, অনেক দিন থেকে এই শিকার আমাদের দরকার ছিল। সত্যের যে কী শক্তি, মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি; কিন্তু চাতুরি হচ্ছে ভীক ও ছর্ব্বলের সহজ ধর্ম, সেটাকে ছিন্ন করতে হলে তার চামড়া কেটে ছিন্ন করতে হয়। সেইজন্যে আজকের দিনেও দেশের অনেক বিস্তৃত লোকেই মহাত্মার চেষ্ঠাকেও নিজেদের পোলিটিকাল জুয়োখেলার একটা গোপন চালেরই সামিল করে নিতে চান। মিথ্যার জীর্ণ তাঁদের মন এই কথাটা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ে এই-যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে এটা একটা অবাস্তব বিষয় নয়— এইটেই যুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া; ইংরেজ দেশে আছে কি নেই এর মধ্যে সে কথার কোনো জায়গাই নেই। এই প্রেম হল স্বপ্রকাশ, এই হচ্ছে হাঁ; কোনো না'এর সঙ্গে এ তর্ক করতে যায় না, কেননা তর্ক করবার দরকারই থাকে না।

প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই-যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্‌বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিন্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, আমি

কালান্তর

একেই আমার দেশের মুক্তি বলি ; প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি । ভারতবর্ষে এক দিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল । রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সে দিনও ভারত বারে বারে এক হবার কণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু তার চিত্ত সৃষ্টি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল । এই মুক্তির জ্ঞান এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারে নি, সমুদ্রমরুপারেও যে দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটন করেছে । আজকের দিনের কোনো বণিক, কোনো সৈনিক এ কাজ করতে পারে নি ; তারা পৃথিবীকে যেখানেই স্পর্শ করেছে সেইখানেই বিরোধ পীড়া এবং অপমান জাগিয়েছে, সেইখানেই বিশ্বপ্রকৃতির শ্রী নষ্ট করে দিয়েছে । কেন ? কেননা লোভ সত্য নয়, প্রেমই সত্য । এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের দিক থেকে । কিন্তু লোভ যখন স্বাতন্ত্র্যের জন্তে চেষ্টা করে তখন সে জবর্দস্তির দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে । বঙ্গবিভাগের দিনে এইটে আমরা লক্ষ্য করেছি— সেদিন গরিবদের আমরা ত্যাগহুঃখ স্বীকার করতে বাধ্য করেছি প্রেমের দ্বারা নয়, বাইরে থেকে নানা প্রকারে চাপ দিয়ে । তার কারণ, লোভ অল্প সময়ের মধ্যে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ফললাভের চেষ্টা করে ; প্রেমের যে ফল সে এক দিনের নয়, অল্প দিনের অন্তঃনয়, সে ফলের সার্বিকতা আপনার মধ্যেই ।

এত দিন পরে আমার দেশে সেই আনন্দময় মুক্তির হাওয়া বইছে, এইটেই আমি কল্পনা করে এসেছিলুম । এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি । দেখছি, দেশের মনের উপর বিষম একটা চাপ ।

সত্যের আহ্বান

বাহিরে থেকে কিসের একটা তাড়নার সবাইকে এক কথা বলাতে, এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।

আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিঠৈবীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, 'আজ তুমি কিছু বোলো না।' দেশের হাওয়ার আজ প্রবল, একটা উৎপীড়ন আছে— সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর, সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন। বর্তমান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাদের মনে কিছুমাত্র সংশয় আছে তারা সেই সংশয় অতি ভয়ে ভয়ে, অতি সাবধানে প্রকাশ করলেও পরমুহূর্তেই তার বিকল্পে একটা শাসন ভিতরে ভিতরে উদ্ভূত হয়ে ওঠে। কোনো একটি ধবরের কাগজে এক দিন কাপড় পোড়ানোর সম্বন্ধে অতি মৃদুমন্দ মধুর কণ্ঠে একটুখানি আপত্তির আভাসমাত্র প্রকাশ পেয়েছিল; সম্পাদক বলেন, তার পরদিনই পাঠকমণ্ডলীর চাঞ্চল্য তাঁকে চঞ্চল করে তুললে। যে আগুনে কাপড় পুড়েছে সেই আগুনে তাঁর কাগজ পুড়তে কত ক্ষণ? দেখতে পাচ্ছি, এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আর-এক পক্ষের লোক অত্যন্ত ত্রস্ত। কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিস্তারকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মস্তকের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।

কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপূর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সম্ভব অতিচূর্ণত ধন অতি সম্ভাব্য পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অস্ত্র যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এই রকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয়

কালান্তর

কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের এক দল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্’ এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না। আরো মুশকিল এই যে, যে লাভের দাবি করা হচ্ছে তার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। ভয়ের কারণটা অস্পষ্ট হলে সে যেমন অতি ভয়ংকর হয়ে ওঠে, লাভের বিষয়টা অস্পষ্ট হলে তারও প্রবলতা বেড়ে যায়— কেননা তার মধ্যে কল্পনার কোনো বাধা থাকে না এবং প্রত্যেক লোকেই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো ক’রে গড়ে নিতে পারে। জিজ্ঞাসা দ্বারা তাকে চেপে ধরতে গেলে সে এক আড়াল থেকে আর-এক আড়ালে অতি সহজেই গা ঢাকা দেয়। এমনি করে এক দিকে লাভের লক্ষ্যটাকে অনির্দিষ্টতার দ্বারা অত্যন্ত বড়ো করে তোলা হয়েছে, অন্য দিকে তার প্রাপ্তির সাধনাকে সময়ে এবং উপায়ে অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তার পরে যখন তাকে বলা হয় ‘তোমার বুদ্ধিবিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাঁই করে, কেবল থাক তোমার বাধ্যতা’, তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো-একটা বাহ্যস্থানের দ্বারা অদূরবতী কোনো-একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে, এ কথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অস্ত্রের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্বৃত্ত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না? এই ভূতকেই ঝাড়বার জন্তে কি আমরা ওয়ার খোজ করি নে? কিন্তু, স্বয়ং ভূতই যদি ওখা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের আর সীমা রইল না।

মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে

সত্যের আহ্বান

আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ। চিরস্থান সত্যকে আমরা পুঁথিতে পড়ি, কথায় বলি, যে ক্ষণে তাকে আমরা সামনে দেখি সে আমাদের পুণ্যক্ষণ। বহু দিনে অকস্মাৎ আমাদের এই স্মৃষ্টিগ ঘটে। কনগ্রেস আমরা প্রতিদিন গড়তে পারি, প্রতিদিন ভাঙতে পারি, ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ইংরেজি ভাষায় পোলিটিকাল বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোও আমাদের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সত্যপ্রেমের যে সোনার কাঠিতে শত বৎসরের স্মৃষ্টি চিন্তা জেগে ওঠে সে তো আমাদের পাড়ার স্রাকরার দোকানে গড়াতে পারি নে। যার হাতে এই দুর্লভ জিনিস দেখলুম তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

কিন্তু, সত্যকে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা যদি দৃঢ় না হয় তা হলে ফল হল কী? প্রেমের সত্যকে প্রেমের দিকে যেমন মানি, বুদ্ধির সত্যকে বুদ্ধির দিকে তেমনি আমাদের মানতে হবে। কনগ্রেস প্রভৃতি কোনো রকম বাহ্যস্থানে দেশের হৃদয় জাগে নি, মহৎ অন্তরের অকৃত্রিম প্রেমের স্পর্শে জাগল। আন্তরিক সত্যের এই প্রস্তাব যখন আমরা আজ এমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তখন স্বরাজ্যলাভের বেগাতেই কি সেই সত্যকে আর আমরা বিশ্বাস করব না? উদ্‌বোধনের পালায় যাকে মানলুম, অন্তরানের পালায় তাকে বিসর্জন দিয়ে বসব?

মনে করো, আমি বীণার ওস্তাদ খুঁজছি। পূর্বে পশ্চিমে আমি নানা লোককে পরীক্ষা করে দেখলুম, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হল না। তারা শব্দ করে খুব, তারা কৌশল জানে বিস্তর, তারা রোজগার করে যথেষ্ট, কিন্তু তাদের বাহ্যচরিত্রে মনে প্রশংসা জাগে, প্রেম জাগে না। অবশেষে হঠাৎ একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনি তাঁর তারে ছুটি-চারটি মীড় লাগাবা মাত্র অন্তরের আনন্দ-উৎসের মুখে এত দিন যে পাথর চাপা ছিল সেটা যেন এক মুহূর্তে গেল গ'লে। এর কারণ কী? এই ওস্তাদের

কালান্তর

মনে যে আনন্দময়ী শক্তি আছে সে একটি সত্যকার জিনিস, সে আপন আনন্দশিখা থেকে অতি সহজেই হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দশিখাকে জালিয়ে তোলে। আমি বুঝে নিলুম, তাঁকে ওস্তাদ বলে মানলুম। তার পর আমার দরকার হল একটি বীণা তৈরি করানো। কিন্তু, এই বীণা-তৈরির বিস্তার যে সত্যের দরকার সে আর-এক জাতের সত্য। তার মধ্যে অনেক চিন্তা, অনেক শিক্ষা, অনেক বস্তুতত্ত্ব, অনেক মাপজোখ, অনেক অধ্যবসায়। সেখানে আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া ক'রে হঠাৎ ব'লে বলেন 'বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তার আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝংকার দাও, তা হলে অমুক মাসের অমুক তারিখে, এই কাঠিই বীণা হয়ে বাজতে থাকবে', তবে সে কথা খাটবে না। আসলে আমার গুরুর উচিত নয় আমার অক্ষমতার প্রতি দয়া করা। এ কথা তাঁর বলাই চাই, 'এ-সব জিনিস সংক্ষেপে এবং সস্তায় সারা যায় না।' তিনিই তো আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন যে, বীণার একটি মাত্র তার নয়, এর উপকরণ বিস্তার, এর রচনাপ্রণালী সূক্ষ্ম, নিয়মে একটুমাত্র ক্রটি হলে বেঙ্গুর বাজবে, অতএব জ্ঞানের তত্ত্বকে ও নিয়মকে বিচারপূর্বক সযত্নে পালন করতে হবে। দেশের হৃদয়ের গভীরতা থেকে সাড়া বের করা এই হল ওস্তাদের বীণা-বাজানো— এই বিস্তার প্রেম যে কত বড়ো সত্য জিনিস সেই কথাটা আমরা মহাত্মাজির কাছ থেকে বিস্তার করে শিখে নিতে বসেছি, এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকুক। কিন্তু, স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই। তাতে ধারা অর্ধশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের

সত্যের আহ্বান

অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উত্তমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিত্ত থাকে, কোনো গুচ বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীক এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়। এই-যে দেশের বিচিত্র শক্তিকে তলব দেওয়া এবং তাকে নিজের নিজের কাজে লাগানো, এ পারে কে? সকল ডাকে তো দেশ সাড়া দেয় না, পূর্বে তো বারবার তার পরীক্ষা হয়ে গেছে। দেশের সকল শক্তিকে দেশের সৃষ্টিকার্ষে আজ পর্যন্ত কেউ যোগযুক্ত করতে পারেন নি ব'লেই তো এত দিন আমাদের সময় বয়ে গেল। তাই এত কাল অপেক্ষা করে আছি, দেশের লোককে ডাক দেবার ধার সত্য অধিকার আছে তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে দেবেন। এক দিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ ।

এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা ॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না? কেন বলবেন না 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, তারা সকল দিক থেকে আসুক'? দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাস্বামির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সূতো কাটো, কাপড়

কালান্তর

বোনো।' এই ডাক কি সেই 'আয়ত্ত্ব সর্বতঃ স্বাহা' ? এই ডাক কি নবযুগের মহান্ধটির ডাক ? বিশ্বপ্রকৃতি যখন মৌমাছিকে মৌচাকের সংকীর্ণ জীবনযাত্রায় ডাক দিলেন তখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি সেই আছানে কর্মের সুবিধার জন্তে নিজেকে ক্লীব করে দিলে ; আপনাকে খর্ব করার দ্বারা এই-যে তাদের আত্মত্যাগ এতে তারা মুক্তির উন্টো পথে গেল। যে দেশের অধিকাংশ লোক কোনো প্রলোভনে বা অশুশাসনে অন্ধভাবে নিজের শক্তির ক্লীবত্ব সাধন করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের বন্দিদশা যে তাদের নিজের অস্তরের মধ্যেই। চরকা কাটা এক দিকে অত্যন্ত সহজ, সেইজন্তেই সকল মানুষের পক্ষে তা শক্ত। সহজের ডাক মানুষের নয়, সহজের ডাক মৌমাছির। মানুষের কাছে তার চূড়ান্ত শক্তির দাবি করলে তবেই সে আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করতে পারে। স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সংকীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি ; এথেন্স্ মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত ক'রে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে— তার সেই জয়পতাকা আজও মানব-সভ্যতার শিখরচূড়ায় উড়ছে। যুরোপে সৈনিকাবাসে কারখানাঘরে মানবশক্তির ক্লীবত্বসাধন করছে না কি ? লোভের বশে, উদ্দেশ্যসাধনের খাতিরে, মানুষের মনুষ্যত্বকে সংকীর্ণ করে ছেঁটে দিচ্ছে না কি ? আর এইজন্তেই কি যুরোপীয় সমাজে আজ নিরানন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠছে না ? বড়ো কলের দ্বারাও মানুষকে ছোটো করা যায়, ছোটো কলের দ্বারাও করা যায়। এঞ্জিনের দ্বারাও করা যায়, চরকার দ্বারাও। চরকা যেখানে স্বাভাবিক সেখানে সে কোনো উপদ্রব করে না, বরঞ্চ উপকার করে ; মানবমনের বৈচিত্র্যবশতই চরকা যেখানে স্বাভাবিক নয় সেখানে চরকার সূতা কাটার চেয়ে মন কাটা যায় অনেকখানি। মন জিনিসটা সূতার চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

সত্যের আহ্বান

একটি কথা উঠেছে এই যে, ভারতে শতকরা আশিজন লোক চাষ করে এবং তারা বছরে ছয় মাস বেকার থাকে, তাদের স্ত্রী কাটতে উৎসাহিত করবার জন্যে কিছু কাল সকল ভদ্রলোকেরই চরকা ধরা দরকার। প্রথম আবশ্যিক হচ্ছে যথোচিত উপায়ে তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এই কথাটি প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ, কী পরিমাণ চাষা কত দিন পরিমাণ বেকার থাকে। যখন চাষ বন্ধ তখন চাষারা কোনো উপায়ে যে পরিমাণ জীবিকা অর্জন করে, স্ত্রী কাটার দ্বারা তার চেয়ে বেশি অর্জন করবে কি না। চাষ ব্যতিরেকে জীবিকার একটিমাত্র উপায়ের দ্বারা সমস্ত কৃষাণকে বন্ধ করা দেশের কল্যাণের পক্ষে উচিত কি না, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা এই যে, কারও মুখের কথায় কোনো অনুমানমাত্রের উপর নির্ভর ক'রে আমরা সর্বজনীন কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারব না; আমরা বিশ্বাসযোগ্য প্রণালীতে তথ্যানুসন্ধান দাবি করি। তার পরে উপায়ের যথাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা সম্ভবপর।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিন্তাশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাই নে, কেবল অতি অল্প কালের জন্যে। কেনই বা অল্প কালের জন্যে? যেহেতু এই অল্প কালের মধ্যে এই উপায়ে আমরা স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রবচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুশক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে। এই স্বরাজসৃষ্টি কোনো দেশেই তো শেষ হয় নি; সকল দেশেই কোনো না কোনো অংশে লোভ বা মোহের প্ররোচনার বন্ধনদশা থেকে গেছে। কিন্তু, সেই বন্ধনদশার কারণ মানুষের চিন্তে। সে-সকল দেশে নিরন্তর এই চিন্তের উপর দাবি করা

কালান্তর

হচ্ছে। আমাদের দেশেও সেই চিন্তের বিকাশের উপরেই স্বরাজ দাঁড়াতে পারবে। তার জন্যে কোনো বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য ফল নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান চাই। দেশের চিন্তপ্রতিষ্ঠিত এই স্বরাজকে অল্পকাল কয়েক দিন চরকা কেটে আমরা পাব, এর যুক্তি কোথায়? যুক্তির পরিবর্তে উক্তি তো কোনোমতেই চলবে না। মানুষের মুখে যদি আমরা দৈববাণী শুনতে আরম্ভ করি, তা হলে আমাদের দেশে যে হাজার রকমের মারাত্মক উপসর্গ আছে এই দৈববাণী যে তারই মধ্যে অন্ততম এবং প্রবলতম হয়ে উঠবে। একবার যদি দেখা যায় যে, দৈববাণী ছাড়া আর-কিছুতেই আমাদের দেশ নড়ে না, তা হলে আশু প্রয়োজনের গরজে সকালে সকালে দৈববাণী বানাতে হবে, অল্প সকল রকম বাণীই নিরস্ত হয়ে যাবে। যেখানে যুক্তির অধিকার সেখানে উক্তি দিয়ে ষাদের ভোলাতে হবে, তাদের পক্ষে, যেখানে আত্মার অধিকার সেখানে কোনো না কোনো কর্তার আসন পড়বেই। তারা স্বরাজের গোড়া কেটে বসে আছে, আগায় জল ঢেলে কোনো ফল হবে না। এ কথা মানছি, আমাদের দেশে দৈববাণী, দৈব ঔষধ, বাহ্য ব্যাপারে দৈবক্রিয়া, এ-সবের প্রভাব খুবই বেশি; কিন্তু সেইজন্যেই আমাদের দেশে স্বরাজের ভিত্তিপত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেননা, আমার পূর্বের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিতৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারে, যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না। এই-যে আজ বহুভাবে লজ্জাকাতরা মাতৃভূমির প্রাক্ষণে রানীকৃত করে কাপড় গোড়ানো চলছে, কোন্ বাণীতে দেশের কাছে আজ তার তাগিদ আসছে? সে কি ঐ দৈববাণীতে নয়? কাপড় ব্যবহার বা বর্জন

সত্যের আহ্বান

ব্যাপারে অর্ধশাস্ত্রিক তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এ সম্বন্ধে সেই তত্ত্বের ভাষাতেই দেশের সঙ্গে কথা কইতে হবে; বুদ্ধির ভাষা মাত্র করা যদি বহু দিন থেকে দেশের অভ্যাসবিরুদ্ধ হয়, তবে আর-সব ছেড়ে দিয়ে ঐ অনভ্যাসের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। কেননা এই অনভ্যাসই আমাদের পক্ষে গোড়ায় গলদ, original sin। সেই গলদটারই খাতিরে, সেই গলদকেই প্রেরণ দিয়ে আজ ঘোষণা করা হয়েছে, ‘বিদেশী কাপড় অপবিত্র, অতএব তাকে দখল করো।’ অর্ধশাস্ত্রকে বহিষ্কৃত করে তার জায়গায় ধর্মশাস্ত্রকে জোর করে টেনে আনা হল। অপবিত্র কথাটা ধর্মশাস্ত্রের কথা, অর্ধের নিয়মের উপরের কথা। মিথ্যাকে বর্জন করতে হবে কেন, মিথ্যা অপবিত্র কেন, তার দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বা নষ্ট হয় ব’লেই যে তা নয়। হোক বা না হোক, তার দ্বারা আমাদের আত্মা মলিন হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে অর্ধশাস্ত্র বা রাষ্ট্রশাস্ত্রের কথা খাটে না, এখানে ধর্মশাস্ত্রেরই বাণী প্রবল। কিন্তু, কোনো কাপড় পরা বা না-পরার মধ্যে যদি কোনো ভুল থাকে তবে সেটা অর্ধতত্ত্বের বা স্বাভ্যতত্ত্বের বা সৌন্দর্য-তত্ত্বের ভুল, এটা ধর্মতত্ত্বের ভুল নয়। এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন, যে ভুলে দেহমনের দুঃখ আনয়ন করে সেইটাই অধর্ম। আমি তার উত্তরে এই বলি, ভুলমাত্রেরই দুঃখ আছে— জিরোমেট্রির ভুলে রাস্তা খারাপ হয়, ভিত্তি বাঁকা হয়, সাঁকো-নির্মাণে এমন গলদ ঘটে যে তার উপর রেলগাড়ি চললে ভয়ংকর দুর্ঘটনা অবশ্যস্বাবী। কিন্তু, এই ভুলের সংশোধন ধর্মশাস্ত্রের মতে হয় না। অর্থাৎ, ছেলেরা যে খাতায় জিরোমেট্রির ভুল করে, অপবিত্র ব’লে সেই খাতা নষ্ট করে এ ভুলের সংশোধন হয় না; জিরোমেট্রিরই সত্য নিয়মে সেই খাতাকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাস্টারমশায়ের মনে এ কথা উঠতে পারে যে, ভুলের খাতাকে অপবিত্র যদি না বলি তা হলে এরা

কালান্তর

ভুলকে ভুল বলে গণ্য করবে না। তা যদি সত্য হয়, তা হলে অল্প-সব কাজ ছেড়ে সকল প্রকার উপায়ে এই চিন্তাগত দোষকে সংশোধন করতে হবে, তবেই এ ছেলেরা মানুষ হতে পারবে। কাপড় পোড়ানোর হুকুম আজ আমাদের 'পরে এসেছে। সেই হুকুমকে হুকুম ব'লে আমি মানতে পারব না; তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, চোখ বুজে হুকুম মানার বিষয় বিপত্তি থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের লড়তে হবে— এক হুকুম থেকে আর-এক হুকুমে তাকে ঘুরিয়ে হুকুম-সমুদ্রের সাত ঘাটে তাকে জল খাইয়ে মারতে পারব না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছে সে আমার কাপড় নয়, বস্তুত দেশবাসীদের মধ্যে যাদের আজ কাপড় নেই এ কাপড় তাদেরই। ও কাপড় আমি পোড়াবার কে? যদি তারা বলে 'পোড়াও', তা হলে অন্তত আত্মঘাতীর 'পরেই আত্মহত্যার ভার দেওয়া হয়, তাকে বধ করবার ভার আমাদের উপর পড়ে না। 'যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে আর যাকে জোর করে ত্যাগহুঃখ ভোগ করাচ্ছি কাপড়ের অভাবে সে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবর্দস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না। বার বার বলেছি, আবার বলব, বাহু ফলের লোভে আমরা মনকে খোয়াতে পারব না। যে কলের দৌরাহ্মে সমস্ত পৃথিবী পীড়িত মহাআজি সেই কলের সঙ্গে লড়াই করতে চান, এখানে আমরা তাঁর দলে। কিন্তু, যে মোহমুগ্ধ মন্ত্রমুগ্ধ অন্ধ বাধ্যতা আমাদের দেশের সকল দৈন্ত ও অপমানের মূলে, তাকে সহায় করে এ লড়াই করতে পারব না। কেননা তারই সঙ্গে আমাদের প্রধান লড়াই, তাকে তাড়াতে পারলে তবেই আমরা অন্তরে বাহিরে স্বরাজ্য পাব।

কাপড় পোড়াতে আমি রাজি আছি, কিন্তু কোনো উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ

সত্যের আহ্বান

সংগ্রহ করুন এবং স্মৃষ্টি দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিন যে, কাপড় পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে। বিনা প্রমাণে বিনা যুক্তিতে কেমন করে নিশ্চিত বলব যে, বিশেষ একটা কাপড় পরে আমরা আর্থিক যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরো বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্জেস্টারের কাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরো কঠিন হয়ে উঠবে না? এ তর্ক আমি বিশেষজ্ঞভাবে উত্থাপিত করছি নে, কেননা আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি জিজ্ঞাসুভাবেই করছি। বিশেষজ্ঞ যা বলেন তাই যে বেদবাক্য আমি তা বলি নে। কিন্তু স্মৃষ্টি এই যে, বেদবাক্যের ছন্দে তাঁরা কথা বলেন না। প্রকাশ্য সভায় তাঁরা আমাদের বুদ্ধিকে আহ্বান করেন।

একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই— ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তুর্ধ্বনিতে আজ যুগান্তের দ্বার খুলেছে। মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তী কাল হচ্ছে অজ্ঞাতবাসের কাল। কিছু কাল থেকে পৃথিবীতে মানুষ যে পরস্পর বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে সে কথাটা স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত ছিল। অর্থাৎ, ঘটনাটা বাইরে ছিল, আমাদের মনে প্রবেশ করে নি। যুদ্ধের আঘাতে এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যখন বিচলিত হয়ে উঠল, তখন এই কথাটা আর লুকোনো রইল না। হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং কণিক নয়— এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর-এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যত ক্ষণ না ঘটবে তত ক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে-কোনো জাত নিজের

কালান্তর

দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র ক'রে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শাস্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের অন্তে যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিন্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা। কিছু দিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভারত-রাষ্ট্রশাসনে একটা মূলনীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে ভারতরাষ্ট্রসম্রাজ্যকে বিশ্বসম্রাজ্যের অন্তর্গত করে দেখবার চেষ্টা। যুদ্ধ আমাদের মনের সামনে থেকে একটা পর্দা ছিঁড়ে দিয়েছে— যা বিশ্বের স্বার্থ নয় তা যে আমাদের নিজের স্বার্থের বিরোধী এই কথাকে মানুষ, পুঁথির পাতায় নয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজ দেখতে পাচ্ছে; এবং সে বুঝছে, যেখানে অন্তায় আছে সেখানে বাহ্য অধিকার থাকলেও সত্য অধিকার থাকে না। বাহ্য অধিকারকে খর্ব ক'রেও যদি সত্য অধিকার পাওয়া যায় তবে সেটাতে লাভ ছাড়া লোকমান নেই। মানুষের মধ্যে এই-যে একটা বুদ্ধির বিরাট পরিবর্তন ঘটছে, তার চিন্ত সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে যাচ্ছে, তারই হাত এই ভারতরাষ্ট্রনীতি-পরিবর্তনের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা ও প্রভূত বাধা আছে— স্বার্থবুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে পদে পদে আক্রমণ করবেই— তাই ব'লে এ কথা মনে করা অন্তায় যে, এই শুভবুদ্ধিই সম্পূর্ণ কপটতা এবং স্বার্থবুদ্ধিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আমার এই ষাট বৎসরের অভিজ্ঞতায় একটি কথা জেনেছি যে, কপটতার মতো দুঃসাধ্য অতএব দুর্লভ জিনিস আর নেই। খাঁটি কপট মানুষ হচ্ছে কণ্ঠন্যা লোক, অতি অকন্যাং তার আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা, সকল মানুষের মধ্যেই কম বেশি পরিমাণে চারিত্র্যের বৈধ আছে। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে লজিকের যে কল পাতা তাতে ছুই বিরোধী পদার্থকে ধরানো কঠিন ব'লেই ভালোর সঙ্গে যখন মনকে দেখি তখন তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিই, এর মধ্যে

সত্যের আহ্বান

ভালোটাই চাতুরি। আজকের দিনে পৃথিবীতে সর্বজনীন যে-সকল প্রচেষ্টা চলছে তার মধ্যে পদে পদে মানুষের এই চারিত্র্যের বৈধ দেখা যাবে। সে অবস্থায় তাকে যদি তার অতীতযুগের দিক থেকে বিচার করি তা হলে তার স্বার্থবুদ্ধিকে মনে করব খাঁটি ; কারণ, তার অতীতের নীতি ছিল ভেদবুদ্ধির নীতি। কিন্তু তাকে যদি আমাদের আগামীকালের দিক থেকে বিচার করি তা হলে বুঝব শুভবুদ্ধিটাই খাঁটি। কেননা ভাবী যুগের একটা প্রেরণা এসেছে মানুষকে সংযুক্ত করবার জন্যে। যে বুদ্ধি সকলকে সংযুক্ত করে সেই হচ্ছে শুভবুদ্ধি। এই-যে লীগ অফ নেশন্স - প্রতিষ্ঠা বা ভারতশাসনসংস্কার, এ-সব হচ্ছে ভাবী যুগ সম্বন্ধে পশ্চিমদেশের বাণী। এ বাণী সত্যকে যদি বা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে এর চেষ্টা হচ্ছে সেই সত্যের অভিমুখে।

আজ এই বিশ্বচিন্তা-উদ্বোধনের প্রভাতে আমাদের দেশে জাতীয় কোনো প্রচেষ্টার মধ্যে যদি বিশ্বের সর্বজনীন কোনো বাণী না থাকে তা হলে তাতে আমাদের দীনতা প্রকাশ করবে। আমি বলছি নে, আমাদের আশু প্রয়োজনের যা-কিছু কাজ আছে তা আমরা ছেড়ে দেব। সকালবেলায় পাখি যখন জাগে তখন কেবলমাত্র আহ্বান-অনুবেগে তার সমস্ত জাগরণ নিযুক্ত থাকে না, আকাশের আহ্বানে তার হুই অক্লান্ত পাখা সায় দেয় এবং আলোকের আনন্দে তার কণ্ঠে গান জেগে ওঠে। আজ সর্বমানবের চিন্তা আমাদের চিন্তে তার ডাক পাঠিয়েছে ; আমাদের চিন্তা আমাদের ভাষায় তার সাড়া দিক, কেননা ডাকের যোগ্য সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে প্রাণশক্তির লক্ষণ। একদা যখন পরমুখাপেক্ষী পলিটিক্সে সংস্কৃত ছিলাম, তখন আমরা কেবলই পরের অপরাধের তালিকা আউড়ে পরকে তার কর্তব্যক্রটি স্মরণ করিয়েছি ; আজ যখন আমরা পরপরায়ণতা থেকে আমাদের পলিটিক্সকে ছিন্ন করতে চাই, আজও সেই পরের অপরাধ-অপের দ্বারাই আমাদের বর্জননীতির

কালান্তর

পোষণপালন করতে চাচ্ছি। তাতে উত্তরোত্তর আমাদের যে মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছে সে আমাদের চিন্তের আকাশে রক্তবর্ণ ধুলো উড়িয়ে বৃহৎ জগৎ থেকে আমাদের চিন্তাকে আবৃত করে রাখছে। প্রবৃত্তির ক্ষত চরিতার্থতার দিকে আমাদের উদ্বেগনা সে কেবলই বাড়িয়ে তুলছে। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত ভারতের বিরাট রূপ চোখে না পড়াতে আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ভারতের যে পরিচয় আমরা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছি সে অতি ছোটো, তার দীপ্তি নেই; সে আমাদের ব্যবসায়বুদ্ধিকেই প্রধান করে তুলছে। এই বুদ্ধি কখনো কোনো বড়ো জিনিসকে সৃষ্টি করে নি। আজ পশ্চিমদেশে এই ব্যবসায়বুদ্ধিকে অতিক্রম করে শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তোলবার জন্তে একটা আকাজক্ষা এবং উদ্যম দেখা দিয়েছে। সেখানে কত লোক দেখেছি যারা এই সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে আজ সন্ন্যাসী। অর্থাৎ যারা স্বাজাত্যের বাধন কেটে ঐক্যের সাধনায় ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়েছে, যারা নিজের অন্তরে মানুষের ভিতরকার অদ্বৈতকে দেখেছে। সেই-সব সন্ন্যাসীকে ইংরেজের মধ্যে অনেক দেখেছি; তাঁরা তাঁদের স্বজাতির আত্মসম্মতি থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার সাধনায় স্বজাতির কাছ থেকে আঘাত ও অপমান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই রকম সন্ন্যাসী দেখেছি ফ্রান্সে, যেমন রোম্যাঁ রলাঁ— তিনি তাঁর দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত। সেই রকম সন্ন্যাসী আমি যুরোপের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত দেশের প্রান্তে দেখেছি। দেখেছি যুরোপের কত ছাত্রের মধ্যে; সর্বমানবের ঐক্যসাধনায় তাদের মুখচ্ছবি দীপ্যমান। তারা ভাবী যুগের মহিমায় বর্তমান যুগের সমস্ত আঘাত ধৈর্যের সঙ্গে বহন করতে চায়, সমস্ত অপমান বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা করতে চায়। আর আমরাই কি কেবল, যেমন ‘পঞ্চকল্যাণঃ স্মরেন্নিত্যাঃ’ তেমনি করে আজ এই শুভদিনের প্রভাতে কেবল পরের অপরাধ স্বরণ করব, এবং আমাদের জাতীয় সৃষ্টিকার্য একটা কলহের উপর প্রতিষ্ঠিত

সত্যের আহ্বান

করতে থাকব ? আমরা কি এই প্রভাতে সেই শুভবুদ্ধিদাতাকে স্বরণ
করব না, য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যিনি বর্ণহীন, যাঁর মধ্যে সাদা
কালো নেই ; বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি
বহুধা শক্তির যোগে অনেক বর্ণের লোকের অন্ত তাদের অন্তনিহিত
প্রয়োজন বিধান করেছেন— আর তাঁরই কাছে কি প্রার্থনা করব না,
'স নো বুঢ়্যা শুভয়া সংযুক্তু, তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি দ্বারা
সংযুক্ত করুন' ?

কার্তিক ১৩২৮

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে তাদের সংখ্যা দশ-বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালীতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পারলে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্তে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করেও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক-এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন, ষতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে তত দিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরি খাটিয়ে যুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি করছি। এক দিন বোকার মতো করছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মতো করছি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেন্সিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাটছেন তার সব-কটাকেও একত্র বোগ করতে গেলে বিরোগাস্ত হয়ে ওঠে।

বায়ুগুণে ঝড় জিনিসটাকে আমরা দুর্যোগ বলেই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাধি ঘুরোর আকারে আসতে থাকে। এই প্রহারটা তো হল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকে উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেছে। এক অংশের বড়ো বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড়ো বেশি লাঘব হয়েছে। এ তো সহ হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়্গড়্ করে ওঠে, পবনদেবের

সমস্যা

ভেঁপু হ-হ করে হংকার দিতে থাকে। যত ক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ার হাওয়ার পঙ্ক্তিতে ঘুচে না যায়, তত ক্ষণ শান্তি হয় না, তত ক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চলবার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটলেই তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ-যে অরণ্যটার গান্ধীর্ঘ নষ্ট হয়ে যায়, ঐ-যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিপন্থক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, সর্গে মর্তে এই রব উঠল 'ভেদ ঘটেছে, ভেদ ঘটেছে'।

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তা হলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ। যত ক্ষণ সেটা আছে তত ক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন করবার চেষ্টা ক'রে ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কী চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারও সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারও কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারও প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না তা নয়, পেলে বিষম কুখ বোধ করে। রবিন্সন ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর-সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেরই অধীনতা। এমন কি প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্সন ক্রুসো ফ্রাইডের

কালান্তর

সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে অড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি ? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায় ? যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিততে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সহজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হত, তা হলে তার সম্বন্ধে রবিন্সন ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলেই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং যে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায় সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতামূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্ছে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয় ; অন্তের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা-উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন ? না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা দ্বিধা বা লোভ প্রবেশ করে তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত করতে থাকে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলই ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ, সম্বন্ধ-ভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্ম-সাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে ? যে মুক্তিতে অহংকার দূর

সমস্যা

করে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিন্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য—এইজন্মে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাই নে; আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই তখন নেতিহীন স্বাধীনতা চাই নে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধা-মুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে দিয়ে; কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েছি, সেখানকার লোকেরা 'স্বাধীনতা চাই' বলে প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেছে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি 'আমরা স্বাধীনতা চাই'। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, যুরোপ যখন বলেছে 'স্বাধীনতা চাই' তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজদেহের মধ্যে ভেদের ছুঁখ ঘটেছিল; সমাজবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো না কোনো বিষয়ে, কোনো না কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি ঘটেছিল—সেইটেকে দূর করার দ্বারা মুক্তি পেয়েছে। আমরাও যখন বলি 'স্বাধীনতা চাই', তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের ছুঁখ-অকল্যাণের কারণ; নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে, তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়? না, মেজবউ বলছেন যে, তিনি স্বামীর মুখ দেখতে চান না, সন্তানদের দূরে রাখতে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, কিন্তু বড়োবউয়ের হাত থেকে ঘরকর্মা নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।

যুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি, রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে তার

কালান্তর

থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে এক দিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্য দিকে প্রজা, যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠেছিল। এই-জন্মে তাদের বিপ্লবের একটিমাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখছি, আর-একটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্ছে আর যারা মজুরি খাটছে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশি। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ার বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে কর্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলেপুলেরা লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে, দয়া ক'রে মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে ; কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল ; ধনীর অনুগ্রহের ছিটেকোটার সেই ভেদ তো ঘোচে না, তাই আপদও মিটতে চায় না।

বহুকাল হল, ইংলণ্ড থেকে এক দল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল ; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ যেটে নি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন ছোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

এক দিন ইটালিতে অস্ত্রিয়ার ছিল রাষ্ট্রের মুড়োর, আর ইটালিয়ান ছিল লেজার। অর্থাৎ লেজার মুড়োর প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার

সমস্যা

থেকে মুক্তিলাভ করে সমস্যার সমাধান করেছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ভেদের হুঃখ থেকে, ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্ছে মুক্তি। এমন কি, আমাদের দেশের ধর্মসাধনার মূল কথাটা হচ্ছে ঐ ; তাতে বলে, ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিভ্রাণ।

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, বিধাতার পরীক্ষাশালার সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয় ; ওদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম, আর-এক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ ; এক পা বড়ো, আর-এক পা ছোটো, সে আর-এক রকমের ভেদ ; পায়ে হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ—এই সব রকম ভেদই স্বাধীনশক্তিযোগে চলাফেরা করার বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের ব'লে চালাতে গেলে তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ঐ-যে পূর্বেই বলেছি, একদা ইংরেজ জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সূতো-গুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না ; সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক ঠাঁতে চড়িয়ে বহু সূতাকে এক অঞ্চল কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধু সম্বন্ধে ছড়ায় বলাছে—

এক কন্তে রাখেন বাড়েন, এক কন্তে খান,

এক কন্তে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।

কালান্তর

তিন কন্ঠেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল কিন্তু দ্বিতীয় কন্ঠটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্ঠের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না ; অতএব উদর এবং আহার-সমস্তার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন— বাপের বাড়ি চুটেছিলেন। প্রথম কন্ঠের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে বার বার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাখেন নি অথচ ভোজের দাবি করেছেন, শেষে শিবঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চলতে চলতে বেলা বইয়ে দিয়েছেন ; নয়তো রেঁধেছেন, বেড়েছেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন আর-একজন পাত শূন্য করে দিয়েছে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্তা হচ্ছে, যে কারণে এমনটা ঘটে অরি যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিবঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, সেটা সর্বাগ্রে দূর করে দেওয়া ; আবদার করে বললেই হবে না যে 'মেজবউ যেমন করে খাচ্ছে আমিও ঠিক তেমনি করে খাব'।

আমরা সর্বদাই বলে থাকি, বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচবে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করি নে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেক দিন থেকে দেখছি, পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে পেট জুড়ে বসেছে। বহু যত্নে অঙ্কুরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন করলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘৃণি মেয়ে তাকে ফাটিয়ে দিলেও

সমস্যা

সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ধারা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, 'তোমাদের আশে-পাশে চার দিকেই ম্যালেরিয়ারাবাহিনী ভোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না।' মুশকিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ভোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ভোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের অবিরল অশ্রুধারার কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ভোবার ভোবার শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্ষ হয়ে বলবেন, 'আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কী ব'লেই ফেলো।' বলতে সংকোচ হচ্ছে; কারণ কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে বলবেন, ও তো সবাই জানে। এইজন্মেই রোগের পরিচয় সৎকে ডাক্তারবাবু অনিদ্রা না ব'লে যদি ইন্সমনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে বোলো টাকা ফি দেওয়া বোলো-আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অস্ত নেই। প্রথমেই বলেছি, ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সামাজ্যটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মতো ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, নৃষ্টিকর্তার নৃষ্টিছাড়া ভূলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চার দিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান চোখে বাঁ চোখে, ডান হাতে বাঁ হাতে ভান্ডার-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক; যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়; যার গর্জনীটা কড়ে-আঙুলের

কালান্তর

সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব হয় ; বার পায়ে তেল-মালিশের দরকার হলে ডান হাত হরতাল করে বসে । এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অল্প পাড়ার দেহটার মতো সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পার না । সে দেখে, অল্প দেহটা জুতো জামা প'রে লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক কুলিয়ে বেড়ায় । তখন সে ভাবে যে, 'ঐ দেহটার মতো জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ যুচবে ।' কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ ক'রে দিয়ে সংশোধন চলে না । জুতো পেলেও তার জুতো খসে পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মতো লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অল্প পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার গ্রহসনটাকে হয়তো ট্র্যাঙ্কেডিতে সমাপ্ত করে দিতে পারে । এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্তা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্তা । কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিক্রপটি হয়তো ব'লে থাকে যে, 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে নিয়ে সর্বত্র ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপনা-আপনি ঘটে উঠবে ।' আপনিই ঘটবে, এ কথা বলা হচ্ছে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া । এই ফাঁকি সর্বনেশে ; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালোবাসে, তাকে বাচাই ক'রে দেখতেই প্রবৃত্তি হয় না ।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত, আমরা কি নেশন না নেশন নই । কথাটা সম্পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা বলাতে পারি নে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ কথা যে মানুষ বলত রাজা হলে তাকে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম । তার প্রতি অহিংস্রতার রক্ষা

সমস্যা

করা আমার পক্ষে কঠিন হত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাধা তর্ক এই ছিল যে, মুইজবুল্যাও তিন তির আত পাশাপাশি রয়েছে তবুও তো তারা এক নেশন, তবে আর কী! তুনে ভাবতুম, যাক, তর নেই। কিন্তু মুখে তর নেই বললেও আসলে তর ঘোচে কই? ফাসির আগামিকে তার যোক্তার যখন বলেছিল 'তর কী, হুর্গা ব'লে বলে পড়ো', তখন সে সাস্বনা পায় নি; কেননা হুর্গা বলতে সে রাজি কিন্তু ঐ বলে পড়াটাতেই আপত্তি। মুইজবুল্যাওর লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে সাস্বনাটা কী? ফলের বেলায় দেখি, আমরা বলে পড়েছি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনিতে করে জল এনে কলঙ্কভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনিটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্কভঞ্জন হয় না, উন্টেই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাববার কথা। মুইজবুল্যাও ভেদ যতগুলোই থাক, ভেদবুদ্ধি তো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিয় দূর করবার প্রস্তাব হবা মাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্মাকুলেবর হয়ে হরতাল করবার তর দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বর, মুখের কথায় বর না। যারা নিজেদের এক মহাজাত ব'লে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্তে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না, স্মৃতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্তবিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু-লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রীহরণ করে থাকে। এক বার এই রকম

কালান্তর

ঘটনার আমার বন্ধু কোনো হানীর হিন্দুকে অভিমান করেছিলেন, 'সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ কর কেন?' সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বললে, 'উয়ো তো বেনিরাকী লড়কী।' 'বেনিরাকী লড়কী' হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হরণ বাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্তে একের আঘাত অন্যের মর্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্ছে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড়ো সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে তখন আপনাকে আপনি কঁাকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করে থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম হাতে কঁাকি দিয়ে ডান হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি, সেইজন্তে সে দিকটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাভাভ্যের যে জয়সুত্ত গড়ে তুলতে চাই তার মাল-মসলাটাকেই খুব প্রচুর করে গোচর করতে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিতকে মাল মসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিতমতো চাপা দিলেই সে তো পাকা হয়ে ওঠে না, বরঞ্চ এক দিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকলে কোনো উপায়েই স্থলে সংশোধন হতে পারে না। এ-সব কথা শুনে অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ বলে ওঠেন, আমাদের চার দিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই; ইতিপূর্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্বিরোধেই ছিলুম কিন্তু, ইত্যাদি ইত্যাদি।—

সমস্তা

শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মাহুকের ছিন্ন খোঁজে ; পাপের ছিন্ন পেলেই তারা তিতরে প্রবেশ করে সর্বনাশের পাল্লা আরম্ভ করে দেয়। বিপদটা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্ছে সকল বিপদের সেরা।

আহাজার খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যত দিন ঝড় তুফান ছিল না তত দিন সে আহাজ খেয়া দিয়েছে। মাঝে মাঝে লোনা জল সঁচতেও হয়েছিল, কিন্তু সে ছুঃখটা মনে রাখবার মতো নয়। যে দিন তুফান উঠল সে দিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে আহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েছে। কাণ্ডেন যদি বলে 'যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক', তা হলে ঐ কাণ্ডেনের মতো নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয় পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয় তা হলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে, তারা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগতে আসে নি। তারা ভয়ংকর বেগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্বলাত্মকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই, রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাঙ্ক। যত ক্ষণ তাদের উপর রাগরাগি করে বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করছি তত ক্ষণ বৃথাসর্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগলে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন, কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ ক'রে সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন, আমাদের মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুরও এত বড়ো আবাদার তিনি শুনবেন না। অতএব কাণ্ডেনের কাছে দোহাই

কালান্তর

পাড়ছি, যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে পান্না দিতে গিয়ে কাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন, 'সে দিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে তার একটা প্রমাণ দেখো যে, যদিও আমরা সনাতনপন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সঙ্কে দেশের লোকের সংস্কার দূর করতে চাই।' আমি বলি, এহ বাহু। স্পর্শদোষ তো আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহু লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই তো পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্বে অন্তত্বে বলেছি, ধর্ম ষাদের পৃথক করে তাদের মেলবার দরজায় ভিতর দিক থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। সকলেই বলে থাকে, ধর্মশব্দের মূল অর্থ হচ্ছে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ, আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব তারা হচ্ছে ধর্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সঙ্কে তর্ক নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল করতে থাকি, তা হলে বাঁচি নে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্তন চলছে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অস্ত নেই; সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সঙ্কে নূতন করে বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করলে আমরা বাঁচি নে। এই নিত্যপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ ঘটবেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে; পৃথিবী ধর্মের মতো ধ্রুব হলেই আমার পক্ষে ভালো, তার নড়চড় হতে থাকলেই

সমস্যা

সর্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে; সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ভ্রব করে তুলি তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোনো গাড়ি বেচতে হয় বা মেরামত করতে হয়, নতুন গাড়ি কিনতে হয় বা ভাড়া করতে হয়, কখনো বা গাড়িতে চুকতে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরোতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার পূর্বে বিধান নেবার জন্তে ভাটপাড়ার সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন বলে ‘মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো’, তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহা-সমুদ্রের মতোই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে ‘মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ করবে না’, তখন আমাকে গ্রহণ করতেই হবে, কেন করব না। এ কথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মতো অনিত্য, তাকে রাখব কি ফেলব সেটার বিচার বুদ্ধির দ্বারা। যদি বল, এ-সব কথা স্বাধীনবিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বলতে হবে, বিচারের যোগ্য বিষয়কে দ্বারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার শিকার আছে যিরো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে বেশি ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্যামিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, ব’লে ভূতের কোনো জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এত বড়ো জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীক মন তাকে বাস্তব বলে মেনে

কালান্তর

নিরেছে। প্রকৃত বাস্তব যে সে বাস্তবের নিয়মে সংযত ; যদি বা সে বাড়িভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারি ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে মানলে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্তে কেবল বুক ছুর্ছুর্ করে, গা ছম্ছম্ করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে 'কেন', জবাব দিতে পারি নে ; কেবল পিঠের দিকে বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, 'ঐ যে।' তার পরেও যদি বলে 'কই যে', তাকে নাস্তিক বলে তাড়া করে যাই। মনে ভাবি, গোয়ারটা বিপদ ঘটালে বুঝি— ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয় ! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে 'কেন' তা হলে উত্তরে বলি, 'আর যেখানেই কেন খাটাও এখানে কেন খাটাতে এসো না বাপু, মানে মানে বিদায় হও— মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।'

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার, না সর্বমানবের। স্মৃতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক কারায় অবরুদ্ধ অকালজরাগ্রস্তদের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনো মিল নেই। বৃহত্তর সঙ্গে এই ভেদ থাকারাই হচ্ছে বন্ধন। কেননা পূর্বেই বলেছি, ভেদটাই সকল দিক থেকে আমাদের মূল বিপদ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে দেয়, আমরা একটা অস্থূতের খাঁচার বসে কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে দিন কাটাই।

জীবনযাত্রার পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস,

সমস্যা

চিত্রশৃঙ্খলের কোনো-একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজ্যের স্বর্গে গেলেও তাদের টেকি-লীলার শাস্তি হবে না ; স্মৃতরাং পরপদপীড়নের ভালে ভালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে— এইমাত্র প্রভেদ ।

যন্ত্রচালিত বড়ো বড়ো কারখানায় মানুষকে পীড়িত ক'রে যন্ত্রবৎ করে ব'লে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটুক্তি করে থাকি । এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়ছি জেনে মনে বিশেষ সাস্তনা পাই । কারখানায় মানুষের এমন পন্থতা কেন ঘটে ? বেহেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্মকে একটা বিশেষ সংকীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না । কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয় । বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সংকীর্ণ । যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নির্ভর শাসনের বিভীষিকা সর্বদা উদ্ভূত রেখে বহু যুগ ধরে বহু কোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেছে সেই দেশজোড়া মানুষ-পেয়া জাঁতাকল কি কল হিসাবে কারও চেয়ে খাটো ? বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা ক'রে এত বড়ো সুসম্পূর্ণ সুবিধীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনো দিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েছে ব'লে আমি তো জানি নে । চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্তেই তার ব্যবহার । মানুষ-পেয়া কল থেকে ছাঁটাকাটা যে-সব অতি-ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বহঁতেই আছে । একটা বোঝা খালস হতেই আর-একটা বোঝা তাদের অধিকার ক'রে বসে ।

প্রাচীন ভারত এক দিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, য একঃ অবর্ণঃ— যিনি এক,

কালান্তর

যিনি বর্ণভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।
তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক
কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চান নি। বুদ্ধা, শুভরা, শুভবুদ্ধির দ্বারাই
মিলতে চেয়েছিলেন ; অন্ধ বশুতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন
বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন করে বোঝাপড়া
করতেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাঙ্ক্ষটাই খুব বড়ো কাজ।
আমরা বিশ্বনৃষ্টিতে দেখতে পাই, আকস্মিক, বিজ্ঞানে যাকে variation
বলে, আচমকা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে একঘরে, কিন্তু বিশ্বনিয়ম
বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে নেন, অথচ সে এক নূতন
বৈচিত্র্যের প্রবর্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে,
আকস্মিক প্রায়ই অনাহুত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার
করলে এই নূতন আগন্তুকটি চার দিকের সঙ্গে সুসংগত হয়, অর্থাৎ
আমাদের বুদ্ধিকে রুচিকে চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে, পীড়িত
অবমানিত না করে, সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন করতে হয়। মনে
করা যাক, একদা এক ফকির বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি
পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট করতে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ
সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সঙ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল,
এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে
উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার করবে কে ? অবুদ্ধি করে না, কেননা তার
কাজ হচ্ছে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা ; বুদ্ধিই করে, যা
নূতন এসেছে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করতে পারে।
যে দেশে যা আছে তাকেই স্বীকার করা, যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ
আবৃত্তি করা, সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে
রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন ধামকা কোথা থেকে

সমস্যা

একজন ভক্তিগদগদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদুর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে বসল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল, শুক্লপক্ষের কার্তিক-সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীখরীকে এক সের ছাগছুৎ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটিকুলমুছরেৎ। এমনি করে অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোকচলাচলের রাস্তার চলার চেয়ে বাধা পড়ে থাকটা সহজ হয়ে ওঠে। যারা নিষ্ঠাবান তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাকলে আমাদের ধর্ম থাকে না। যারা খুঁটীখরীকে মানেও না, এমন কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, 'আহা একেই তো বলে আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি করতে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপুড়াতে চায় না।' সেই সঙ্গে এও বলে, 'আমাদের বিশেষত্ব অন্য সকলের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ করতে চাই নে; কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে, ধর্মের বেড়াঝালে এইরকম বাধা হয়ে অত্যন্ত শাস্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে— কারণ, এটি দূর থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর।'

সৌন্দর্য নিয়ে তর্ক করতে চাই নে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্মের নিজের অধিকারে ধর্ম বড়ো, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়ো। আমার মতো অর্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্রশ্ন করবে, এমনতরো খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে? বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাস্তা তার ঘুম হয় না। যেহেতু গৃহিণীরা স্বস্তায়নের আরোজন ক'রে বলেন, 'ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কী জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়; তোমরা চূপ ক'রে থাকো-না; কলিকালে খুঁটি

কালান্তর

নাড়া দেবার মতো ডানপিটে ছেলের তো অভাব নেই।' শুনে আমাদের মতো নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুক্‌ধুক করতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে সংস্কারটাকে তো হেঁকে ফেলতে পারি নে। কাজেই পরের দিন ভোরবেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগছুক, তিন তোলার বেশি রক্ত খরচ ক'রে হাঁক ছেড়ে বাঁচি।

এই তো গেল আমাদের সব চেয়ে প্রধান সমস্যা। বে বুদ্ধির রাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা ; যাদের মধ্যে সর্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্যা ; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা ; খুঁটিরূপিনী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিতরে বিচার-বিবেককে বলিদান করবার সমস্যা ! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্র বলেন, 'আহা, এখানে ভক্তিটাই হল বড়ো কথা এবং স্নন্দর কথা, খুঁটিটা তো উপলক্ষ্য।' আমাদের মতো আধুনিকেরা বলে, 'এখানে বুদ্ধিটাই হল বড়ো কথা, স্নন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল ; কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অন্ত-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান হাত বাঁধা রেখে আসেন তার কী অনির্বচনীয় মাধুর্য !' আধুনিক বলে, যেখানে ডান হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য— কিন্তু যেখানে অন্ত-আশঙ্কা মূঢ়তারূপে, দীনতারূপে তার কুশ্রী কবলে সেই মাধুর্যকে গিলে খাচ্ছে স্নন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত ছুঃসাধ্য, তার কারণ ছুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন

সমস্যা

ধর্মের দ্বারা এই অচলভাবে আপনাদের সীমানির্দেশ করেছে। সেই ধর্মই তাদের মানববিশ্বকে সাদা কালো ছক কেটে স্পষ্ট ভাবে বিভক্ত করেছে— আশু ও পর। সংসারে সর্বত্রই আশুপরের মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বৃশ্চ্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবা মাত্র তাকে নির্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্ছে, পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বৃশ্চ্যানের তা হতে পারে নি, সে চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে জাতির মধ্যে অস্তরের দিক থেকে যতই কমে এসেছে সেই জাতি ততই উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

হিন্দু নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম দ্বারা এই পরস্পরকে ও অগতের অন্ত সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই-যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজদের চারি দিকে অত্যন্ত মজবুত করে গেঁথে রেখেছে, এতে করে সকল মানুষের সঙ্গে সত্যযোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সংকীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্যসত্যের চেয়ে বাহ্য বিধান, কৃত্রিম প্রথা, এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে।

পূর্বেই বলেছি, মানবজগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মের দ্বারা এই আশু ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েছে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক, হিন্দুর এই ব্যবস্থা; সেই পর, সেই স্লেচ্ছ বা অশুভ, কোনো কাকে তার ধর্মের মধ্যে এসে ঢুকে না পড়ে, এই তার ইচ্ছা।

কালান্তর

মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্মগণ্ডীর বহির্ভর্তী পরকে সে খুব তীব্রভাবেই পর ব'লে জানে; কিন্তু সেই পরকে, সেই কাকেরকে বধাবরকার মতো ঘরে টেনে এনে আটক করতে পারলেই সে খুশি। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে-বের-করা শ্লোক কী বলে সেটা কাকের কথা নয়, কিন্তু লোক-ব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধ'রে ধর্মকে আপন ছুর্গম ছুর্গ ক'রে পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন বাহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ ক'রে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। এতে ক'রে এদের মনঃপ্রকৃতি ছুইরকম ছাঁদের ভেদবুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন ছুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে — আত্মীয়তার দিক থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাকের বলে ঠেকিয়ে রাখে; আত্মীয়তার দিক থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে স্নেহ ব'লে ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ কণে কণে মেলবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত, ঐ-যে প্রথম কন্ঠাটি রাখেন বাডেন অথচ খেতে পান না, আর সেই-যে তৃতীয় কন্ঠাটি না পেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল— সে হচ্ছে ঐ মধ্যমা কন্ঠাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যে দিন মধ্যমা কন্ঠা বাপের বাড়ি চলে যেত সে দিন অবশিষ্ট দুই সতিন, এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেগে উঠত। পদ্মায় ঝড়ের সময়ে দেখেছি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চকু আটকাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝটপট করেছে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়া-তাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় বহু কণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েছে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর বেয়ে

সমস্যা

এসেছে। বাংলাদেশে স্বদেশী-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলে নি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ ক্রম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি; আমরা এক দল পূর্বমুখ হয়ে, অন্য দল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছু কণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চক্ষু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চক্ষুছটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে তোলাবার চেষ্টা ক'রে শুভা যাবে না। কখন চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে, বরফটাকে গরম ক'রে তোলা গেল, সে এক দিন দেখতে পায়, তাতে ক'রে তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেছে। মুসলমানের ধর্মসমাজের চিরাগত নিরয়ের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে উঠেছে, আর হিন্দুর ধর্মসমাজের সনাতন অশুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এর ফল এই যে, কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাকলেও হিন্দু অন্যকে মারতে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয়, মুসলমানের গারে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। এক দল আত্যন্তরিক

কালান্তর

বলে বলী, আর-এক দল আভ্যন্তরিক দুর্বলতার নিদ্বীপ। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘটবে কী ক'রে? অত্যন্ত দুর্বোনের মুখে ক্ষণকালের জন্তে তা সম্ভব, কিন্তু যে দিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সে দিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম বড়ো হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার ধারার মধ্যে। গত যুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মতো ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর ক'রে সহায়তার জন্তে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশানবৈরাগ্যে কিছু ক্ষণের জন্তে নিকাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়দের জন্তে অধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাশয়াজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অমুভবযোগ্য ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছেন। উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষনিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষনিষ্পত্তি সবল-দুর্বলের একান্ত ভেদ থাকলে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পারতুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রক্ষা করবার জন্তে আপনিই আমাদের ডাক পাড়ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরম্পর রক্ষানিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাকলে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরনার জল-পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেঘের মধ্যে একটা আপোষের কন্ফারেন্স বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে

সমস্যা

প্রবলতর চতুর্দশটি তর্কের বিষয়টাকে কিরকম অত্যন্ত সরল ক'রে এনেছিল, সে কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দু-মুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয় পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপ্লাতে হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দু-মুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মের ব্যবহারকে নিত্যধর্মনীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে। নব্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেছে, মোপলা মুসলমানের ধর্ম নব্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেছে। আজ এই দুই পক্ষের কনগ্রেসমঞ্চ-ঘটিত ভ্রাতৃত্বভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অন্ন কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুত ক'রে পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বারবারই ব'লে আসছি, আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে তেমনিই থাক, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাস্তবিত্য করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুস হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই তো গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুন্সে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা ক'রে দক্ষিণের হিন্দুসমাজের শঙ্করাচার্যের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন; তাতে বলেছেন—

The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care

কালান্তর

of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf.

ডাক্তার মুঞ্জের এ কথাটির মানে হচ্ছে এই যে, হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যাস করে নি, সে নিত্য অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে ব'লেই ছুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়বশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আর-একটা অংশে তিনি বলছেন, আট শো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দুরাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাসস্থাপনের জন্তে বিশেষভাবে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান করবার কাজে তিনি আরবদের এত দূর প্রসন্ন দিয়েছিলেন যে, তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ, ধর্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্রযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন; তাই মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যরক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মানত, মনুকে মানত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজ্যসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্ন-কালকেও স্তুতির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে। এইজন্তেই তাদের—

ঠিক ছুপ্প'র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।

মালাবারের রাজা একদা নিজের রাজ্যের মুখোব মাত্র প'রে অবুদ্ধিকে

সমস্তা

রাজ্যসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দুসিংহাসনে এখনো রাজ্য আছে; তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজ্য করে দিয়ে তার কাছে হাত ছোড় করে আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধিবিরুদ্ধ ভয়ংকর কাঁকটাকে, কখনো পাঠান, কখনো মোগল, কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে বসছে। বাইরের থেকে এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য। এরা এক-একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়। আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম। তাই ঠিক ছুপ্প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক ছুপ্প'র বেলা

ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাগবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারি দিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েছে, সেই আমাদের এত দূর অন্ধ করে দিয়েছে যে যখন চীৎকারশব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙছি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তবিত্তে দেবত্র করে ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না; কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে— কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পারে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার

কালান্তর

সময় এসেছে, শুধু কঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে, কর্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে : য একঃ অবর্ণঃ, যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তু, তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

সমাধান

সমস্তার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের অস্ত্র দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, ‘আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড়ো যোগ্যতা।’

আমি জানি, কোনো ঔষধসত্ত্বে এক বিলাতি ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণ স্বরে যেমনি বলেছে ‘জ্বর’ অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিত্তো জ্বর রস গিলিয়ে দিলেন; সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু আপত্তি করবার সময় মাত্র পেল না। সেই সংকটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বলতুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের, তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বলতে পারতেন যে ‘তবে তুমিই চিকিৎসা করো-না; আমি তো তবু যা হয় একটা-কোনো ঔষধ থাকে হয় একজনকে খাইয়েছি, তুমি তো কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করলে’? আমার এইটুকু মাত্র বলবার কথা যে, আসল সমস্যাটা হচ্ছে, বাপের জ্বর নয়, মেয়ের জ্বর; অতএব বাপকে ঔষধ খাওয়ালে এ সমস্তার সমাধান হবে না।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে নির্ণয় করছি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করছে। অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্বল; অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পরবিচ্ছিন্ন— শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ— অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ করতে পারি নে বলেই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে অবুদ্ধির

কালান্তর

প্রতি আস্থা হারিয়ে আস্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটাই যখন আমাদের সমস্ত তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেছি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই— অতএব সকলকেই চরকার সূতো কাটতে হবে। আগুন লাগলে আগুন নেবানো চাই, এ কথাটা আমার মতো মানুষের কাছেও ছুর্বোধ নয়। এর মধ্যে ছুরাহ ব্যাপার হচ্ছে কোন্টা আগুন সেইটে স্থির করা, তার পরে স্থির করতে হবে কোন্টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশ কোটি ভাঙা কুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পারব না। নিজের চরকার সূতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার করতে পারছি নে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ, অর্থাৎ আগুনের চরম ফল। নিজের তাঁত চালাতে থাকলেও এ আগুন জ্বলতে থাকবে। বিদেশী আমাদের রাজা, এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করলেও আগুন জ্বলবে, এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও ছুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে হঠাৎ আগুন লেগেছে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেলব। হাজার বছরের উর্ধ্বকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সূতো কেটে কাপড় বুনলেই সে আগুন দু দিনে বশ মানবে, এ কথা মেনে নিতে পারি নে। আজ দু শো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয় নি, সেই সঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের জ্বালানি কাঠটা হচ্ছে ধর্মে কর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্ষর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, সেখানে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে বহু লোকের সমাবেশে সত্যতার বিচিত্র উদ্ভাস প্রকাশ পেতে চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে

সমাধান

বেশ ভালো রকম ক'রে চাষ করা অত্যাৱশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড়ো সত্যতারই অল্পরূপের আশ্রয় হচ্ছে কুবিক্ষেত্র। কিন্তু সত্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে তো অল্পের চেয়ে বড়ো বই ছোটো নয়। ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ-ভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুলতে পারলে, তবেই সে সত্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মৃত্যুর আবিষ্ট হয়ে অন্ধ সংস্কারের নানা বিলীষিকার সর্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু পুরোহিত গণকারণের দরজার অহরহ ছুটোছুটি ক'রে মরছে সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ শ্রাঘ্য প্রাপ্য পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি, স্বাধীন শক্তি, নিজেকে প্রকাশ করবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখি নি। কিন্তু আধুনিক যুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই। এই প্রয়াস কখন থেকে পাশ্চাত্যদেশে বললাভ করেছে ? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুল পরিমাণে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার করতে সাহস করেছে তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কার-গত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে মুক্তির সর্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর করতে চেষ্টা করেছে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাত্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দামিহ্ব কোনো জাতি কখনো ভালো করে বুঝতেই পারবে না, বহন করা তো দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাকে তারা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব'লে বিশ্বাস করে, তাঁর বাণীকে দৈববাণী ব'লে জেনে তারা ক্ষণকালের ভয়ে একটা হুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের

কালান্তর

মধ্যে থাক। উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে কোনো-এক সময়ে কোনো-একটা কাজ তারা মরিয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জগ্রে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাক। উচিত ছিল কোনো-এক দিন সেই কাজটা কোনো অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন ক'রে নিতে পারে। কিন্তু কচিং-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বলবে না, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সূচপায়।

এমন লোককে জানা আছে যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈত্রিক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজ্জাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর যে, সে পথের সামনে বসে বসে পথটাকে হ্রস্ব করবার দৈব উপায় - চিন্তায় আধ-বোঝা চোখে সর্বদা নিযুক্ত; তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কমছে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বললে, 'তিন মাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি ক'রে দিতে পারি।' এক মুহূর্তে তার জড়তা ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামতো সে হুঃসাধ্য সাধন করতে লাগল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উত্তম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিম্বিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চলতে যে বুদ্ধি, যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই তাকে অলৌকিক শক্তি পথের আভাস দেবা মাত্রই

সমাধান

সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগাতাবিজ বিক্রি হবে কেন? যারা রোগতাপ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসংগত উপায়ের 'পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগাতাবিজ স্বস্ত্যয়ন তন্ত্রমন্ত্র মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজ্ঞত্ব সময় ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কথা ভুলে যায় যে, এই তাগাতাবিজ-গ্রন্থদেরই রোগতাপ-বিপদ-আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারণে কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগাতাবিজ-গ্রন্থদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শতধারার চিরদিন উৎসারিত।

যে দেশে বসন্তরোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে, সে দেশে বসন্ত মাদীরূপ ত্যাগ ক'রে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ ব'লে ঠিক ক'রে চোখ বুজে বসে থাকে সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্ছেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ-চ্যুতির কদম্ব লক্ষণ।

আমার কথার একটা মন্তব্য আছে। সে হচ্ছে এই যে, দেশের এক দল লোক তো বিজ্ঞানশিক্ষা করেছে। তারা তো পরীক্ষা পাস করবার বেলায় ভাগ্যতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণবিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির 'পরে, বিশ্ববিধির 'পরে বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্ছে? তারাও কি বুদ্ধির অঙ্কতায় সংসারে সকল রকমেরই দৈন্ত্য বিস্তার করে না?

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধিমূক্তির ছোর বড়ো বেশি দেখতে পাই নে; তারাও উচ্ছ্বলভাবে যা-তা মেনে

কালান্তর

নিতে প্রস্তুত, অন্ধতন্ত্রিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিতৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধিবিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ংকর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের 'পরে আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে, সে সমাজে পরম্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এই-জন্তে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধ বিশ্বাসে বিনা বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক ক'রে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীকৃত্ব-বশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় ক'রে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গ তিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মন্ত ব'লে ঠেকে যে, এ'কে আমাদের সমস্তার সমাধান ব'লে মেনে নিতে মন রাজি হয় না।

সমাধান

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোটো হবে, এ কথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে কঁাকির 'পরে বিশ্বাস ; বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০

শূদ্রধর্ম

মানুষ জীবিকার জন্তে নিজের সুযোগমতো নানা কাজ করে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তার কর্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে এক দিন জীবিকাকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শাস্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রে তার সমস্ত সংকীর্ণতা-সমেত মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জীবিকানির্বাচন সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে তাগে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে, কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ করতে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তার বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুশকিল এই যে, রাজসংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে স্থলে তার পদই আছে, কর্ম নেই, সেখানেও সে তার খেতাব নিয়ে মানের দাবি করে। ফরাস এ দিকে খেটে খেটে হয়রান হয় আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠত, তা হলে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চলত তা নয়, ফরাসের কাজও একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যিক, অর্থাৎ ফরাসের পক্ষে তা অসম্ভাবজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হয়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্তার মীমাংসা করেছিল বৃত্তিভেদকে পুরুষামুক্রমে

শুদ্ধধর্ম

পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তা হলে তার মধ্যে দাগস্বের অবমাননা থাকত এবং ভিতরে ভিতরে বিজোহের চেষ্টা কখনোই ধামত না। পাকা হল ধর্মের শাসনে। বলা হল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তার ধর্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবি করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্ত নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ-বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ করতেই পারত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায় নি। তবুও, সে কিছু পাক আর না পাক, ধর্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করার মধ্যেও তার একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্ত্রত জীবিকানির্বাহকে ধর্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে, বাহু দৈন্ত স্বীকার করে নিয়ে, সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিস্তৃত যদি রাখে তবে তার দ্বারা তার জীবিকানির্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম। চাষী যদি চাষ না করে, তবে এক দিনও সমাজ টেকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম ব'লে স্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সাধনা তাকে কেউ দেয় নি যে, চাষ করার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যে-সব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তার সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, এ কথা স্পষ্ট।

যে দেশে জীবিকা-অর্জনকে ধর্মকর্মের সামিল করে দেখে না, সে দেশেও নিরশ্রমীর কাজ বন্ধ হলে সমাজের সর্বনাশ ঘটে। অতএব

কালান্তর

সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ করতেই হবে। সুযোগের সংকীর্ণতা-বশত সে রকম কাজ করবার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিকর্মা বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান দেয়, তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আর্জি-মঞ্জুরির দ্বারা সমাজরক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।

যে-সকল কাজ বাহ্য অভ্যাগের নয়, যা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে, তা ব্যক্তিগত না হয়ে বংশগত হতেই পারে না। যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয় তা হলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে গিয়ে বাইরের ঠাটটাই বড়ো হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে সাধনা আন্তরিক তার জন্তে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাগটা পাকা ও দৃষ্টটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়নপ্রথা এক সময়ে আর্ষদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল : তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্ষদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্তে নিয়তজাগরুক চিন্তাক্রমের দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিল্লকের মধ্যে বদ্ধ করে রাখবার নয়; সেই-

শূদ্রধর্ম

অন্তেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। কত্রিয়েরও সেই দশা ; কোথায় যে সে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা কত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত, জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা কত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে যাত্র।

এ দিকে শাস্ত্রে বলছেন : স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এ কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে ধর্ম তাকে তাই পালন করতে হবে। এ কথা বললেই তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-অনুশাসনের যে অংশটুকু অঙ্কভাবে পালন করা চলে তাই প্রাণপণে পালন করতে হবে— তার কোনো প্রয়োজন থাক আর নাই থাক, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্বতা ঘটে ঘটুক, তার ক্ষতি হয় হোক। অঙ্ক আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তার কাছে ভালোমন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে শুচিবাসুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান করতে ছোট্টে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্য শুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে করতে বিধা বোধ করে না। বস্তুত তার পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্মে অহংকার ও অন্তের প্রতি অবজ্ঞার তার চিন্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিক কালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজ-কর্তাদের মতে স্বধর্ম পালন করে তাদের ঔদ্ধত্য এতই হুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম পালন করা খুবই সহজ, যেখানে সেই স্বধর্মের মধ্যে চিন্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা বা ঘানির থেকে তেল বের করা বা উচ্চতর বর্ণের দাস্তবৃত্তি করা কঠিন নয়, বরং তাতে মন যতই মরে যার কাজ ততই সহজ হয়ে আসে। এই-সকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন করতে গেলে চিন্ত চাই।

কালান্তর

বংশানুক্রমে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে তার উপযুক্ত চিন্তাও থাকি থাকে না, মানুষ কেবল যত্ন করে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। যাই হোক, আজ ভারতে বিস্ময়ভাবে স্বধর্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রেরা তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের-নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেক বার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তারা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্ম-শাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাখিকাটা-বর্ষণের মধ্যেও তারা স্বধর্ম রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। তারা তো কোনো কালে সম্মানের দাবি করে নি, পায়ও নি, তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিস্ময়ভাবে রক্ষা করেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়, তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সত্বকে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশি, তাই এক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্মেরই দেশ। তার নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাক্ষেপে ভারতের সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে। বুদ্ধি-সাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্রশক্তিসাধ্য যে-কোনো মহাসম্পদলাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রস্বভার ঠেলে তবে করতে হবে—তার পরে সেই সম্পদকে রক্ষা করার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাববার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখতে পাই সেই পরম আকর্ণের কথাটা বলতে বসেছি।

প্রথম বারে যখন আপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের আহাজ

শুদ্ধধর্ম

লাগল দেখলুম, সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবি গাহারাওয়াল্য অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেগী ধরে তাকে লাধি মারলে। আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের-লাঞ্ছন-ধারী কর্তৃক স্বদেশীর এ রকম অত্যাচার-হুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখলুম। দেশে বিদেশে এরা শুদ্ধধর্ম পালন করছে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হয়ে এরা গ্রহণ করেছে; সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শুদ্ধধর্মের হাওয়ার মানুষ। নিমকের সহজ দাবি যত দূর পৌঁছায় এরা সহজেই তাকে বহু দূরে লঙ্ঘন করে যায়; তাতে আনন্দ পায়, গর্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইংসিং হিউয়েনসাঙের চীন।

মানববিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার দিকে ঘনিষে এসেছে। এ দিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচক্ষু খবুনখরদাক্ষণ শ্রেন্তরগীর নীড় বাধা হচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এশিয়ার অস্থশালায় শক্তিশল তৈরি চলছে, যুরোপের মর্মের প্রতি তার লক্ষ্য। রক্তমোক্ষক্লাস্ত পীড়িত এশিয়াও কণে কণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্ছে। পূর্বমহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চার দিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো এক দিন এই বিরাটকার জাতি তার বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো এক দিন তার আফিমে আবিষ্ট দেহ বহু কালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে যুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে। তখন

কালান্তর

এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্র ভারতবর্ষের কী কাজ ? তখন সে যুরোপের কামারশালার তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্বিচারে তার প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধতে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে, এ কথা প্রশ্ন করতে তার ধর্মে নিষেধ। সে বলবে : স্বধর্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না ; ইংরেজের হয়ে সে কুলিগিরির বোঝা বয়ে মরে, যে বোঝার মধ্যে তার অর্থ নেই, পরমার্থ নেই ; ইংরেজের হয়ে পরকে সে ভেড়ে মারতে যায়, যে পর তার শত্রু নয় ; কাজ সিদ্ধ হবা মাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তার কাছে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্ছে না ; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড়ো দুর্গতি আছে যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্তব্য বলে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনো দিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হলে নিখাস ফেলে বলবে : I miss my best servant.

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

চরকা

চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র আমাকে ছাপার কালিতে লালিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না ব'লেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নে মিল করিয়েছেন।

এতে আমার ব্যথা দূর হল, তা ছাড়া একটা অত্যন্ত পুরোনো কথাই নতুন প্রমাণ জুটল এই যে, কারও সঙ্গে কারও বা মতের মিল হয়, কারও সঙ্গে বা হয় না। অর্থাৎ, সকল মানুষে মিলে মোমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি। কিন্তু সমাজ-বিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই-কলের মধ্যে মানুষ-বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই-কাঠি বের করে আনেন। বনস্পতিককে এ রকম পণ্যদ্রব্য করলে বনদেবতারা চূপ করে থাকেন, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে কাজের খাতিরে মোমাছির বুদ্ধি করে তুললে নারায়ণের দরবারে হিসাব-নিকাশের দিনে জরিমানায় দেউলে হবার ভয় আছে। ছোটো বয়সে জগন্নাথের ঘাটে জলযাত্রার প্রয়োজনে যখন যেতেম, নানা পানির মাঝি হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু কোনো-একটার 'পরে যখন অভিরুচির পক্ষপাত প্রকাশ করা যেত তখন সেজন্তে কারও কাছ থেকে শাসনভয় ছিল না। কেননা পানি ছিল অনেক, যাত্রী ছিল অনেক, তাদের গম্যস্থানও ছিল অনেক। কিন্তু, যদি দেশের উপর তারকেশ্বরের এমন একটা স্বপ্ন থাকত যে, তারণের জন্তে শুধু একটিমাত্র পানিই পবিত্র, তবে তাঁর প্রবল পাণ্ডাদের জবর্দস্তি ঠেকাত কে? এ দিকে মানবচরিত্র

কালান্তর

ঘাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে মরত, 'ওরে পালোয়ান, কুল যদি বা একই হয়, ঘাট যে নানা— কোনোটা উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে।'

শাস্ত্রে বলেন, ঈশ্বরের শক্তি বহুধা। তাই সৃষ্টিব্যাপারে পাঁচ ভূতে মিলে কাজ করে। মৃত্যুতেই বিচিত্র ভূত দৌড় মারে; প্রলয়ে সব একাকার। মানুষকে ঈশ্বর সেই বহুধা শক্তি দিয়েছেন, তাই মানবসভ্যতার এত ঐশ্বর্য। বিধাতা চান মানবসমাজে সেই বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের; বিশেষফললুক্ক শাসনকর্তারা চান, সেই বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের। তাই সংসারে এত অসংখ্য এক কলের মজুর, এক-উর্দি-পরা সেপাই, এক দলের দড়িতে বাঁধা কলের পুতুল। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব জুড়িয়ে হিম হয়ে যায় নি সেখানেই এই হামানদিস্তায়-কোটা সমীকরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছেই। কোথাও যদি সেই বিদ্রোহের লক্ষণ না থাকে, যদি দেখি সেখানে হয় প্রভুর চাবুকে নয় গুরুর অনুশাসনে মানুষকে অনায়াসেই একই ধূলিশয়নে অতি ভালো-মানুষের মতো নিশ্চল শায়িত রাখতে পারে, তা হলে সেই 'দৃষ্টিহীন নাড়ী-ক্ষীণ হিমকলেবর' দেশের জন্তে শোকের দিন এসেছে বলেই জানব।

আমাদের দেশে অনেক দিন থেকেই সমীকরণের অলক্ষণ বলবান। এই মরণের ধর্মই আমাদের দেশে প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক মানুষের 'পরেই এক-একটি বিশেষ কাজের বরাত দিয়েছে। সঙ্কে সঙ্কে কানে এই মন্ত্র যে, সৃষ্টির প্রথম দরবারে তাদের আদিপুরুষ একটিমাত্র বিশেষ মজুরির বায়না নিয়ে তাদের চিরকালকে বাঁধা দিয়ে বসে আছে। স্মৃতরাং কাজে ইস্তফা দিতে গেলেই সেটা হবে অধর্ম। এই রকমে পিপড়ে-সমাজের নকলে খুচরো কাজ চালাবার খুব সুবিধে, কিন্তু মানুষ হবার বিশেষ বাধা। যে মানুষ কর্তা, যে সৃষ্টি করে, এতে তার মন যায় মারা; যে মানুষ দাস, যে মজুরি করে, তারই দেহের নৈপুণ্য পাকা হয়। তাই বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে কেবলই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। এবং সেই পুনরাবৃত্তির জাঁতা

চরকা

চালিয়ে চালিয়েই অস্তিত্বের প্রতি ভারতের এত বিতৃষ্ণা। তাই সে জন্মজন্মান্তরের পুনরাবর্তন-কল্পনায় আতঙ্কিত হয়ে সকল কৰ্ম ও কর্মের মূল মেয়ে দেবার জন্তে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার কথা ভাবছে। এই পুনরাবৃত্তির বিভীষিকা সে আপন প্রতি দিনের অভ্যাস-জড় কর্মচক্রের ঘুরপাকের মধ্যেই দেখেছে। লোকসান শুধু এইটুকু নয়, এমনি করে যারা কল বনে গেল তারা বীর্য হারালো, কোনো আপদকে ঠেকাবার শক্তিই তাদের রইল না। যুগ যুগ ধরে চতুর তাদের ঠকাচ্ছে, গুরু তাদের ভোলাচ্ছে, প্রবল তাদের কানমলা দিচ্ছে। তারা এর কোনো অন্তথা কল্পনা মাত্র করতে পারে না, কারণ তারা জানে মেয়ে রেখেছেন বিধাতা ; সৃষ্টির আদিকালে চতুর্মুখ তাদের চাকায় দম দিয়ে বসে আছেন, সে দম সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত ফুরোবে না। একঘেয়ে কাজের জীবনমৃত্যুর ভেলার মধ্যে কালশ্রোতে তাদের ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সনাতন শাস্ত্র যাই বলুন-না, সৃষ্টির গোড়ায় ব্রহ্মা মানুষকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছিলেন এর সঙ্গে তার সম্পূর্ণই তফাত। মানুষের খোলের মধ্যে ঘূর্ণিচাকার মোটর-কল না বসিয়ে মন ব'লে অত্যন্ত ছটফটে একটা পদার্থ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই বালাইটাকে বিদায় করতে না পারলে মানুষকে কল করে তোলা দুঃসাধ্য। ঐহিক বা পারত্রিক ভয়ে বা লোভে বা মোহমগ্নে এই মনটাকে আধমরা করে তবে কর্তারা এক দলের কাছে কেবলই আদায় করছেন তাঁদের কাপড়, আর-এক দলের কাছে কেবলই ঘানির তেল ; এক দল কেবলই জোগাচ্ছে তাঁদের ফরমাশের হাঁড়ি, আর-এক দল বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। তার পরে যদি দরকার হয় মনুশ্রোচিত কোনো বড়ো কাজে তাদের মন পেতে তারা ব'লে বসে, 'মন ? সেটা আবার কোন্ আপদ ! হুকুম করো-না কেন ? মন্ত্র আওড়াও।'

গাছ বসিয়ে বেড়া তৈরি করতে গেলে সব গাছকেই সমান খাটো করে ছাঁটতে হয়। তেমনি করে আমাদের এই ছাঁটা মনের মূল্যকে মানুষের

কালান্তর

চিন্তাধর্মকে যুগে যুগে দাবিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আত্মকেকার অবাধ্যতার যুগে এ দিকে ও দিকে তার গোটাকতক ডালপালা বিদ্রোহী হয়ে সাম্যসৌম্যকে অতিক্রম করে যদি বেরিয়ে পড়বার দুটো লক্ষণ দেখায়, যদি সকলেরই মন আজ আঁধার রাতের ঝিল্লিধ্বনির মতো মূঢ় গুঞ্জে একটিমাত্র উপদেশমন্ত্রের সমতান অনুকরণ না করে, তা হলে কেউ যেন উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না হন; কেননা স্বরাজের জন্মে আশা করা তখনি হবে খাঁটি।

এইজন্মেই কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন; কেননা বেড়জালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফস্কে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না। তথাপি আশা করি, আমার সঙ্গে প্রকৃতিতে মেলে এমন লোকও অনেক আছেন। তাঁদের সকলকে বাছাই করে নেওয়া শক্ত; কেননা চরকা সম্বন্ধে তাঁদের সকলের হাত চলে না, অথচ মুখ খুব মুখর বেগেই চলে।

যে-কোনো সমাজেই কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে বসিয়েছে, সেইখানেই মানুষের সকল বিষয়ে পরাভব।

বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভারতের মধ্যযুগের সাধু সাধক যাদেরই দেখি, যারাই এসেছেন পৃথিবীতে কোনো মহাবার্তা বহন করে, তাঁরা সকলেই অমনস্ক ষাণ্ডিক বাহ্যিক আচারের বিরোধী। তাঁরা সব বাধা ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। তাঁরা রূপণের মতো, হিসাবি বিজ্ঞ লোকের মতো এমন কথা বলেন নি যে, আগে বাহ্যিক, তার পরে আন্তরিক; আগে অন্তবস্ত্র, তার পরে আত্মশক্তির পূর্ণতা। তাঁরা মানুষের কাছে বড়ো দাবি করে তাকে বড়ো সম্মান দিয়েছিলেন; আর সেই বড়ো সম্মানের বলেই তার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন সম্পদ বিচিত্র ভাবে

চরকা

প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যে, গানে, নানা কারুকলায় সমাজকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। তাঁরা মানুষকে দিয়েছিলেন আলো, দিয়েছিলেন জাগরণ; অর্থাৎ তাকে দিয়েছিলেন তার আপন আত্মারই উপলব্ধি— তাতেই সব দেওয়া পূর্ণ হয়।

আজ সমস্ত দেশ জুড়ে আমাদের যদি দৈন্ত এসে থাকে, তা হলে জানা চাই, তার মূল আছে আমাদের ভিতরের দিকে। সেই মূল দুর্গতির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ বেছে নিয়ে দেশসুদ্ধ সকলে মিলে তার উপরে একটিমাত্র বাহ্যিক প্রক্রিয়া নিয়ে পড়লে শনিগ্রহ ভয় পান না। মানুষ পাথরের মতো জড়পদার্থ হলে বাইরে হাতুড়ি ঠুকে তার মূর্তি বদল করা যেত; কিন্তু মানুষের মূর্তিতে বাহির থেকে দৈন্ত দেখা দিলে ভিতরে প্রাণশক্তির দিকে মন দেওয়া চাই— হাতুড়ি চালাতে গেলে সেই প্রাণটার উপরেই ঘা পড়বে।

এক দিন মোগল-পাঠানের ধাক্কা যেই লাগল হিন্দুরাজত্বের ছোটো ছোটো আলগা পাটকেনের কাঁচা ইমারত চার দিক থেকে খান্ধান হয়ে ভেঙে পড়ল। দেশে তখন সূতোর অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সূতো দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ভাঙন বন্ধ করা যায় নি; রাজার সঙ্গে তখন আর্থিক বিরোধ ছিল না, কেননা তাঁর সিংহাসন ছিল দেশেরই মাটিতে। যেখানে ছিল গাছ তার পাকা ফল পড়ত সেইখানেই গাছতলায়। আজ আমাদের দেশে রাজা এক-আধজন নয়, একেবারে রাজার বন্যা ভারতের মাটি ধুয়ে তার ফসল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সমুদ্রপারে। জমি তাতে ফলও হারায়, উর্বরতাও হারায়। এবারকার এ আঘাতও যে ঠেকাতে পারি নি তার কারণ এ নয় যে, আমাদের যথেষ্ট সূতো নেই; কারণ এই যে, আমাদের মিল নেই, প্রাণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, মোগল-পাঠানের আমলে আমাদের নিঃশক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রও তো ছিল। নদীতে জলধারা যখন কম তখনো বাধ

কালান্তর

দিয়ে ছোটো ছোটো কুণ্ডে হাতের কাছে দিনের কাজ চালাবার মতো জল ধরে রাখা যায়। এ দিকে বাধ ভেঙেছে যে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘোঁসাপাওনা বন্ধ করে লুকিয়ে থাকি এমন দিন আর নেই, কখনো আসবেও না। তা ছাড়া সে বরফম অবরোধই সব চেয়ে বড়ো দৈন্ত। এমন অবস্থায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যাপারের যোগা মনের শক্তি যদি না জাগাতে পারি, তা হলে ফসল খেয়ে যাবে অন্নে, তুঁষ পড়ে থাকবে আমাদের ভাগে। ছেলে-ভোলানো ছড়ায় বাংলাদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে; কিন্তু কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত-চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্ত দূর হবে, স্বরাজ্য মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। বাইরের দারিদ্র্য যদি তাড়াতে চাই তা হলে অন্তরেরই শক্তি জাগাতে হবে বুদ্ধির মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে, সহযোগিতা-প্রবর্তক হৃদয়তার মধ্যে।

তর্ক উঠবে, কাজ বাইরের থেকেও মনকে তো নাড়া দেয়। দেয় বটে, কাজের মধ্যেই যদি মনের অভিমুখে কোনো একটা চিন্তার ব্যঞ্জনা থাকে। কেরানির কাজে এটা থাকে না, এ কথা আমাদের কেরানিগিরির দেশে সকলেই জানে। সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বন্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এইজন্যেই, যে-সব কাজ মুখ্যত কোনো-একটা বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্ল হিল খুব চড়া গলায় *dignity of labour* প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় *indignity of labour* সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। যারা মজুরি করে তারা নিতান্ত দায়ে পড়েই সমাজের বা প্রভুর, প্রবলের বা বুদ্ধিমানের, লোভে বা শাসনে নিজেদের যজ্ঞ বানিয়ে তোলে। তাদেরই মন্ত্র, সর্বনাশে সমুৎপন্ন

চরকা

অর্ধং ত্যজতি পশিতঃ । অর্থাৎ, না খেয়ে বখন মরতেই বসেছে তখন মনটাকে বাদ দিয়েই হাত চালিয়ে পেট চালানো । তাই বলে মানুষের প্রধানতর অর্ধেকটা বাদ দেওয়াতেই তার dignity, এমন কথা বলে তাকে সাহুনা দেওয়া তাকে বিক্রপ করা । বস্তুত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকেই এই যন্ত্রীভবনের পক্ষুতা থেকে বাঁচাবে কিসে, এইটেই হয়েছে মস্ত সমস্যা । আমার বিশ্বাস, সব বড়ো সভ্যতাই হয় মরেছে নয় জীবনমুত্ত হয়েছে অল্প লোকের চাপে বহু লোককে মন-মরা করে দেওয়াতেই । কেননা মনই মানুষের সম্পদ । মনোবিহীন মজুরির আন্তরিক অগৌরব থেকে মানুষকে কোনো বাহু সমাদরে বাঁচাতে পারা যায় না । যারা নিজের কাছেই নিজে ভিতর থেকে খাটো হয়ে গেছে, অন্যেরা তাদেরই খাটো করতে পারে । যুরোপীয় সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোনো বড়ো নৈতিক সাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহু প্রকৃতির হাতের সব রকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা । এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না । মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এত বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষ যে দিন প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল সে দিন তার এক মহা দিন । অচল জড়কে চক্রাকৃতি দিয়ে তার সচলতা বাড়িয়ে দেবা মাত্র, যে বোঝা সম্পূর্ণ মানুষের নিজের কাঁধে ছিল তার অধিকাংশই পড়ল জড়ের কাঁধে । সেই তো ঠিক, কেননা জড়ই তো শূদ্র । জড়ের তো বাহিরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্তা নেই ; মানুষের আছে, তাই মানুষ মাত্রই দ্বিজ । তার বাহিরের প্রাণ, অন্তরের প্রাণ, উভয়কেই রক্ষা করতে হবে । তাই জড়ের উপর তার বাহু কর্মভার

কালান্তর

যতটাই সে না চাপাতে পারবে, ততটাই চাপাতে হবে মানুষের উপর। স্মৃতরাং ততটা পরিমাণেই মানুষকে জড় ক'রে শূদ্র ক'রে তুলতেই হবে, নইলে সমাজ চলবে না। এই-সব মানুষকে মুখে dignity দিয়ে কেউ কখনোই dignity দিতে পারবে না। চাকা অসংখ্য শূদ্রকে শূদ্রত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চাকাই চরকায়, কুমোরের চাকে, গাড়ির তলায়, স্থূল স্থূল নানা আকারে মানুষের প্রভূত ভার লাঘব করেছে। এই ভারলাঘবতার মতো ঐশ্বর্যের উপাদান আর নেই, এ কথা মানুষ বহুযুগ পূর্বে প্রথম বুঝতে পারলে যে দিন প্রথম চাকা ঘুরল। ইতিহাসের সেই প্রথম অধ্যায়ে যখন চরকা ঘুরে মানুষের ধন-উৎপাদনের কাজে লাগল ধন তখন থেকে চক্রবর্তী হয়ে চলতে লাগল, সেদিনকার চরকাতেই এসে থেমে রইল না। এই তথ্যটির মধ্যে কি কোনো তত্ত্ব নেই? বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল। এই অচলতাই হচ্ছে মূল দারিদ্র্য। সকল দৈব শক্তিই অসীম, এইজন্য চলনশীল চক্রের এখনো আমরা সীমায় এসে ঠেকি নি। এমন উপদেশ যদি মেনে বসি যে, স্মৃতো কাটার পক্ষে আদিম কালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, স্মৃতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্তলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাচক্রের যে বিরাট শক্তিরূপ দেখা যায় সেটাকে যখন ভুলি, যখন কোনো-এক বিশেষ কালের বিশেষ চরকাকেই স্মৃতো কাটবার চরম উপাদান রূপে দেখি ও অভ্যস্তভাবে ব্যবহার করি, তবে চরকা ভিতরের দিক থেকে আমাদের কাছে বোবা হয়ে থাকে; তখন যে চরকা মানুষকে এক দিন শক্তির পথে, ধনের পথে অনেক দূর এগিয়ে

চরকা

দিয়েছে সে আর এগোবার কথা বলে না। কানের কাছে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু মনের সঙ্গে কথা কয় না।

আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, ‘চরকা ছাড়া আর কোনো কাজ করো না, এমন কথা তো আমরা বলি নে।’ তা হতে পারে, কিন্তু ‘আর কোনো কাজ করো’ এ কথাও তো বলা হয় না। সেই না-বলাটাই কি প্রবল একটা বলা নয়? স্বরাজস্বাধীন্য একটিমাত্র কাজের হুকুম অতি নির্দিষ্ট, আর তার চার দিকেই নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতার পটভূমিকার উপরে চরকা কি অত্যন্ত মস্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে না? বস্তুত সে কি এতই মস্ত? ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোক স্বভাবস্বাতন্ত্র্য-নিবিচারে এই ঘূর্ণ্যমান চরকার কাছে যে যতটা পারে আপন সময় ও শক্তির নৈবেদ্য সমর্পণ করবে— চরকার কি প্রকৃতই সেই মহিমা আছে? একই পূজাবিধিতে একই দেবতার কাছে সকল মানুষকে মেলবার জন্য আজ পর্যন্ত নানা দেশে বারে বারে ডাক পড়ল। কিন্তু, তাও কি সম্ভব হয়েছে? পূজাবিধিই কি এক হল না দেবতাই হল একটি? দেবতাকে আর দেবাচনাকে সব মানুষের পক্ষে এক করবার জন্য কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুর অত্যাচার পৃথিবীতে চলে আসছে। কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধনমন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে? মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের ‘পরে এত অশ্রদ্ধা?

গুপী ব’লে আমাদের এক পশ্চিমদেশী বেহারী ছিল। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শুনেছিলুম যে, যখন সে পুরীতীর্থে গিয়েছিল, ভগ্নাথের কাছে কোন্ খাণ্ড ফল উৎসর্গ করে দেবে এই নিয়ে তার মনে বিষম ভাবনা উপস্থিত হল। সে বার বার মনে মনে সকল রকম খাবার যোগ্য ফলের ফর্দ আউড়িঃয় যেতে লাগল। কোনোটাতেই তার মন সায় দিলে না। অবশেষে হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিলিতি বেগুন। তখনি তার দ্বিধা

কালান্তর

গেল ঘুচে, জগন্নাথকে দিয়ে এল বিলিতি বেগুন, শেষ পর্যন্ত এ সবক্কে তার পরিতাপ রইল না ।

সব চেয়ে সহজ দেবতার কাছে সব চেয়ে কম দেওয়ার দাবি মানুষের প্রতি সব চেয়ে অন্য় দাবি । স্বরাজসাধনের নাম করে তেত্রিশ কোটি লোককে চরকা কাটতে বলা জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দেওয়া । আশা করি, ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি গুপী নেই । বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড়ো দাবি করেন, তখন মানুষ ধন্য হয় । কেননা, মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে ওঠে, বুঝতে পারে সে বড়ো ।

আমাদের দেশ আচারনিষ্ঠতার দেশ বলেই দেবতার চেয়ে পাণ্ডার পা-পুজোর 'পরে আমাদের ভরসা বেশি । বাহিরকে ঘুষ দিয়ে অন্তরকে তার দাবি থেকে বঞ্চিত করতে পারি, এমনতরো বিশ্বাস আমাদের ঘোচে না । আমরা মনে করি, দড়ির উপরে যদি প্রাণপণে আস্থা রাখি তা হলেই সে নাড়ী হয়ে ওঠে । এই বাহ্যিকতার নিষ্ঠা মানুষের দাসত্বের দীক্ষা । আত্মকর্তৃত্বের উপর নিষ্ঠা হারাবার এমন সাধনা আর নেই । এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা । ঘরে ঘরে বসে বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে ।

ঘোর পুরাতন কথাটাকে আজ নতুন করে বলতে হচ্ছে যে, স্বরাজের ভিত বাহ্য সাম্যের উপর নয়, অন্তরের ঐক্যের উপর । জীবিকার ক্ষেত্রে এই আন্তরিক ঐক্যের মস্ত একটা জায়গা আছে । বস্তুত ঐক্যটা বড়ো হতে গেলে জায়গাটা মস্ত হওয়াই চাই । কিন্তু, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা থেকে তার একটিমাত্র ভগ্নাংশকে ছাড়িয়ে তারই উপর বিশেষ ঝোঁক দিলে সূতোও মিলবে, কাপড়ও মিলবে, কেবল মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবনের মিল লক্ষের বাইরে পড়ে থাকবে ।

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের মিল হওয়া সম্ভব নয় ; আর রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলেই মিলবে এমন চর্চা এখানে কোনো দিন ছিল না, সবে এর

চরকা

আরম্ভ হয়েছে— সাধারণের মনকে সত্যভাবে অধিকার করতে অনেক দেরি হবে। এইজন্টেই জীবিকার ভিত্তির উপরে একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার দিকেই আমাদের মন দিতে হবে। জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে— মরণেরই ডাকের মতো এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি বর্ণক্ষেত্র না হয়— যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তা হলে রিপূর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারি। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষে গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাবটা অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকের বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনিই চলছে। বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্র একান্তভাবে স্বকীয় স্বার্থ-সাধনের যে আয়োজনে ব্যাপ্ত সেই তার রাষ্ট্রনীতি। তার মিথ্যা দলিল আর অস্বের বোঝা কেবলই ভারি হয়ে উঠছে। এই বোঝা বাড়াবার আয়োজনে পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে; এর আর শেষ নেই, জগতে শান্তি নেই। যে দিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েরই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন সম্ভব, কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেই দিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেই দিনই সামাজিক মানুষ যে-সকল ধর্ম-নীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মপ্লাবীর নিরবচ্ছিন্ন চর্চা,

কালান্তর

এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে। League of Nations -এর প্রতিষ্ঠা হয়তো রাষ্ট্রনীতিতে অহমিকামুক্ত মনুষ্যত্বের আসন-প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ।

রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। কিন্তু, মানুষ যখন মানুষ তখন তার জীবিকাও কেবল শক্তিসাধনার ক্ষেত্র না হয়ে মনুষ্যত্বসাধনার ক্ষেত্র হয়, এইটেই উচিত ছিল। জীবিকার ক্ষেত্রেও মানুষ কেবল আপন অন্ন পাবে তা নয়, আপন সত্য পাবে, এই তো চাই। কয়েক বছর পূর্বে যে দিন সমবায়মূলক জীবিকার কথা প্রথম শুনি, আমার মনে জটিল সমস্যার একটা গাঁঠ যেন অনেকটা খুলে গেল। মনে হল যে, জীবিকার ক্ষেত্রে স্বার্থের স্বাতন্ত্র্য মানুষের সত্যকে এত দিন অবজ্ঞা করে এসেছিল, সেখানে স্বার্থের সম্মিলন সত্যকে আজ প্রমাণ করবার ভার নিয়েছে। এই কথাই বোঝাতে বসেছে যে, দারিদ্র্য মানুষের অসম্মিলনে, ধন তার সম্মিলনে। সকল দিকেই মানব-সভ্যতার এইটেই গোড়াকার সত্য— মনুষ্যলোকে এ সত্যের কোথাও সীমা থাকতে পারে, এ আমি বিশ্বাস করি নে।

জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব এই কথা বলে যে, সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্ত ঘোচে, কোনো-একটা বাহ্য কর্মের প্রক্রিয়ায় ঘোচে না। এই কথায় মানুষ সম্মানিত হয়েছে। এই সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া; একটা আচার নয়। এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে। মনের সঙ্গে পদে পদেই এর মুকাবিলা। ইংরাজি ভাষায় যাকে আঁধা গলি বলে, জীবিকা-সাধনার পক্ষে এ সে রকম পথ নয়। বুঝেছিলুম, এই পথ দিয়ে কোনো-একটি বিশেষ আকারের অন্ন নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আসবেন যার মধ্যে অন্নের সকল প্রকার রূপ এক সত্যে মিলেছে।

আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার

চরকা

আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়ারল্যান্ডের কবি ও কর্মবীর A. E. -রচিত National Being বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায়জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্নব্রহ্মও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়— অর্থাৎ কর্মের মধ্যে বুঝতে পারে যে, অন্নের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি— এই কথাটি আইরিশ কবি-সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।

নিশ্চয় অনেকে আমাকে বলবেন, এ-সব শব্দ কথা। সমবায়ের আইডিয়াটাকে বৃহৎভাবে কাজে খাটানো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরীক্ষায়, অনেক ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে অনেক দিনে যদি সম্ভব হয়। কথাটা শব্দ বই কি। কোনো বড়ো সামগ্রীই সস্তা দামে পাওয়া যায় না। দুর্লভ জিনিসের সুখসাধ্য পথকেই বলে ফাঁকির পথ। চরকার স্বরাজ পাওয়া যায়, এ কথা অনেকে বলছেন, অনেকে বিশ্বাসও করছেন, কিন্তু যিনি স্পষ্ট করে বুঝেছেন এমন লোকের সঙ্গে আজও আমার দেখা হয় নি। কাজেই তর্ক চলে না; দেশে তর্ক চলছেও না, রাগারাগি চলছে। যারা তর্কে নামেন তাঁরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন, কত চরকার কত পরিমাণ স্ততো হয়, আর কত স্ততোয় কতটা পরিমাণ খদের হতে পারে। অর্থাৎ, তাঁদের হিসাব-মতে দেশে এতে কাপড়ের দৈন্য কিছু ঘুচবে। তা হলে গিয়ে ঠেকে দৈন্য দূর করার কথায়।

কিন্তু, দৈন্য জিনিসটা জটিল মিশ্র জিনিস। আর, এ জিনিসটার উৎপত্তির কারণ আছে আমাদের জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির ক্রটিতে, প্রথার দোষে ও চরিত্রের দুর্বলতায়। মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে এক করে ধরে তবে ভিতরে বাহিরে এর প্রতিকার করা যেতে পারে। কাজেই

কালান্তর

প্রশ্ন কঠিন হলে তার উত্তরটা সহজ হতে পারে না। যদি গোরা ফৌজ কামান বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে, তবে দিশি সেপাই তীর ধনুক দিয়ে তাদের ঠেকাতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কেন পারবে না? দেশসুদ্ধ লোক মিলে গোরাদের গায়ে যদি থুথু ফেলে তবে কামান বন্দুক সমেত তাদের ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই থুথু ফেলাকে বলা যেতে পারে দুঃখগম্য তীর্থের সুখসাধ্য পথ। আধুনিক কালের বিজ্ঞানাভিমानी যুদ্ধপ্রণালীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশের পক্ষে এমন নিখুঁত অথচ সরল উপায় আর নেই, এ কথা মানি। আর এও নাহয় আপাতত মেনে নেওয়া গেল যে, এই উপায়ে সরকারি থুংকার-প্রাবনে গোরাদের ভাসিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়; তবু মানুষের চরিত্র যারা জানে তারা এটাও জানে যে, তেত্রিশ কোটি লোক একসঙ্গে থুথু ফেলবেই না। দেশের দৈন্য-সমুদ্র সৈঁচে ফেলবার উদ্দেশে চরকা-চালনা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে।

আয়র্লণ্ডে সার হরেস প্র্যাক্টেট যখন সমবায়-জীবিকা-প্রবর্তনে প্রথম লেগেছিলেন তখন কত বাধা, কত ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে গিয়েছিলেন, কত নূতন নূতন পরীক্ষা তাঁকে করতে হয়েছিল; অবশেষে বহু চেষ্টার পরে সফলতার কী রকম শুরু হয়েছে National Being বই পড়লে তা বোঝা যাবে। আগুন ধরতে দেবি হয়, কিন্তু যখন ধরে তখন ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। শুধু তাই নয়, আসল সত্যের স্বরূপ এই যে, তাকে যে দেশের যে কোণেই পাওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করা যায় সকল দেশেরই সমস্যা সে সমাধান করে। সার হরেস প্র্যাক্টেট যখন আয়র্লণ্ডে সিদ্ধিলাভ করলেন তখন তিনি একই কালে ভারতবর্ষের জন্মেও সিদ্ধিকে আবাহন করে আনলেন। এমনি করেই কোনো সাধক ভারতবর্ষের একটিমাত্র পল্লীতেও দৈন্য দূর করবার মূলগত উপায় যদি চালাতে পারেন, তা হলে তিনি তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকেই চিরকালের সম্পদ দিয়ে যাবেন। আয়তন

চরকা

পরিমাপ করে যারা সত্যের বাথার্থ্য বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিক ভাবে জড়ের সামিল করে দেখে ; তারা জানে না যে, অতি ছোটো বীজের মধ্যও যে প্রাণটুকু থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করবার পরওয়ানা সে নিয়ে আসে ।

এইমাত্র আমার একজন বন্ধু বললেন যে, ‘দেশের সাধারণ দৈন্ত-দূর বা স্বরাজলাভ বললে যতখানি বোঝায় তোমার মতে চরকায় স্ততো কাটার লক্ষ্য তত দূর পর্যন্ত নাও যদি পৌঁছয়, তাতেই বা দোষ কী ? চাষের কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন চাষির, এবং গৃহকাজ প্রভৃতি সেবেও গৃহস্থর, হাতে যে উপরি সময় বাকি থাকে তাকে সকলে মিলে কোনো সর্বজনসাধ্য লাভবান কাজে লাগালে সাধারণের অবস্থার অনেক উন্নতি হতে পারে, দেশে চরকা চলিত করার এই শুভ ফলটুকুই ধরে নাও-না কেন ?’ মনে আছে, এইজাতীয় আর-একটা কথা পূর্বে শুনেছিলুম । আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেই ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে থাকে । তার দ্বারা সমস্ত ভারত জুড়ে যে পুষ্টির খাণ্ড নষ্ট হয়, তা সকলে মিলেই যদি রক্ষা করি তা হলে মোটের উপরে অনেকটা অল্পকষ্ট দূর হতে পারে । কথাটার মধ্যে সত্য আছে । ফেন-সমেত ভাত খেতে গেলে অভ্যস্ত রুচির কিছু বদল করা চাই, কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলে সেটা দুঃসাধ্য হওয়া উচিত নয় । এই রকম এমন আরো অনেক জিনিস আছে যাকে আমাদের দৈন্তলাঘব-উপায়ের তালিকার মধ্যে ধরা যেতে পারে । এ সম্বন্ধে দ্বারা যেটা ভালো বোঝেন চালাতে চেষ্টা করুন-না ; তার কোনোটাতে ধন বাড়বে, কোনোটাতে তার সঙ্গে পুষ্টিও বাড়বে, কোনোটাতে কিছু পরিমাণে আলস্যদোষ কেটে যাবে । কিন্তু দেশে স্বরাজলাভের যে একটা বিশেষ উদ্‌যোগ চলছে, দেশমুক্ত সকলে মিলে ভাতের ফেন না ফেলাকে তার একটা সর্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ করার কথা কারও তো মনেও হয় না । তার কি কোনো কারণ নেই ? এ সম্বন্ধে আমার কথাটা পরিষ্কার

কালান্তর

করবার জন্তে ধর্মসাধনার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এই সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার উপলক্ষ্যেই যদি বিশেষ জোর দিয়ে হাজার বার করে বলা হয় যে, যার-তার কুয়ো থেকে জল খেলে ধর্মভ্রষ্টতা ঘটে, তবে তার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, এমন উপদেশে ধর্মসাধনার নৈতিক পন্থার মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। যার-তার কুয়োতে মলিনতা থাকার আশঙ্কা আছে, সেই মলিনতায় স্বাস্থ্য ক্লিষ্ট হয়, স্বাস্থ্যের বিকারে চিত্তের বিকার ঘটে, সেই বিকারে ধর্মহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে—এ-সব কথাই সত্য বলে মানলেও তবু বলতেই হবে, অপ্রধানকে পরিমাণ-অতিরিক্ত মূল্য দিলে তাতে প্রধানের মূল্য কমে যায়। সেইজন্মেই আমাদের দেশে এমন অসংখ্য লোক আছে, মুসলমান যাদের কুয়ো থেকে জল তুলতে এলে মুসলমানকে মেরে খুন করতে যারা কুণ্ঠিত হয় না। ছোটটোকে বড়োর সমান আসন দিলে সে সমান থাকে না, সে বড়োকে ছাড়িয়ে যায়। এইজন্মেই জলের শুচিতা-রক্ষার ধর্মবিধি মানুষের প্রাণহিংসা না করার ধর্মবিধিকে অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে নিত্য-ধর্মের সঙ্গে আচারধর্মকে মিলিয়ে দেওয়ার দ্বারা এ রকম দুর্গতি যে কত ঘটছে, তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই মজ্জাগত সনাতন অভ্যাসেরই জোরে আজ চরকা খন্দর সর্বপ্রধান স্বারাজিক ধর্মকর্মের বেশে গদা হাতে বেড়াতে পারল, কেউ তাতে বিশেষ বিস্মিত হল না। এই প্রাধান্যের দ্বারাতেই সে অনিষ্ট করছে, আমাদের দেশের বহুযুগসঞ্চারী দুর্বলতার আর-একটা নতুন খাণ্ড জুগিয়ে দিচ্ছে। এর পরে আর-এক দিন আর-কোনো বলশালী ব্যক্তি হয়তো স্বারাজ্য-সিংহাসন থেকে প্রচার করবেন যে, ভাতের ফেন যে ফেলে দেয় সেই অন্নঘাতীকে মন্ত্রণা-সভায় ঢুকতে দেব না। তাঁর যদি বখেটে জোর থাকে এবং তাঁর শাসন যদি বেশি দিন চলে তবে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এক দিন সাধু লোকে নিজেদের শুচিতা-রক্ষার জন্তে ভাতের ফেন-পাত উপলক্ষ্যে মানুষের

চরকা

রক্ত-পাত করতে থাকবে। বিদেশী কাপড় পরায় অশুচিতা ঘটে এই নিষেধ যদি দেশের অধিকাংশ লোকে গ্রহণ করে, এবং অন্ন জল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অশুচিতা-বোধের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কারগত হয়ে ওঠে, তা হলে সে দিন ইদের দিনে কলকাতায় যে রকম মাথা-ফাটাফাটি হয়েছে এ নিয়েও এক দিন স্নেহ ও অস্নেহদের মধ্যে তেমনি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাবে। যে আচারপরায়ণ সংস্কারের অঙ্কতা থেকে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতারীতির উৎপত্তি, সেই অঙ্কতাই আজ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে চরকা-খাদরিক অস্পৃশ্যতা-তত্ত্ব জাগিয়ে তুলছে।

কেউ কেউ বলবেন, 'তুমি যে সমবায়ছীবিকার কথা বলছ সকলে মিলে চরকা কাটাই তো তাই।' আমি তা মানি না। সমস্ত হিন্দুসমাজে মিলে কুয়োর জলের শুচিতা রক্ষা করলেও সেটা জীবাণুতত্ত্বমূলক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান হয়ে ওঠে না; ওটা একটা কর্ম, ওটা একটা সত্য নয়। এইজন্টেই কুয়োর জল যখন শুচি থাকছে পুকুরের জল তখন মলিন হচ্ছে, ঘরের কানাচের কাছে গর্তের ডোবায় তখন রোগের বীজাণু অপ্রতিহত প্রভাবে যমরাজের শাসন প্রচার করছে। আমাদের দেশে কাস্থন্দি তৈরি করবার সময় আমরা অত্যন্ত সাবধান হই— এই সাবধানতার মূলে প্যাস্টার-আবিষ্কৃত তত্ত্ব আছে, কিন্তু বেহেতু তত্ত্বটা রোগের বীজাণুর মতোই অদৃশ্য আর বাহ্য কর্মটা পরিষ্কৃত পিলেটারই মতো প্রকাণ্ড সেইজন্টেই এই কর্মপ্রণালীতে কেবলমাত্র কাস্থন্দিই বাঁচছে, মানুষ বাঁচছে না। একমাত্র কাস্থন্দি তৈরি করবার বেলাতেই বিশ্বস্থ লোকে মিলে নিয়ম মানার মতোই, একমাত্র সূতো তৈরির বেলাতেই তেরিশ কোটি লোকে মিলে বিশেষ আচার রক্ষা। তাতে সূতো অনেক জমবে, কিন্তু যুগে যুগে যে অঙ্কতা জমে উঠে আমাদের দারিদ্র্যকে গড়বন্দী করে রেখেছে তার গায়ে হাত পড়বে না।

মহাত্মাঞ্জির সঙ্গে কোনো বিষয়ে আমার মতের বা কার্যপ্রণালীর

কালান্তর

ভিন্নতা আমার পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর। বড়ো করে দেখলে তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু সব সময়ে মন মানে না। কেননা, ঝাঁকে প্রীতি করি, ভক্তি করি, তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতার মতো আনন্দ আর কী হতে পারে? তাঁর মহৎ চরিত্র আমার কাছে পরম বিশ্বাসের বিষয়। ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাঁর হাত দিয়ে একটি দীপামান দুর্জয় দিব্য শক্তি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তি ভারতবাসীকে অভিভূত না করুক, বলশালী করুক; তাকে নিজের মন দিয়ে চিন্তা করতে, সংকল্প করতে, ত্যাগ করতে শিক্ষা দিক— এই আমার কামনা। যে কারণ ভিতরে থাকতে রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো মনস্বীকেও মহাত্মা বামন বলতে কুণ্ঠিত হন নি— অথচ আমি সেই রামমোহনকে আধুনিক যুগের মহত্তম লোক বলেই জানি— সেই আভ্যন্তরিক মনঃ-প্রকৃতি-গত কারণই মহাত্মাজির কর্মবিধিতে এমন রূপ ধারণ করেছে যাকে আমার স্বধর্ম আপন ব'লে গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্যে আমার খেদ রয়ে গেল। কিন্তু, সাধনার বিচিত্র পথই বিধাতার অভিপ্রেত, নইলে প্রকৃতিভেদ জগতে কেন থাকবে? ব্যক্তিগত অসুযোগের টানে মহাত্মাজির কাছ থেকে চরকায় দীক্ষা নেবার প্রবল ইচ্ছা বারে বারে আমার মনে এসেছে। কিন্তু, আমার বুদ্ধিবিচারে চরকার যতটুকু মর্দাদা তার চেয়ে পাছে বেশি স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে অনেক বিধা করে নিরস্ত হয়েছি। মহাত্মাজি আমাকে ঠিক বুঝবেন জানি, এবং পূর্বেও বার বার আমার প্রতি যেমন ধৈর্য রক্ষা করেছেন আজও করবেন; আচার্য রায়মশায়ও জনাদরনিরপেক্ষ মতস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন, অতএব মাঝে মাঝে বক্তৃতা-সভায় যদিচ মুখে তিনি আমাকে অকস্মাৎ তাড়না করে উঠবেন, তবু অন্তরে আমার প্রতি নিষ্করণ হবেন না। আর, যারা আমার দেশের লোক, যাদের চিন্তাশ্রোত বেয়ে উপকার আর অপকার উভয়েরই কত স্বৃতি অতলের মধ্যে তুলিয়ে গেল, তাঁরা আজ আমাকে যদি ক্ষমা না

চরকা

করেন কাল সমস্তই ভুলে যাবেন। আর যদি বা না ভোলেন, আমার কপালে তাঁদের হাতের লাঞ্ছনা যদি কোনো দিন নাও ঘোচে, তবে আর যেমন আচার্য ব্রজেননাথকে লাঞ্ছনার সঙ্গী পেয়েছি কালও তেমনি হয়তো এমন কোনো কোনো স্বদেশের অনাদৃত লোককে পাব যাদের দীপ্তি দ্বারা লোকনিন্দা নিন্দিত হয়।

ভাদ্র ১৩৩২

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশে বিজ্ঞ লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন যে, 'যত খুশি কথায় বলা, লেখায় লিখো না।' আমি এ উপদেশ মানি নি, তার ভূরি প্রমাণ আছে। কিছু পরিমাণে মেনেওছি, সে কেবল উত্তর লেখা সম্বন্ধে। আমার যা বলবার তা বলতে কসুর করি নে; কিন্তু বাদ যখন প্রতিবাদে পৌঁছয় তখন কলম বন্ধ করি। যত রকম লেখার বায়ু আছে ছন্দে এবং অছন্দে, সকলেরই প্রভাব আমার উপর আছে— কেবল উত্তরবায়ুটাকে এড়িয়ে চলি।

মত বলে যে-একটা জিনিস আমাদের পেয়ে বসে সেটা অধিকাংশ স্থলেই বিস্তৃত যুক্তি দিয়ে গড়া নয়, তার মধ্যে অনেকটা অংশ আছে যেটাকে বলা যায় আমাদের মেজাজ। যুক্তি পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, সেটা অল্প ক্ষেত্রেই; বিশ্বাস করি বলেই যুক্তি জুটিয়ে আনি, সেইটেই অনেক ক্ষেত্রে। একমাত্র বৈজ্ঞানিক মতই খাটি প্রমাণের পথ দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়; অন্য জাতের মতগুলো বারো আনাই রাগ-বিরাগের আকর্ষণে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কেন্দ্রে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

এ কথাটা খুবই খাটে, যখন মতটা কোনো ফললাভের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর সেই লোভ যখন বহুসংখ্যক লোকের মনকে অধিকার করে। সেই বহু লোকের লোভকে উত্তেজিত করে তাদের তাড়া লাগিয়ে কোনো-একটা পথে প্রবৃত্ত করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না; কেবল পথটা খুব সহজ হওয়া চাই, আর চাই দ্রুত ফললাভের আশা। খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে, এই কথাটা কিছু দিন থেকে দেশের মনকে মাতিয়ে রেখেছে। গণমনের এই রকম ঝোড়ো অবস্থায় এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তর কেবল-

স্বরাজসাধন

মাত্র বাগ্‌বিতণ্ডার সাইক্লোন আকার ধরে ; সেই হাওয়ার পাল তুলে দিয়ে কোনো মতকে কোনো বন্দরে পৌঁছিয়ে দেওয়া সহজ নয়। বহুকাল থেকে আমাদের ধারণা ছিল স্বরাজ পাওয়া দুর্লভ ; এমন সময়ে যেই আমাদের কানে পৌঁছল যে, স্বরাজ পাওয়া খুবই সহজ এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাওয়া অসাধ্য নয়, তখন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে, বিচার করতে লোকের রুচি রইল না। তামার পয়সাকে সন্ন্যাসী সোনার মোহর করে দিতে পারে, এ কথায় ষারা মেতে ওঠে তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।

অল্প কিছু দিন হল, স্বরাজ হাতের কাছে এসে পৌঁচেছে ব'লে দেশের লোক বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কথা উঠল, শর্ত পালন করা হয় নি ব'লেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এ কথা খুব অল্প লোকেই ভেবে দেখলেন যে, আমাদের সমস্তাই হচ্ছে শর্ত প্রতিপালন নিয়ে। স্বরাজ পাবার শর্ত আমরা পালন করি নে ব'লেই স্বরাজ পাই নে, এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দু-মুসলমানে যদি আত্মীয়-ভাবে মিলতে পারে তা হলে স্বরাজ পাবার একটা বড়ো ধাপ তৈরি হয়, কথাটা বলাই বাহুল্য। ঠেকছে ঐখানেই যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন হল না ; যদি মিলত তবে পাকিস্তানে প্রতি বৎসরে যে ৩৬৫টা দিন আছে, সব কটা দিনই হত শুভদিন। এ কথা সত্য যে, পাকিস্তানে দিন স্থির করে দিলে নেশা লাগে, তাই ব'লে নেশা লাগলেই যে পথ সহজ হয় তা বলতে পারি নে।

পাকিস্তানের নির্দিষ্ট দিন অনেক কাল হল ভেসে চলে গেছে, কিন্তু নেশা ছোটে নি। সেই নেশার বিষয়টা এই যে, স্বরাজিয়া সাধন হচ্ছে সহজিয়া সাধন। একটি বা দুটি সংকীর্ণ পথই তার পথ। সেই পথের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে চরকা।

কালান্তর

তা হলেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বরাজ জিনিসটা কী। আমাদের দেশনায়কেরা স্বরাজের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নি। স্বাধীনতা শব্দটার মানে বিস্তৃত। নিজের চরকায় নিজের সূতো কাটার স্বাধীনতা আমাদের আছে। কাটি নে তার কারণ কলের সূতোর সঙ্গে সাধারণত চরকার সূতো পাল্লা রাখতে পারে না। হয়তো পারে, যদি ভারতের বহু কোটি লোক আপন বিনা মূল্যের অবসরকাল সূতো কাটায় নিযুক্ত করে চরকার সূতোর মূল্য কমিয়ে দেয়। এটা যে সম্ভবপর নয় তার প্রমাণ এই যে, বাংলাদেশে যারা চরকার পক্ষে লেখনী চালাচ্ছেন তারা অনেকেই চরকা চালাচ্ছেন না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, দেশে সকলে মিলে চরকা চালালে অর্থকষ্ট কিছু দূর হতে পারে, কিন্তু সেও স্বরাজ নয়। না হোক, সেটা অর্থ বটে তো। দরিদ্রের পক্ষে সেই বা কম কী? দেশের চাষিরা তাদের অবসরকাল বিনা উপার্জনে নষ্ট করে; তারা যদি সবাই সূতো কাটে তা হলে তাদের দৈন্য অনেকটা দূর হয়।

স্বীকার করে নেওয়া যাক, এও একটা বিশেষ সমস্যা বটে। চাষিদের উদ্ভূত সমস্যাটাকে কাজে লাগাতে হবে। কথাটা শুনেও যত সহজ তত সহজ নয়। এই সমস্যার সমাধানভার যদি নিতেই হয়, তবে এ সম্বন্ধে বুদ্ধির ছুরুহ সাধনা দরকার। সংক্ষেপে বলে দিলেই হল না— ওরা চরকা কাটুক।

চাষি চাষ করা কাজের নিয়ত অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখন সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অশ্রািয়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

স্বরাজসাধন

চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরান্যস্ত কাজের থেকে আর-একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষিকে চাষের বাইরে যে কাজ করতে বলা যায় তাতে তার মন ডিবেল্ড হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠেলে তাকে হয়তো নড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির বিস্তার অপব্যয় ঘটে।

বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষিরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সবজি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান-চাষের জ্ঞান প্রাপণ করতে পারে, তারা সবজি-চাষের জ্ঞান একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সবজির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

আর-এক জেলায় চাষি ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু, যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম-অঞ্চল থেকে চাষি এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষি এই অন্যান্য ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষি পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্তর কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত

কালান্তর

করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষিতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষিই তার বালুজমিতে তর্মুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।

যখন কোনো-একটা সমস্যার কথা ভাবতে হয় তখন মানুষের মনকে কী করে এক পথ থেকে আর-এক পথে চালানো যায়, সেই শক্তি কথাটা ভাবতে হয়; কোনো একটা সহজ উপায় বাহ্যিকভাবে বাৎলিয়ে দিলেই যে কাজ হাসিল হয়, তা বিশ্বাস করি নে— মানুষের মনের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করাই হল গোড়ার কাজ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক, বাহিরের দিক থেকে এই পরোয়ানা জাহির করা কঠিন নয়। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুরা খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, কেননা সে রকম যোগ দেওয়া খুবই সহজ। এমন কি নিজেদের আর্থিক সুবিধাও মুসলমানদের জন্য অনেক পরিমাণে ত্যাগ করতে পারে; সেটা দুর্কহ সন্দেহ নেই, তবু ‘এহ বাহ’। কিন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের মনের চিরাগত সংস্কারের পরিবর্তন করা সহজ নয়। সমস্যাটা সেইখানেই ঠেকেছে। হিন্দুর কাছে মুসলমান অসুচি, আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের— স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না। আমি একজন ইংরেজিনিশের কথা জানতেম, হোটেলের খানার প্রতি তাঁর খুব লোভ ছিল। তিনি আর-সমস্তই রুচিপূর্বক আহাৰ করতেন, কেবল গ্রেট-ঈস্টার্নের ভাতটা বাদ দিতেন; বলতেন, মুসলমানের রান্না ভাতটা কিছুতেই মুখে উঠতে চায় না। যে সংস্কার-গত কারণে ভাত খেতে বাধে সেই সংস্কারগত কারণেই মুসলমানের সঙ্গে ভালো করে মিলতে তাঁর বাধবে। ধর্মনিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে-সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত সেই অভ্যাসের মধ্যেই

স্বরাজস্বাধন

হিন্দু-মুসলমান-বিৰোধের দৃঢ়তা 'আপন সনাতন কেলা বেধে আছে ; খিলাফতের আহুকুলা বা আধিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্তরে গিয়ে পৌছয় না ।

আমাদের দেশের এই-সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুৰূহ । বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে ; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি । ঠিক পথে অর্থ-উপার্জনের বাধা যার অন্তরের মধ্যে আছে সেই ব্যক্তিই জুয়ো খেলে রাতারাতি বড়োমাহুষ হবার দুৰাশায় নিজের সর্বনাশ করতেও প্রস্তুত হয় ।

চরকা কাটা স্বরাজস্বাধনার প্রধান অঙ্গ এ কথা যদি সাধারণে স্বীকার করে তবে মানতেই হয়, সাধারণের মতে স্বরাজ্যটা একটা বাহ্য ফললাভ । এইজন্যই দেশের মঙ্গলসাধনে আত্মপ্রভাবের যে-সকল চরিত্রগত ও সামাজিক প্রথাগত বাধা আছে সেই প্রধান বিষয় থেকে আমাদের মনকে সরিয়ে এনে চরকা-চালনার উপরে তাকে অত্যন্ত নিবিষ্ট করলে লোকে বিন্মিত হয় না, বরঞ্চ আরাম পায় । এমন অবস্থায় ধরেই নেওয়া যাক যে, চাষিরা তাদের অবসরকাল যদি লাভবান কাজে লাগায় তা হলে আমাদের স্বরাজ্যলাভের একটা প্রধান অন্তরায় দূর হতে পারে ; ধরেই নেওয়া যাক, এই বাহ্যিক ব্যাপারটাই আমাদের দেশে সব চেয়ে আজ পরম চিন্তনীয় ।

তা হলে দেশনায়কদের ভাবতে হবে, চাষিদের অবকাশকালকে সম্যক্রূপে কী উপায়ে খাটানো যেতে পারে । বলা বাহুল্য, চাষের কাজে খাটাতে পারলেই ঠিক রাস্তাটা পাওয়া যায় । আমার যদি কঠিন দৈন্যসংকট ঘটে তবে আমার পরামর্শদাতা হিতৈষীকে এই কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হবে যে, আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যরচনাতেই অভ্যস্ত ।

কালান্তর

বাগ্‌ব্যবসায়ের প্রতি তাঁর যতই অশ্রদ্ধা থাক, আমার উপকার করতে চাইলে এ কথা তিনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না। তিনি হয়তো হিসাব খতিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারেন যে, ছাত্রদের জন্মে কলেজ-পাড়ায় যদি চায়ের দোকান খুলি তা হলে শতকরা ৭৫ টাকা হারে মুন্ফা হতে পারে। হিসাব থেকে মানুষের মনটাকে বাদ দিলে লাভের অঙ্কটাকে খুব বড়ো করে দেখানো সহজ। চায়ের দোকান করতে গিয়ে আমি যে নিজেকে সর্বস্বান্ত করতে পারি তার কারণ এ নয় যে, স্বযোগ্য চাওয়ালার মতো আমার বুদ্ধি নেই, তার কারণ চাওয়ালার মতো আমার মন নেই। অতএব হিতৈষী বন্ধু যদি আমাকে ডিটেক্টিভ গল্প লিখতে বা স্কুলকলেজ-পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে বলেন, তবে নিতান্ত দায়ে ঠেকলে হয়তো সেটা চেষ্টা দেখতে পারি। আমার বিশ্বাস, চায়ের দোকান খোলার চেয়ে তাতে আমার সর্বনাশের সম্ভাবনা কম হবে। লাভের কথায় যদি বা সন্দেহ থাকে, অস্তুত এ কথাটা নিশ্চিত যে, সাহিত্যিকের মনটাকে কাব্যের লাইন থেকে ডিটেক্টিভ গল্পের লাইনে সুইচ করে দেওয়া দুঃসাধ্য নয়।

চিরজীবন ধরে চাষির দেহমনের যে শিক্ষা ও অভ্যাস হয়েছে তার থেকে তাকে অকস্মাৎ ঠেলে ফেলে দিয়ে তাকে সুখী বা ধনী করা সহজ নয়। পূর্বেই বলেছি, মনের চর্চা বাদেই কম গোড়ামি তাদের বেশি, সামান্য পরিমাণ নূতনত্বও তাদের বাধে। নিজের প্ল্যানের অত্যন্ত সহজত্বের প্রতি অমুরাগবশত মনস্তত্ত্বের এই নিয়মটা গায়ের জোরে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করলে তাতে মনস্তত্ত্ব অবিচলিত থাকবে, প্ল্যানটা জখম হবে।

চাষিকে চাষের পথে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চরিতার্থ করবার চেষ্টা অগ্রাগ্র কোনো কোনো কৃষিক্ষেত্রবহুল দেশে চলেছে। সে-সব জায়গায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ চাষের বিস্তার উন্নতি করেছে।

স্বরাজসাধন

আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তারা তাদের অমি থেকে আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ চারগুণ বেশি ফসল আদায় করেছে। এই জ্ঞানালোকিত পথ সহজ পথ নয়, সত্য পথ। এই পথ-আবিষ্কারে মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। চাষের উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের দ্বারা চাষির উত্তমকে বোলো-আনা খাটাবার চেষ্টা না করে তাকে চরকা ঘোরাতে বলা শক্তি-হীনতার পরিচয়। আমরা চাষিকে অলস বলে দোষ দিই, কিন্তু তার অবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যখন তাকে চরকা ধরতে পরামর্শ দিই তখন সেটাতে আমাদেরই মানসিক আলস্যের প্রমাণ হয়।

এত ক্ষণ এই যা আলোচনা করা গেল এটা এই মনে করেই করেছি যে, স্মৃতি ও পদ্যর বহুল পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হলে তাতে এক দল শ্রমিকের অর্থকষ্ট দূর হবে। কিন্তু, সেও মেনে-নেওয়া কথা। এ সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা সন্দেহ প্রকাশ করেও থাকেন; আমার মতো আনাড়ির সে তর্কে প্রবেশ করে কাজ নেই। আমার নালিশ এই যে, চরকার সঙ্গে স্বরাজকে জড়িত করে স্বরাজ সম্বন্ধে দেশের জন-সাধারণের বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে। দেশের কল্যাণসাধনায় চরকাকে প্রধান স্থান দেওয়া অবমানিত মনকে নিশ্চেষ্ট করে তোলবার উপায়। দেশের কল্যাণের একটা বিপরীত মনের সম্মুখে উজ্জল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকেও ছোটো করা হবে। পৃথিবীতে যারা দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে দুঃসাধ্য ত্যাগস্বীকার করেছে

কালান্তর

তারা দেশের বা মানুষের কল্যাণছবিকে উজ্জ্বল আলোয় বিরাটরূপে ধ্যাননেত্রে দেখেছে। মানুষের ত্যাগকে যদি চাই তবে তার সেই ধ্যানের সহায়তা করা দরকার। বহুল পরিমাণ স্নেহ ও খদরের ছবি দেশের কল্যাণের বড়ো ছবি নয়। এ হল হিসাবি লোকের ছবি; এতে সেই প্রকাণ্ড বেহিসাবি শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে না যা বৃহত্তের উপলক্ষিত আনন্দে কেবল যে দুঃখকে মৃত্যুকেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় তা নয়, লোকের প্রত্যাখ্যান ও বার্থতাকেও গ্রাহ্য করে না।

শিশু আনন্দের সঙ্গে ভাষা শিক্ষা করে। কেননা সে আপন বাপের মুখে, মায়ের মুখে সর্বদাই ভাষার সমগ্র রূপটা দেখতে পায়। যখন সে স্পষ্ট করে বুঝতেও পারে না, তখনো এইটেই তাকে কেবলই আকর্ষণ করে। তাই এই প্রকাশের পূর্ণতালাভের জন্ম নিয়তই তার একটি আনন্দময় চেষ্টা জেগে থাকে। শিশুর মনকে বেঁটন করে যদি এই পরিপূর্ণ ভাষা সর্বদা বিরাজ না করত, যদি তার চার দিকে কেবলই ঘুরতে থাকত মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের সূত্র, তা হলে বেতের চোটে কাঁদিয়ে তাকে মাতৃ-ভাষা শেখাতে হত, এবং তাও শিখতে লাগত বহু দীর্ঘ কাল।

এই কারণে আমি মনে করি, দেশকে যদি স্বরাজসাধনায় সত্য ভাবে দীক্ষিত করতে চাই তা হলে সেই স্বরাজের সমগ্র মূর্তি প্রত্যক্ষগোচর করে তোলাবার চেষ্টা করতে হবে। অল্প কালেই সেই মূর্তির আয়তন যে খুব বড়ো হবে, এ কথা বলি নে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হবে, সত্য হবে, এ দাবি করা চাই। প্রাণবিশিষ্ট জিনিসের পরিণতি প্রথম থেকেই সমগ্রতার পথ ধরে চলে। তা যদি না হত তা হলে শিশু প্রথমে কেবল পায়ের বুড়ো আঙুল হয়ে জন্মাত; তার পরে সেটা ধীরে ধীরে হ'ত হাঁটু পর্যন্ত পা; তার পরে ১৫।২০ বছরে সমগ্র মানবদেহটা দেখা দিত। শিশুর মধ্যে সমগ্রতার আদর্শ প্রথম থেকেই আছে, তাই তার মধ্যে আমরা এত আনন্দ পাই। সেই আনন্দে তাকে মানুষ করে তোলাবার কঠিন দুঃখও মা-বাপ স্বীকার

স্বরাজসাধন

করতে পারে। নইলে যদি একখানা আঁজা পানি নিয়েই তাদের চার-পাঁচ বছর কাটাতে হত, তা হলে সেই আংশিকের দাসত্ব তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত।

স্বরাজকে যদি প্রথমে দীর্ঘকাল কেবল চরকার সূতো-আকারেই দেখতে থাকি তা হলে আমাদের সেই দশাই হবে। এই রকম অল্প সাধনায় মহাত্মার মতো লোক হয়তো কিছু দিনের মতো আমাদের দেশের এক দল লোককে প্রবৃত্ত করতেও পারেন, কারণ তাঁর ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের প'রে তাদের শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যে তাঁর আদেশ পালন করাকেই অনেকে ফললাভ বলে গণ্য করে। আমি মনে করি, এ রকম মতি স্বরাজলাভের পক্ষে অল্পকূল নয়।

স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সূতো কাটায় নয়, সম্যক্ ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাৱশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেক-গুলি ব্যাপারের সমবায়। তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাদের একটাকে পৃথক করে নিলে ফল পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই। সহস্র উপদেশের চেয়ে তাতে আমরা কাজ পাব। বিশেষ বিশেষ লোকালয়ে সাধারণের কল্যাণসাধনের দায়িত্ব প্রত্যেকে কোনো না কোনো আকারে গ্রহণ ক'রে একটি স্নহ জ্ঞানবান শ্রীমঙ্গল সম্মিলিত প্রাণযাত্রার রূপকে জাগিয়ে তুলেছে, এমন-সকল দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ধরা দরকার। নইলে স্বরাজ কাকে বলে সে আমরা সূতো কেটে, খন্দর প'রে, কথার উপদেশ শুনে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। যে জিনিসটাকে সমস্ত ভারতবর্ষে পেতে চাই ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশে তাকে যদি স্পষ্ট করে দেখা যায়,

কালান্তর

তা হলে সার্থকতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মাবে। তা হলে আত্ম-প্রভাবের যে কী মূল্য তা বুঝতে পারব; ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, বুঝব তার সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা। ভারতবর্ষের একটিমাত্র গ্রামের লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তা হলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেইখানেই আরম্ভ হবে। জীবজন্তু স্থানবিশেষে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু জন্মগ্রহণের দ্বারাই দেশ তার হয় না। মানুষ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে। সেই সৃষ্টির কাজে ও রক্ষণের কাজে দেশের লোকের পরম্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়, আর সেই সৃষ্টি-করা দেশকে তারা প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতে পারে। আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এইজন্যে তাদের পরম্পর-মিলনের কোনো গভীর উপলক্ষ্য নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করবার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে। সেই সৃষ্টির বিচিত্র কর্মে মানুষের বিচিত্র শক্তির প্রয়োজন। নানা পথে এক লক্ষ্য-অভিমুখে সেই বিচিত্র শক্তির প্রয়োগের দ্বারাই আমরা আপনাকে দেশের মধ্যে উপলব্ধি করি। এই দেশসৃষ্টির সাধনা কাছের থেকে আরম্ভ করে ক্রমে দূরে প্রসারিত করলে তবেই আমরা ফল পাব। যদি এই রকম উদ্যোগকে আমরা আরম্ভনে ছোটো বলে অবজ্ঞা করি তবে গীতার সেই কথাটা যেন মনে আনি— স্বল্পমপ্যশু ধর্মশু ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। সত্যের জোর আয়তনে নয়, তার আপনাতেই।

সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। যখন গ্রামে গ্রামে অস্তুরে বাহিরে তার অভাব— আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে

স্বরাজসাধন

উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিন্তনৈষ্ঠকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অস্ত্রাণের জোরে এ দেশে স্বরাজ কার্যে হতে পারে, এ কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, সিদ্ধিই সিদ্ধিকে টানে; তেমনি স্বরাজই স্বরাজকে আবাহন করে আনে। বিশেষ বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ, অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য, অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়। বেঁচে থাকবার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে আমার প্রাণ আছে। কেউ কেউ হয়তো বলতেও পারেন যে, সূতো কাটাও সৃষ্টি। তা নয়। তার কারণ, চরকার মানুষ চরকারই অঙ্গ হয়; অর্থাৎ যেটা কল দিয়ে করা যেত সে সেইটেই করে— সে ঘোরায়। কল জিনিসটা মনোহীন বলেই সে একা, নিজের বাইরে তার কিছুই নেই। তেমনি যে মানুষ সূতো কাটছে সেও একলা; তার চরকার সূত্র অন্য কারও সঙ্গে তার অবশ্যযোগের সূত্র নয়। তার প্রতিবেশী কেউ যে আছে, এ কথা তার জানবার কোনো দরকারই নেই। রেশমের পলু যেমন একান্তভাবে নিজের চার দিকে রেশমের সূতো বোনে, তারও কাজ সেই রকম। সে স্বপ্ন, সে নিঃসঙ্গ, সে বিচ্ছিন্ন। কনুগ্রেসের কোনো মেম্বর যখন সূতো কাটেন তখন সেই সঙ্গে দেশের ইকনমিক্‌স্-স্বর্গের ধ্যান করতেও পারেন, কিন্তু এই ধ্যানমন্ত্রের দীক্ষা তিনি অন্য উপায়ে পেয়েছেন— চরকার মধ্যেই এই মন্ত্রের বীজ নেই। কিন্তু, যে মানুষ গ্রাম থেকে মারী দূর করবার উদ্যোগ করছে তাকে যদি বা দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ একলাও কাজ করতে হয়, তবু তার কাজের আদিত্তে ও অস্ত্রে সমস্ত গ্রামের চিন্তা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই কাজের দ্বারাই নিজের মধ্যে সমগ্র গ্রামকে সে উপলব্ধি করে। গ্রামেরই সৃষ্টিতে তার সজ্ঞান আনন্দ। তারই কাজে স্বরাজসাধনার সত্যকার আয়ত্ত বটে।

কালান্তর

তার পরে সেই কাজে যদি সমস্ত গ্রামের লোক পরস্পর যোগ দেয় তা হলেই বুঝব, গ্রাম নিজেকে নিজে সৃষ্টি করার দ্বারাই নিজেকে নিজে স্বার্থরূপে লাভ করবার দিকে এগোচ্ছে; এই লাভ করাকেই বলে স্বরাজ্যলাভ। পরিমাণ হিসাবে কম হলেও সত্য হিসাবে কম নয়। অর্থাৎ শতকরা একশোর হারে লাভ না হলেও হয়তো শতকরা একের হারে লাভ; এই লাভই শতকরা একশোর সগোত্র এমন কি সহোদর ভাই। যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের পথে প্রদীপ জ্বলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর-একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ্য নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার বাস্তবিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবৃদ্ধির পথে।

আশ্বিন ১৩৩২

রায়তের কথা

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েবু

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্ধ্বমূল অবাকশাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে। তোমার 'রায়তের কথা' পড়ে আমার মনে হল যে, আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও সেই জাতের। কংগ্রেসের প্রথম উৎপত্তিকালে দেখা গেল, এই তিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে— কি আহাৰ কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্ধ্বলোকে।

যাদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের রাজগদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্‌স্‌। সেই পলিটিক্‌স্‌ যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিসন্ধি উভয় ব্যাপারই বহুতাম্বে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিস্তৃত ইংরেজি ভাষা— কখনো অমুনয়ের করুণ কাকলি, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্ভ বাগ্‌বাত্যা বাহুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে বিচিত্র বাস্পলীলা-রচনায় নিযুক্ত তখন দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্ছে মরছে, চাষ করছে, কাপড় বুনছে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার খাপদ-মানুষের আহাৰ জোগাচ্ছে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছে, মাতৃভাষায় কাঁদছে হাসছে, আর মাথার উপর অপমানের মুঘলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে বসছে 'অদৃষ্ট'। দেশের সেই পোলিটিশান্‌ আর দেশের সর্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

কালান্তর

সেই পলিটিক্‌স্ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বলভের কাছ থেকে মুখ ফেরায়। বলছে, 'কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী।' তখন ছিল পূর্বরাগ ও অভিসার, এখন চলেছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেন 'চাই', আজ তেমনি জোরেই বলছি 'চাই নে'। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাগী জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ, এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু 'চাই নে, চাই নে' বলবার হুংকারেই গলার জোর, গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু 'চাই' জুড়ি তার আওয়াজ বড়ো মিছি। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি ভদ্র-সমাজের পোলিটিকাল বারোয়ারি জমিয়ে তুলতেই তা কুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে সেটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্তে। অর্থাৎ, আমাদের আধুনিক পলিটিক্‌সের শুরু থেকেই আমরা নিগুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিক্রপাধিক প্রেমচর্চার অর্থ যারা জোগান তাঁদের কারও বা আছে জমিদারি, কারও বা আছে কারখানা; আর শব্দ যারা জোগান তাঁরা আইনব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাগী কোনো জায়গাতেই নেই; অর্থাৎ আমরা থাকে দেশ বলি, সেই প্রতাপাদিত্যের প্রতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন— কি শব্দসম্বলে, কি অর্থ-সম্বলে। যদি দেওয়ানি অবাধ্যতা চলত তা হলে তাদের ডাকতে হত বটে, সে কেবল খাওয়া বন্ধ করে মরবার জন্তে; আর যাদের অশু-ভক্য-ধনুগুণ তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে হরতাল করার জন্তে, উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিকাল বাকা ভল্লীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে দেখাবার উদ্দেশ্যে।

রায়তের কথা

এই কারণেই রায়তের কথাটা মূলতবিই থেকে যায়। আগে পাতা হোক সিংহাসন, গড়া হোক মুকুট, খাড়া হোক রাজদণ্ড, ম্যাফেটার পুরুক কোপনি— তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ, দেশের পলিটিক্‌স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই শুরুতেই পলিটিক্‌সের সাজ-করমাশের ধুম পড়ে গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে-ছেটে বদলে জুড়ে যে সাজ বানিয়েছে ঠিক সেই নমুনাটা দর্জির দোকানে চালান করলেই হবে। সাজের নামও জানি— একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সস্ত-মুখস্থ— কেননা আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লেমেন্ট, কানাডা অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি, এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা গায়ের মাপ নেবার জন্যে মানুষকে সামনে রাখবার বালাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কটকে ভোগ করবার জন্যেই বলে থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে তারা। পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের মানুষ নিজের প্রকৃতি শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্তনার আপনাই আপনার স্বরাজ গড়ে তুলেছে; জগতে আমরাই কেবল পশ্চিমকার কোনো-একটি আসন্ন পরমা-জাহুরারিতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে হোক সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, ছুঁতুক আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিশের পেয়াদা আছে, গলার-ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাকসো, আর আছে ওকালতির দংষ্ট্রাকরাল সর্বস্বলোলুপ আদালত।

এই-সব কারণে আমাদের পলিটিক্‌সে তোমার 'রায়তের কথা'

কালান্তর

স্থানকালপাত্ৰোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি ছোঁবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না; শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে ছোঁবার উদ্যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও সে দানা পেল কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে তোমাকে বলতে পারে 'আগে গাড়ি টানাও, তা হলেই অমুক গুপ্ত লগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই— তার পরে পৌঁছবা মাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে' ? তোমার জানা উচিত ছিল, হাল আমলের পলিটিক্‌সে টাইম্‌টেব্ল্‌ তৈরি, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে বসাই প্রধান কর্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্লের দোষ নয়; ঘোড়াটা চললেই হিসেব ঠিক মিলে যেত। তুমি তর্কিক; এত বড়ো উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও, ঘোড়াটা যে চলে না বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাশানের সাবধানী মানুষ, আশ্চাব্যের খবরটা আগে চাও। এ দিকে হাল ফ্যাশানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে বসে অস্থিরভাবে পা ঘষছে; ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলছে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরি কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব-আগে দরকার গাড়িতে চড়ে বসা। তোমার 'রায়তের কথা' সেই ঘোড়ার কথা, যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, বর্তমান কালে এক দল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে শুরু করেছেন। সব-আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজির

রায়তের কথা

পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গারে ছাপ মারা আছে 'Made in Europe'। যুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম্, কমিউনিজম্, সিঙ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনের পরধ করছে। কিন্তু আমরা যখন বলি 'রায়তের ভালো করব', তখন যুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাকুরের মতো কণকণুর সাহিত্য গন্ধিরে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক-একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলছে, 'পিনে ফেলো, দলে ফেলো।' অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক। যেন অবর্জস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বোয়ের দল বলছে, শান্তিডিকুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা নিরাপদ হবে! ভুলে যায় যে, মরা শান্তিডির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শান্তিডিতর শান্তিডিতম করে তুলতে দেয়ি করে না। আমাদের দেশের শান্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে ম'লেই সববন্ধন ছেদন করা যায় না— স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। যুরোপের স্বভাবটা মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে— তাদের সে সয় সয় না, তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

এক দিন ইংরেজের নকল করে আমাদের ছেঁড়া পলিটিক্‌স্ নিয়ে পার্লামেন্টীয় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সে দিন পলিটিক্‌সের আদর্শটাই যুরোপের অন্ত সব-কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন যুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেছে তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবাল্ডির স্মরণটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের

কালান্তর

পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তরকাণ্ডে আছে কুম্ভখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরানীকে বিসর্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এল প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়; এখনকার গান, ইয়ারতের বিরুদ্ধে আভিনার জয়। ইদানিং পশ্চিমে বলশেভিজ্‌ম্, ফাসিজ্‌ম্ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডামিত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে। বরাহ-অবতার পঙ্কনিমগ্ন ধরাতলকে দাঁতের ঠেলার উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অবকাশও নেই, সাহসও নেই যে, গৌয়ার্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিন্তাবৃত্তির মধ্যে। সেইজন্মেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জ্বর-তন্ত্র ও বলশেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া। পূর্বে যে ফোড়াটা বা হাতে ছিল আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে দিয়ে যদি তাও বনুত্য করা যায়, তা হলে সেটাকে বলতেই হবে পাগলামি। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক-এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে গিয়ে তাদের পাগলামি দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি নকল পাগলামি চেপে বসে অন্ত লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে ‘মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে’, তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ

রায়তের কথা

নকলনৈপুণ্যের নাট্য, মাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-
পা ছোড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এইজন্তে হঠাৎ মনে হতে পারে, আমি বুঝি
নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোব দেওয়া যায়
না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে
বুद्धি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই बुद्धি; অর্থাৎ
কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ
যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেঁচা সফল হয় তবে কাল তারাই
বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু
দাতনখের ব্যৱহারটা কিছুমাত্র বৈফল্য ধরনের হবে না। আজ অধিকার
কাড়বার বেলা তারা যে-সব উচ্চ-অঙ্গের কথা বলে তাতে বোঝা যায়,
তাদের 'নামে রুচি' আছে; কিন্তু কাল যখন 'জীবে দর'র দিন আসবে
তখন দেখব, আমিবের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাকলা। কারণ, নামটা
হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব, দেশের চিত্তবৃত্তির
মাটিতে আজ যে জমিদার দেখা দিয়েছে সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়,
তা হলে তাকে দ'লে ফেললেও সেই মরা গাছের সারে দ্বিতীয় দফা
কাঁটাগাছের শ্রীবুদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটি বদল হল না তো।

আমার ভয়গত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা
আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার
অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার প্রহর একান্ত
অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোক; সে প্যারাসাইট, পরাপ্রিত
জীব। আমরা পরিশ্রম না ক'রে, উপার্জন না ক'রে, কোনো বর্ধাধ
দায়িত্ব গ্রহণ না ক'রে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে

কালান্তর

অলস করে তুলি। যারা বীর্ষের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমরা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে। ‘রায়তের কথা’য় পুরাতন দণ্ডের ঘেঁটে তুমি সেই সুখস্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেছ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এ দিকে রাজার নিমক খাচ্ছি; রায়তদের বলছি ‘প্রজা’, তারা আমাদের বলছে ‘রাজা’— মস্ত একটা কাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়? কিন্তু, কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম থাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জেঁকের চেয়ে ছিনে জেঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারই হওয়া উচিত যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু, বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে তা হলে যার বইয়ের শেল্ফ আছে, বুদ্ধিবিজ্ঞা নেই, সে যে বই কিনবে না এমন ব্যবস্থা কী করে করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্ফ বুদ্ধির চেয়ে অনেক শুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্ফের থাকে, বৃদ্ধিমানের ভেঙ্গে নয়। সন্ন্যাসীর বরণপুত্র যে ছবি রচনা করে লক্ষীর বরণপুত্র তাকে দখল করে বসে।

রায়তের কথা

অধিকার আছে ব'লে নয়, ব্যাঙ্কে টাকা আছে ব'লে। যাদের যেজাজ কড়া, সঞ্চল কম, এ অবস্থায় তারা খাশা হয়ে ওঠে। বলে, 'যারো টাকাওরালাকে, কাড়ো ছবি।' কিন্তু, চিত্রকরের পেটের দায় যত দিন আছে, ছবি যত দিন বাজারে আসতে বাধা, তত দিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষির সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্পবহু হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াআলের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে জাঁতার ছুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ত আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের হস্ত-সমাসে তা আর চেক না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে বাধা করেছি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কাগ্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারত পাবে কি না সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীলচাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের কাঁসে ফেলে প্রজার জমি

কালান্তর

আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েছে। নিষেধ-আইনের বাধ যদি সে দিন না থাকত তা হলে নীলের বস্তার রায়তি জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মংলব এদের কারও মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে করবার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ী এরা আজ নিযুক্ত আছে তার মুনফায় বিল্ব ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই-সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্ছে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অমুকুল খাল-ধনন কি রায়তের পক্ষে ভালো ?

মূল কথাটা এই— রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়তখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিত্তর দিয়ে ক্ষীণ হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অমুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছরূপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠতে থাকে। আমেরিকায় যেমন সুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড়ো বড়ো ব্যবসা দানবাকার হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোকুর গাড়িতে মাল তুলে হাটে বেচে

রায়তের কথা

এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অল্প চাবির সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু, যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে, গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যঙ্গসীমা প্রসারিত হতে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মূলকের মিথ্যা মকদ্দমা-পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জন-গর্জন শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোটো মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে— এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিরেই রায়ত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিত্তের অশুক করে নেওয়ারই মকদ্দমার জুজুংসু খেলা। আইনের যে আঘাত রায়তে আসে সেই আঘাতের দ্বারাই উন্টিয়ে যারা ওকালতি-কুস্তির মারাত্মক প্যাচ। এই কাজে বড়ো বড়ো পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ত যত দিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে তত দিন 'উচল' আইনও তার পক্ষে 'অগাধ জলে' পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সংক্রমে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্তব্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে বোলো-আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড়ো স্বাধীনতার অধিকার তারই যার শিশুবুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্বদা মোটর-চলাচল হয় সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুজুম; কিন্তু অত্যন্ত সাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার ঘেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশের মুচ রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?

কালান্তর

তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে তা বললুম ।

৫

আমি জানি, জমিদার নির্লোভ নয় । তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশি আটক পড়ে । আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সংকীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষে আয়ের উপায় । এও তেমনি । কিন্তু দেখতে দেখতে চাষির জমি সরে সরে মহাজনের হাতে পড়লে আথেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে বলে আনন্দ করবার কোনো হেতু নেই । চাষির পক্ষে জমিদারের যুষ্টির চেয়ে মহাজনের যুষ্টি অনেক বেশি কড়া— যদি তাও না মান এটা মানতে হবে, সেটা আর-একটা উপরি যুষ্টি ।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য । রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনার জমিদারের রাজস্ববৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা স্মারবিকল্প । তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা ; সুতরাং কেবল চাষি নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ । তা ছাড়া গাছ কাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুকুরিগাঁখনন প্রভৃতির অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না ।

কিন্তু এ-সব গেল খুচরো কথা । আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না । নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো-একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয় । তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খন্দরে নয়, কনুয়েসে তোট দেবার চার আনা-ক্রীত অধিকারে নয় । পল্লীর

রায়তের কথা

মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে সেটা হবে সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছু কাল থেকে ভাবছি। ভালো জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানি নে— জবাব তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুঁচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে। নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে ; যার জন্তে এত জোড়াতাড়া সে তত কাল পর্যন্ত টিকবে কি না সন্দেহ।

আষাঢ় ১৩৩৩

বৃহত্তর ভারত

বৃহত্তর-ভারত-পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিদায়সম্বন্ধে উপলক্ষে

বর্ষাষীপ যাবার পূর্বাঙ্কে যে অভিনন্দন আপনারা আমাকে দিলেন তাতে আমার মনে বল সঞ্চার করবে। আমরা চার দিকের দাবির দ্বারা আমাদের প্রাণশক্তি আবিষ্কার করি। যার যা দেবার তা বাইরের নেবার ইচ্ছা থেকে আমরা দিতে সক্ষম হই। দাবির আকর্ষণ যদি থাকে তবে আপনি সহজ হয়ে যান দেওয়ার পথ।

বাইরে যেখানে দাবি সত্য হয়, অন্তরে সেখানেই দানের শক্তি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। দানের সামগ্রী আমাদের থাকলেও আমরা দিতে পারি নে, সমাজে যত ক্ষণ প্রত্যাশা না সঙ্গীত হয়ে ওঠে। আজ একটা আকাজকা আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে আকাজকা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো করে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাজকাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে। সেই আকাজকাই আপন প্রত্যাশা নিয়ে আমাকে অভিনন্দন করছে। এই প্রত্যাশা আমার চেষ্টাকে সার্থক করুক।

বর্ষরাজ্যাতীর মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, তার আয়বোধ সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। তার চৈতন্যের আলো উপস্থিত কাল ও বর্তমান অবস্থার ঘেরটুকুকেই আলোকিত করে রাখে বলে সে আপনাকে তার চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রে জানে না। এইজন্মেই জানে কর্মে সে দুর্বল। সংস্কৃত শ্লোকে বলে, যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌছয় না, এবং অতি ক্ষীণ আশা ও অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধি নিয়ে অকৃতার্থ হতে হয়।

বৃহত্তর ভারত

নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সত্য জাতির ইতিহাসগত চেষ্টা, নিজের পরিচয়কে সংকীর্ণ দেশকালের ভূমিকা থেকে মুক্তিদানই হচ্ছে এই চেষ্টার লক্ষ্য।

যখন বালক ছিলাম ঘরের কোণের বাতায়নে ব'সে দেশের প্রাকৃতিক রূপকে অতি ছোটো পরিধির মধ্যেই দেখেছি। বাইরের দিক থেকে দেশের এমন কোনো মূর্তি দেখি নি যার মধ্যে দেশের বাপক আবির্ভাব আছে। বিদেশী বণিকের হাতে গড়া কলকাতা শহরের মধ্যে ভারতের এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না যা স্মৃগতীর ও স্মৃদূরবিস্তৃত। সেই শিশুকালে কোণের মধ্যে অত্যন্ত বেশি অবরুদ্ধ ছিলাম বলেই ভারত-বর্ষের বৃহৎ স্বরূপ চোখে দেখবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

এমন সময়ে আমার আট-নয় বছর বয়সে গঙ্গাতীরের এক বাগানে কিছু কালের জন্যে বাস করতে গিয়েছিলাম। গঙ্গার আনন্দ পেলাম। গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ, বহু কাল ও বহু চিন্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের একটি পরিচয়-বাণী আছে। হিমালয়ের স্বরূপ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকালক্রমাগত জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

তার পর আর কয়েক বৎসর পরেই পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয় পর্বতে নিয়ে যান। আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের, যা এক দিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিস্তৃত চিন্তার পূজার কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল, যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।

কালান্তর

তার পর অল্প বয়সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে শুরু করলাম। তখন আলেকজান্ডার থেকে আরম্ভ করে ক্লাইভের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষ বারবার কিরকম পরাস্ত অপমানিত হয়ে এসেছে এই কাহিনীই দিন ক্ষণ তারিখ ও নামমালা সমেত প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করেছি। এই অগৌরবের ইতিহাসমুখে রাজপুত্রদের বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত। সকলেই জানেন, সে সময়কার বাংলা কাব্য নাটক উপন্যাস কিরকম দুঃসহ ব্যগ্রতায় টাডের রাজস্থান দোহন করতে বসেছিল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দেশের মধ্যে আমাদের পরিচয়-কামনা কিরকম উপবাসী হয়ে ছিল। দেশ বলতে কেবল তো মাটির দেশ নয়, সে যে মানবচরিত্রের দেশ। দেশের বাহ্য প্রকৃতি আমাদের দেহটা গড়ে বটে, কিন্তু আমাদের মানবচরিত্রের দেশ থেকেই প্রেরণা পেয়ে আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই দেশটাকে যদি আমরা দীন বলে জানি তা হলে বিদেশী বীর জাতির ইতিহাস পড়ে আমাদের দীনতাকে তাড়াবার শক্তি অন্তরের মধ্যে পাই নে।

ঘরের কোণে আবছা থেকে ভারতের দৃশ্যরূপটাকে বড়ো করে দেখবার পিপাসা যেমন মনের মধ্যে প্রবল হয়েছিল, তেমনি তখনকার পাঠ্য ভারত-ইতিহাসের অগৌরব-অধ্যায়ের অঙ্ককার কোণের মধ্যে বসে বসে ভারতের চারিত্রিক মহিমার বৃহৎ পরিচয় পাবার অল্প মনের মধ্যে একটা ক্ষুধার পীড়ন ছিল। বস্তুত এই অসহ ক্ষুধাই আমাদের মনকে তখন নানা হাস্তকর অত্যাঙ্কি ও অবাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির স্বপ্নমূলক উপকরণ-রচনার প্রবৃত্তি করেছিল। আজও সেদিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলতে পারি নে।

যে তারার আলো নিবে গেছে নিজের মধ্যেই সে সংকুচিত। নিজের মধ্যে একান্ত বদ্ধ থাকবার বাধ্যতাকেই বলে দৈন্ত। এই দৈন্তের গণ্ডির

বৃহত্তর ভারত

মধ্যেও তার প্রতি-মূর্ত-গত কাজ হয়তো কিছু আছে, কিন্তু উদার নক্সত্রমণ্ডলীর সত্য তার সন্মানের স্থান নেই। সে অজ্ঞাত, অখ্যাত, পরিচয়হীন। এই অপরিচয়ের অবমাননাই কারাবাগের মতো, এর থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় আলোকের দ্বারা। অর্থাৎ, এমন কোনো প্রকাশের দ্বারা যাতে ক'রে বিশ্বের সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে, এমন সত্যের দ্বারা যা নিখিলের আদরণীয়।

আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে, যিনি নিজের মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ, অহংসীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়। ব্যক্তিগত মানুষের জীবনের সাধনায় এ যেমন একটা বড়ো কথা, দেশের ঐতিহাসিক সাধনাতেও সেই রকম। কোনো মহাজাতি কী করে আপনাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে পারে এই তপস্শাই তার তপস্শা। যে পারলে না বিধাতা তাকে বর্জন করলেন। মানব-সত্যতার সৃষ্টিকার্ষে তার স্থান হল না। রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে। সে তখন শুধু গাছের কোটরে নিজের খাওয়াবেষণে না থেকে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েই ছুই তটভূমির বিচ্ছেদসমুদ্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম; সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুলক্ষ্মী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রকৃত খাওয়াবেষণের ঐখর্ষ নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন। প্রত্যেক মহাজাতির পিঠে আমরা সেই চিহ্ন দেখতে চাই, সেই চিহ্নের দ্বারাই সে আপন কোটরকোণের অতীত

কালান্তর

নিত্যলোকে স্থান লাভ করে ।

ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয় । ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা— সৈন্ত দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয় । গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করে নি ।

আমাদের দেশেও দিগ্বিজয়ের পতাকা হাতে পরজাতির দেশ জয় করবার কীর্তি হয়তো সে কালে অনেকে লাভ করে থাকবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অত্র দেশের মতো ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করে না । বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয় নি ।

অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে সেই বিনাশ পায় । সকল দুঃখ সকল পাপের মূল এই অহমিকায় । বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়, এই সত্যটি আত্মার আলোক । এই আলোকদীপ্তি ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারে নি । এই আলোকের আভাতেই ভারত আপন ভূখণ্ডসীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল । সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয় । এই পরিচয়ের আলোকেই যদি নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তা হলেই আমরা ধন্ত ! আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি সে এই মুক্তিযুদ্ধের ভারতবর্ষে, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষে । এই কথাটি যদি ধ্রুব করে মনে রাখতে পারি তা হলে আমাদের সকল কর্ম বিগুঢ় হবে, তা হলে আমরা নিজেকে বিশেষ করে ভারতবাসী বলতে পারব, সেজন্যে আমাদের মতুন করে ধ্বজা নির্মাণ করতে হবে না ।

ক্ষুধা হলেই মানুষ অন্নের স্বপ্ন দেখে । আজকাল আমাদের দেশে

বৃহত্তর ভারত

পোলিটিক্যাল আয়ুপরিচয়ের কুখ্যাটাই নানা কারণে সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। এইজন্তে নিরন্তর তারই ভোজটাই স্বপ্নে দেখছি। তার চেয়ে বড়ো কথাগুলিকেও অপ্রাসঙ্গিক বলে উপেক্ষা করবার তর্জন আজকাল প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু এই পোলিটিক্যাল আয়ুপরিচয়ের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিদেশী ইতিহাসে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সেই ব্যগ্রতার তাড়নায় আপনাকে স্বপ্নে-গড়া ম্যাট্রিসিনি, স্বপ্নে-গড়া গারিবাল্‌ডি, কাল্পনিক ওয়াশিংটন বলে ভাবনা করতে হয়। অর্ধতত্ত্বেও তাই; এখানে আমাদের কারও কারও কল্পনা বংশেভিজ্‌ম্, কারও সিঙিক্যালিজ্‌ম্, কারও বা সোস্যালিজ্‌ম্‌এর গোলোকধাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-সমস্তই মরীচিকার মতো, ভারতবর্ষের চিরকালীন জমির উপরে নেই— আমাদের দুর্ভাগ্যতাপদগ্ধ হাল আমলের তৃষার্ত দৃষ্টির উপরে স্বপ্ন রচনা করছে। এই স্বপ্ন-সিনেমার কোণে কোণে মাঝে মাঝে Made in Europe -এর মার্কী ঝলক ঘেরে এর কারখানাঘরের বৃত্তান্তটি জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

অজানা পথে অবাস্তবের পিছনে আমরা যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে অভিব্যক্তিবিস্বলতার মধ্যে আমাদের নিজের পরিচয় নেই। অথচ, পূর্বেই বলেছি, নিজের ব্যক্তিস্বরূপের সত্য পরিচয়ের ভিত্তির উপরেই আমরা সিদ্ধিকে গড়ে তুলতে পারি। পলিটিক্‌স্-ইকনমিক্‌সের বাইরেও আমাদের গৌরবলোক আছে, এ কথা যদি আমরা জানি তবে সেইখানেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বিশ্বাসহীনের মতো নিজের সত্যে অশ্রদ্ধা করে হাওয়ার হাওয়ায় আকাশকুম্ব চাষ করবার চেষ্টা করলে ফল পাব না।

ভারতবর্ষ যে কোন্‌খানে সত্য, নিজের লোহার সিদ্ধকের মধ্যে তার দলিল সে রেখে যায় নি। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার ছায়াই তার প্রকাশ। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয় নি তাতেই তার

কালান্তর

পরিচয়। অন্তর্কে সত্য ক'রে দিতে পারার মূলেই হচ্ছে অন্তর্কে আপন ক'রে উপলব্ধি। আপন সীমার বাধা যে ভাঙতে পেরেছে, বাইরের ছুর্গম ভৌগোলিক বাধাও সে লঙ্ঘন করতে পেরেছে। এইঅন্তর্কেই ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সূদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে ব'সে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ক'রে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম, দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি, এই যোগ উন্মত্ত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখস্বীকার ক'রে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয়, সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্য ভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায় নি ব'লে আমরা এ'কে অস্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এ'কে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সূদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতি দিনের ব্যবহারে জাপানির সূগভীর দৈর্ঘ্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বস্তু এক দিন ভারতবর্ষের ছুই কূল

বৃহত্তর ভারত

উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিনীতে আজ তা ভাঙ্গা নেমে আসছে, কিন্তু তার অলসকর আজও দূরের নানা অলশরে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জাঙ্গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের প্রব পরিচয় সেই-সব জাঙ্গাতেই।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মবিরোধ ঘটেছিল। সেই সময়ে ধারাবাহিক ভাবে সাধুসাধকদের জন্ম হয়েছিল— তাঁদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলেন— যারা আত্মীয়তার সত্যের দ্বারা ধর্ম-বিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বসেছিলেন। তাঁরা পোলিটিশান ছিলেন না, প্রয়োজনমূলক পোলিটিকাল ঐক্যকে তাঁরা সত্য ব'লে কল্পনাও করেন নি। তাঁরা একেবারে সেই গোড়ায় গিয়েছিলেন যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা প্রব। অর্থাৎ, তাঁরা ভারতের সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন যাতে আছে, যারা সকলকে আপনার মধ্যে এক ক'রে দেখে তারাই সত্য দেখে। তখনকার দিনের অনেক যোদ্ধা অনেক লড়াই করেছেন, বিদেশী-ছাঁচে-ঢালা ইতিহাসে তাঁদেরই নাম ও কীর্তি লিখিত হয়েছে। সে-সব যোদ্ধারা আজ তাঁদের কৃত কীর্তিস্তম্ভের ভগ্নশেষ ধূলিস্তূপের মধ্যে মিশিয়ে আছেন। কিন্তু আজও ভারতের প্রাণস্রোতের মধ্যে সেই-সকল সাধকের অমর বাণী-ধারা প্রবাহিত আছে; সেখান থেকে আমাদের প্রাণের প্রেরণা যদি আমরা নিতে পারি তা হলে তারই জোরে আমাদের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি কর্মনীতি সবই বল পেয়ে উঠতে পারে।

সত্যবাণী যখন আমাদের প্রাণকে গভীর ভাবে উদ্‌বোধিত করে তখন সেই প্রাণ সকল দিকেই নিজের প্রকাশকে সার্থক করে। তখন সেই প্রাণ সৃষ্টির উদ্‌গমে পূর্ণ হয়ে ওঠে। চিন্তের উপর সত্যের সংঘাতের প্রমাণ হচ্ছে এই সৃষ্টিশক্তির সচেতনতা।

কালান্তর

বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি তারই প্রবর্তনার গুহাগহ্বরে চৈতন্যবিহারে বিপুলশক্তিসাধ্য শিল্পকলা অপরিাপ্ত প্রকাশ পেয়ে গেছে তখন বুঝতে পারি, বৌদ্ধধর্ম মানুষের অসুরতম মনে এমন একটি সত্যবোধ জাগিয়েছে যা তার সমস্ত প্রকৃতিকে সফল করেছে, যা তার স্বভাবকে পশু করে নি। ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্পকলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্পসৃষ্টিমহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

অথচ সেখানকার লোকের সমজাতীয়দের দেখো, দেখবে, তারা নরঘাতক, তারা শিল্পসম্পদহীন। এমন-সকল নিরালোক চিত্তে আলো জ্বাললে দয়াধর্ম ত্যাগধর্ম মৈত্রীধর্মের মহতী বাণীর দ্বারা। সেখানকার লোকে সামান্ত বেশভূষা-ভাষার পরিবর্তনের দ্বারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে তা নয়; সৃষ্টি করবার স্পষ্ট শক্তি তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে— সে কী পরমাদ্ভুত সৃষ্টি! এই-সকল দ্বীপেরই আশে পাশে আরো তো অনেক দ্বীপ আছে। সেখানে আমরা ‘বরবুদর’ দেখি নে কেন? সে-সব জায়গায় ‘আঙ্করবট’এর সমতুল্য বা সমজাতীয় কিছু নেই কেন? সত্যের জাগরণমন্ত্র যে সেখানে পৌঁছায় নি। মানুষকে অমুকরণে প্রবৃত্ত করার মধ্যে গৌরব নেই, কিন্তু মানুষের স্পষ্ট শক্তিকে যুক্তিদান করার মতো এত বড়ো গৌরবের কথা আর কি কিছু আছে?

লোকে যখন দরিদ্র হয় তখন বাইরের দিকে গৌরব খুঁজে বেড়ায়। তখন কথা ব’লে গৌরব করতে চায়, তখন পুঁথি থেকে শ্লোক খুঁটে খুঁটে গৌরবের মালমসলা ভগ্নস্তুপ থেকে সঞ্চয় করতে থাকে। এমনি করে সত্যকে ব্যবহার থেকে দূরে রেখে যদি গলার জোরে পুরাতন গৌরবের বড়াই করতে বসি তবে আমাদের শিক্। অহংকার করবার জন্যে সত্যের ব্যবহার সত্যের অবমাননা। আমার মনের একান্ত প্রার্থনা

বৃহত্তর ভারত

এই যে— সত্যবাণীকে কাঁধে ঝুলিয়ে জয়ঢাক ক'রে তাকে যেন বাজিয়ে না বেড়াই, বাইরের লোককে চমক লাগাবার জন্তে যেন তাকে অলংকার যাত্রা না করি, যেন নিজেরই একান্ত আন্তরিক প্রয়োজনের জন্তেই তার সন্ধান ও সাধনা করতে পারি।

জাভায় যখন যাব তখন মনকে অহংকারমুক্ত ক'রে সত্যের অমৃত-মস্তুর ক্রিয়াটি দেখে যেন নম্র হতে পারি। সেই মৈত্রীর মহামন্ত্রটি নিজের মধ্যেই পাওয়া চাই, তা হলেই আমার চিন্তে যেখানে অরণ্য সেখানে মন্দির উঠবে, যেখানে মরুভূমি সেখানে সৌন্দর্যের রসবৃষ্টি হবে, জীবনের তপস্বী জয়যুক্ত হয়ে সার্থক হয়ে উঠবে।

শ্রাবণ ১৩৩৪

হিন্দু মুসলমান

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

ঘোর বাদল নেমেছে। তাই আমার মনটা মানব-ইতিহাসের শতাব্দীচিহ্নিত বেড়ার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে। আকাশ-রক্তভূমিতে জলবাতাসের মাতনের যুগযুগান্তরবাহিত স্মৃতিস্পন্দন আজ আমার শিরায় শিরায় মেঘমল্লারের মীড় লাগিয়েছে। আমার কর্তব্য-বুদ্ধি কোথায় ভেসে গেল, সম্প্রতি আমি আমার সামনেকার ঐ সারবন্দী শালতাল-মহুয়াছাতিমের দলে ভিড়ে গেছি। প্রাণরাজ্যে ওদের হল বনেদি বংশ, ওরা কোন্ আদিকালের রৌদ্রবৃষ্টির উত্তরাধিকার পুরোপুরি ভোগ করে চলেছে। ওরা মানুষের মতো আধুনিক নয়, সেইজন্মে ওরা চিরনবীন। মানবজাতির মধ্যে কেবল কবিরাই সভ্যতার অপবায়ের চোটে তাদের আদিকালের উত্তরাধিকার একেবারে ফুঁকে দিয়ে বসে নি। তাই তরুলতার আভিজাত্য কবিদের নিতান্ত মানুষ বলে অবজ্ঞা করে না। এইজন্মেই বর্ষে বর্ষে বর্ষার সময় আমাকে এমন করে উত্তলা করে দেয়, আমাকে সকল দায়িত্ববন্ধন থেকে বিবাগি ক'রে প্রাণের খেলাঘরে ডাকতে থাকে— আমাদের মর্মের মধ্যে যে ছেলেমানুষ আছে, যে হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে প্রাচীন পূর্বজ, সেই আমার কর্মশালাটি দখল করে বসে। সেইজন্মেই বর্ষা প'ড়ে অবধি আমি হাওয়ার সঙ্গে, বৃষ্টির সঙ্গে, গাছপালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বসে গেছি; কাজকর্ম ছেড়ে গান তৈরি করছি— সেই সূত্রে মানুষের মধ্যে আমি সব চেয়ে কম মানুষ হয়েছি— আমার মন ঘাসের মতো কাঁপছে, পাতার মতো ঝিল্মিল্

হিন্দুমুসলমান

করছে। কালিদাস এই উপলক্ষ্যেই বলেছিলেন : মেঘালোকে ভবতি
সুধিনোহপ্যন্তথাবৃষ্টিচেতঃ। অন্তথাবৃষ্টি হচ্ছে মানববৃষ্টির গণ্ডির
বাইরের বৃষ্টি। এই বৃষ্টি আমাদের সেই সুদূর কালে নিয়ে যায় যখন
প্রাণের খেলা চলছে, মনের মাস্টারি শুরু হয় নি—আজ যেখানে
ইকুলের মোটা খাম উঠেছে সেখানে যখন ঘাসের ফুলে ফুলে প্রজাপতি
উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাই হোক, এই সময়টাতে ঘন মেঘে মধ্যাহ্ন
ছায়াবৃত, মাঠে মাঠে বাদল-হাওয়া তেঁগু বাজিরে চলেছে, আর
ছোটো ছোটো চঞ্চল জলধারা ইস্কুলছাড়া ছাত্রীদের অকারণ হাসির
মতো চার দিকে খিলখিলু করছে। আজ ৭ই আষাঢ়, কৃষ্ণা একাদশী
তিথি, আজ অষুবাচী আরম্ভ হল। নামটা সার্থক হয়েছে, সমস্ত প্রকৃতি
আজ জলের ভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ঘন মেঘের চক্ৰাতপের ছায়ায়
আজ অষুবাচীর গীতিকবিতার আসর বসেছে ; তৃণসভার গায়নের দল
ঝিল্লিরাও নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মস্তদাছুরি।
এ আসরে আমার আসন পড়ে নি যে তা মনেও কোরো না। মেঘের
ডাকের জবাব না দিয়ে চূপ ক'রে যাব, আমি এমন পাত্র নই।
মেঘের পর মেঘের মতো আমারও গান চলেছে দিনের পর দিন ;
তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই ; মেঘ যেমন 'ধূমজ্যোতিঃ-
সলিলমক্ৰতাং সন্নিপাতঃ', সেও তেমনি নিরর্থক উপাদানে তৈরি।

ঠিক যখন আমার জানলার ধারে বসে গুণনধরনিত্তে গান ধরেছি—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে

আমার মনে,

আমার ভাবনা যত উত্তল হল

অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-
মুসলমান-সমস্যার সমাধান কী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মানবসংসারে

কালান্তর

আমার কাজ আছে— শুধু মেঘমল্লারে মেঘের ডাকের জবাব দিয়ে চলবে না, মানব-ইতিহাসের যে-সমস্ত মেঘমল্ল প্রক্লাবলী আছে তারও উত্তর ভাবতে হবে। তাই অধুবাচীর আগর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হল।

পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অত্র সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যাগ্ৰ— সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অত্র ধর্মকে সংহার করতে উদ্ভূত। এইজন্তে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অত্র কোনো উপায় নেই। খৃস্টানধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে, তারা আধুনিক যুগের বাহন ; তাদের মন মধ্যযুগের গভীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই। এইজন্তে অপরধর্মাবলম্বীদেরকে তারা ধর্মের বেড়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বাধা দেয় না। যুরোপীয় আর খৃস্টান এই দুটো শব্দ একার্থক নয়। ‘যুরোপীয় বৌদ্ধ’ বা ‘যুরোপীয় মুসলমান’ শব্দের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা নেই। কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। ‘মুসলমান বৌদ্ধ’ বা ‘মুসলমান খৃস্টান’ শব্দ স্বতই অসম্ভব। অপর পক্ষে হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে, অত্র ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সর্কর্মক নয়— অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non-co operation। হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচারমূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমানধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহায়ে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু

হিন্দু-মুসলমান

• মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারে নি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্ত-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে— ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার বন্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু' যুগের পূর্ববর্তী কালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ— এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টিতভাবে পাকা করে রাখা হয়েছিল। চূর্ণভব্য আচারের প্রাকার তুলে এঁকে ছুপ্রবেশ ক'রে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ ক'রে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। বাই হোক, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেরদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিবেদন এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও নৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মতো মানুষ দ্বারা আচারে

কালান্তর

স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্তা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। যুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন ক'রে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে ষাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতোভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এ কথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই, কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেড়িয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেড়িয়ে আসব; যদি না আসি তবে, নান্তঃ পন্থা বিস্তৃত্তে অন্নায়। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৯।

শ্রাবণ ১৩২৯

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে ধারা সত্যের ব্রত গ্রহণ করবার অধিকারী, এবং সেই ব্রতকে প্রাণ দিয়ে ধারা পালন করবার শক্তি রাখেন, তাঁদের সংখ্যা অল্প বলেই দেশের এত দুর্গতি। এমন চিত্তদৈন্ত্র যেখানে সেখানে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো অত বড়ো বীরের এমন মৃত্যু যে কতদূর শোকাবহ তার বর্ণনায় প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে একটি কথা এই আছে যে, তাঁর মৃত্যু যতই শোচনীয় হোক, সে মৃত্যুতে তাঁর প্রাণ, তাঁর চরিত্রে ততই মহীয়ান হয়েছে। বারে বারে ইতিহাসে দেখা যায়, নিজের সমস্ত দিয়ে ধারা কল্যাণব্রতকে গ্রহণ করেছেন, অপমান ও অপমৃত্যু তাঁদের লগাটে জ্বরতিলক এমনি করেই এঁকেছে। মহাপুরুষরা আসেন প্রাণকে মৃত্যুর উপরেও জয়ী করতে, সত্যকে জীবনের সামগ্রী করে তুলতে। আমাদের খাঙ্গদ্রব্যো প্রাণ দেবার যা উপকরণ রয়েছে তা বায়ুতে আছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেও আছে। কিন্তু, যত ক্ষণ তা উদ্ভিদে প্রাণীতে জৈব-আকার না ধারণ করে তত ক্ষণ প্রাণের পুষ্টি হয় না। সত্য সত্যকেও সে কথা খাটে। শুধুমাত্র বাক্যের হাওয়া থেকে আকর্ষণ করে নিয়ে তাকে জীবনগত করবার শক্তি ক'জনাই বা আছে? সত্যকে জানে অনেক লোকে, তাকে মানে সেই মানুষ যে বিশেষ শক্তিমান। প্রাণ দিয়ে তাকে মানার দ্বারাই সত্যকে আমরা সকল মানুষের করে দিই। এই মানতে পারার শক্তিটাই মস্ত জিনিস। এই শক্তির সম্পদ ধারা সমাজকে দেন তাঁদের দান মহামূল্য। সত্যের প্রতি সেই নির্ভার আদর্শ শ্রদ্ধানন্দ এই দুর্বল দেশকে দিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা-পরিচয়ের উপযোগী যে নাম তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই নাম তাঁর সার্থক। সত্যকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন। এই শ্রদ্ধার মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আছে। সেই শক্তির

কালান্তর

যারা তাঁর সাধনাকে রূপমূর্তি দিয়ে তাকে তিনি সজীব করে গেছেন। তাই তাঁর মৃত্যুও আলোকের মতো হয়ে উঠে তাঁর শ্রদ্ধার সেই ভয়হীন কয়লীন ক্লাস্তিহীন অমৃতছবিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধার এই ভূমানন্দকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে আজ আমরা যেন সার্থক আকারে দেখতে পারি। এই সার্থকতা বাহ্য ফলে নয়, নিজেরই অকৃত্রিম বাস্তবতার।

অপঘাতের এই-যে আঘাত শুধু মহাপুরুষেরাই একে সহ করতে পারেন, শুধু তাঁদের পক্ষেই এর কোনো অর্থ নেই। যারা মরণকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্ব তুলতে পেরেছেন, জীবন থাকতেই তাঁরা অমৃতলোকে উত্তীর্ণ। কিন্তু, মৃত্যুর গুপ্তচর তো শ্রদ্ধানন্দের আয়ু হরণ করেই ফিরে যাবে না। ধর্মবিদ্ভোহী ধর্মান্তার কাঁধে চড়ে রক্তকলুষিত যে বীভৎসতাকে নগরের পথে পথে সে বিস্তার করেছিল অনতিকাল পূর্বেই, সে তো আমরা দেখেছি। সে যাদের নষ্ট করেছে তাদের তো কিছুই অবশেষ থাকে নি। তাদের মৃত্যু যে নিরতিশয় মৃত্যু, তাদের কতি যে চরম কতি।

তাদের ঘরে সন্তানহীন মাতার ক্রন্দনে সাঙ্গনা নেই, বিধবার দুঃখে শান্তি নেই। এই-যে নির্ধুরতা যা সমস্তকে নিঃশেষে চিতাভস্মে সমাধা করে, তাকে তো সহ করতে পারা যায় না। দুর্বল স্বল্পপ্রাণ যারা, যাদের জনসাধারণ বলি, তারা এত বড়ো হিংসার বোঝা বহবে কী করে? এখন দেখতে পাচ্ছি, আবার যমরাজের সিংহাসন উদ্ঘাটিত হল, আবার প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে হত্যার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এর দুঃখ সহাবে কে?

বিধাতা যখন দুঃখকে আমাদের কাছে পাঠান তখন সে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে। সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা আমাকে কী ভাবে গ্রহণ করবে। বিপদ আসবে না এমন হতে পারে না— সংকটের সময়

শ্যামী শ্রদ্ধানন্দ

উপস্থিত হয়, আশু উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু কী ভাবে বিপদকে আমরা ব্যবহার করি তারই উপরে প্রব্লেম সলুশ্বর নির্ভর করে। এই-যে পাপ কালো হয়ে দেখা দিল, এর ভয়ে ভীত হব না এর কাছে মাথা নত করব? না সে পাপের বিরুদ্ধে পাপকে দাঁড় করাব? মৃত্যুর আঘাত, দুঃখের আঘাতের উপর রিপূর উন্নততাকে আশ্রিত করব? শিশুর আচরণে দেখা যায়, সে যখন আছাড় খায় তখন মেজেকে আঘাত করতে থাকে। যতই আঘাত করে মেজে ততই সে আঘাত ফিরিয়ে দেয়। এ শিশুর ধর্ম। কিন্তু, যদি কোনো বয়স্ক লোক হেঁচট খায় তবে সে চিন্তা করে, বাধাটা কোথায়— বাধা যদি থাকে তো সেটা লঙ্ঘন বা সেটাকে অপসারণ করতে হবে। সচরাচর দেখতে পাই বাহির থেকে আকস্মিক আঘাতের চমকে মানুষের শিশুবুদ্ধি ফিরে আসে। সে তখন মনে করে, ধৈর্য অবলম্বন করাই কাপুরুষতা, ক্রোধের প্রকাশ পৌরুষ। আজকের দিনে স্বভাবতই ক্রোধের উদয় হয়ে থাকবে, সে কথা স্বীকার করি। মানবধর্ম তো একেবারে ছাড়তে পারি নে। কিন্তু ক্রোধ দ্বারা যদি অভিভূত হই তবে সেও মানবধর্ম নয়। আশুন লেগে পাড়া যদি নিরুপায়ের ভয় হয়ে যায় তবে আশুনের রুদ্রতা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তখন যদি দোষ কাউকে দিতে হয় তো আশুনকে যেন না দিই। বিপদের কারণ সর্বত্রই থাকে, তার প্রতিকারের উপায় যারা রাখে না তারাই দোষী। যাদের ঘর পুড়েছে তারা যদি বলতে পারে যে 'কুপ খনন করে রাখি নি সেই অপরাধের শাস্তি পেলেম', তা হলে ভবিষ্যতে তাদের ঘর পোড়ার আশঙ্কা কমে। আমাদেরও আজকে তাই বলতে হবে। অপরাধের গোড়ার কথাটা ভাবা চাই। শুনে হয়তো লোকে বলবে, না, এ তো ভালো লাগছে না; একটা প্রলয়-ব্যাপার বাধিয়ে দিতে পারলে সাঙ্ঘনা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি

কালান্তর

ভাবি, মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে স্রবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড়ো অমঙ্গল, বড়ো দুর্গতি ঘটে, যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে অথচ পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ নেই অথবা সে সঙ্ঘর্ষ বিকৃত। বিদেশীর রাজ্যে রাজপুরুষদের সঙ্গে আমাদের একটা বাহ্য যোগ থাকে, অথচ আন্তরিক সঙ্ঘর্ষ থাকে না। বিদেশীয় রাজ্যে এইটেই আমাদের সব চেয়ে পীড়া দেয়। গায়ের-পড়া যোগটা দুর্বলতা ও অপমান আনে। বিদেশী শাসন সম্পর্কে যদি এ কথা খাটে তবে স্বদেশীয়দের সঙ্ঘর্ষে সে আরো কত সত্য। এক দেশে পাশাপাশি থাকতে হবে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়তার সঙ্ঘর্ষ থাকবে না, হয়তো বা প্রয়োজনের থাকতে পারে— সেইখানেই যে ছিদ্র— ছিদ্র নয়, কলির সিংহদার। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যেখানে এতখানি ব্যবধান সেখানেই আকাশ ভেদ করে ওঠে অমঙ্গলের জয়তোরণ। আমাদের দেশে কল্যাণের রথযাত্রায় যখনই সকলে মিলে টানতে চেষ্টা করা হয়েছে, কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টা দ্বারা, সে রথ কোথায় এসে থেমে যায়, ভেঙে পড়ে? যেখানে গর্তগুলো ইঁা ক'রে আছে হাজার বছর ধরে।

আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয় নি, বিরুদ্ধ ছিল। জননায়কেরা কেউ কেউ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ওদের একেবারে অস্বীকার করা যাক। জানি, ওরা যোগ দেয় নি। কিন্তু, কেন দেয় নি? তখন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এত প্রবল যোগ হয়েছিল যে সে আশ্চর্য। কিন্তু, এত বড়ো আবেগ শুধু হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল, মুসলমানসমাজকে স্পর্শ করল না! সে দিনও

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের শিক্ষা হয় নি । পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের ডোবাটাকে আমরা সমাজের দোহাই দিয়ে গভীর করে রেখেছি । সেটাকে রক্ষা করেও লাফ দিয়ে সেটা পার হতে হবে, এমন আবদার চলে না । এমন কথা উঠতে পারে যে, ডোবা তো সনাতন ডোবা, কিন্তু আজ তার মধ্যে যে ছুশিকিংশ বিল্ডাট ঘটছে সেটা তো নূতন, অতএব হাল-আমলের কোনো একটা ভূত আমাদের ঘাড় ভাঙবার গোপন ফন্দি করেছে ; ডোবার কোনো দোষ নেই, ওটা ব্রহ্মার বুড়ো আঙুলের চাপে তৈরি । একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ভাঙা গাড়িকে যখন গাড়িখানার রাখা যায় তখন কোনো উপদ্রব হয় না । সেটার মধ্যে শিশুরা খেলা করতে পারে, চাই কি মধ্যাহ্নের বিশ্রামাবাসও হতে পারে । কিন্তু, যখনই তাকে টানতে যাই তখন তার জোড়ভাঙা অংশে অংশে সংঘাত উপস্থিত হয় । যখন চলি নি, রাষ্ট্রসাধনার পথে পাশাপাশি রয়েছি, গ্রামের কর্তব্য পালন করেছি, তখন তো নাড়া খাই নি । আমি যখন আমার জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন এক দিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানার এক জায়গায় জাজিম খানিকটা ভুলে রেখে দিয়েছেন । যখন জিজ্ঞেস করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানার প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা । এক তরুপোবে বসাত্তেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক । এ প্রথা তো অনেক দিন ধরে চলে এসেছে ; অনেক দিন মুসলমান এ মেনে এসেছে, হিন্দুও মেনে এসেছে । জাজিম-তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, জাজিম-পাতা আসনে অন্তে বসেছে । তার পর ওদের ডেকে এক দিন বলেছি, 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, কারাবাস ও মৃত্যুর পথে চলতে হবে ।' তখন হঠাৎ দেখি অপর পক্ষ লাল-টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, আমরা পৃথক । আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে

কালান্তর

এসে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায় ? বাধা ঐ জাজিম-তোলা আসনে বহু দিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে । ওটা ছোটো নয় । ওখানে অকূল অতল কালাপানি । বক্রতাম্বুর উপর দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে ডাক দিলেই পার হওয়া যায় না ।

আজকের দিনে রাষ্ট্রশক্তির উদ্‌বোধন হয়েছে বলেই যত ভেদ, যত ফাঁক, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । সেইজন্যই মার খাচ্ছি । এই মার নানা রূপে আসে— কিন্তু, আজ বড়ো করে দেখা দিল এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে । মহাপুরুষেরা এই মারকে বন্ধে গ্রহণ ক'রে এর একান্ত বীভৎসতার পরিচয় দেন । তাতেই আমাদের চৈতন্য হয় । এই-যে চৈতন্য এসেছে, রিপূর বশবর্তী হয়ে কি এই শুভ অবসরকে নষ্ট করব না শুভবুদ্ধিদাতাকে বলব 'যেখানেই ভেদ ঘটিয়েছি সেখানেই পাপের বেদি গাঁথিয়েছি, তার থেকেই বাঁচাও' ?

এই-যে ক্রমবেশে পাপ দেখা দিল, এ তো ভালোই হয়েছে এক ভাবে । আজকে না ভেবে উপায় নেই যে, কী করে এ'কে চিরকালের মতো পরাভূত করা যেতে পারে । প্রশ্ন উঠতে পারে, আশু আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করব । সহসা এ প্রশ্নের একটা পাকা-রকম উত্তর দিই এমন শক্তি আমার নেই । পরীক্ষা আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে সে উপায় এক দিন পাবই । আজকে সেই পরীক্ষা-আরম্ভের আয়োজন । আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দুসমাজের কোথায় কোন্ ছিদ্র, কোন্ পাপ আছে ; অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই । এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দুসমাজকে আহ্বান করতে হবে ; বলতে হবে, 'পীড়িত হয়েছি আমরা, লঙ্ঘিত হয়েছি, বাইরের আঘাতের জন্ত নয়, আমাদের ভিতরের পাপের জন্ত । এসো আজ সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি ।' আমাদের পক্ষে এ বড়ো সহজ কথা নয় । কেননা, অস্তরের মধ্যে বহু কালের অভ্যস্ত ভেদবুদ্ধি, বাইরেও বহু দিনের গড়া অতি কঠিন ভেদের প্রাচীর । মুসলমান

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

যখন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানসমাজকে ডাক দিয়েছে, সে কোনো বাধা পায় নি— এক ঈশ্বরের নামে ‘আল্লাহো আক্ববর’ বলে সে ডেকেছে। আর আজ আমরা যখন ডাকব ‘হিন্দু এসো’, তখন কে আসবে? আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডী, কত প্রাদেশিকতা— এ উদ্ভীর্ণ হয়ে কে আসবে? কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হই নি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয় নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে বুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। কখনো কখনো ইতিহাস উদ্ঘাটন করে অন্য প্রমাণ পাবার চেষ্টা করি বটে; বলি, শিখরা তো এক সময় বাধা ঘুচিয়েছিল। শিখরা যে বাধা ঘুচিয়েছিল সে তো শিখধর্ম ছাড়াই। পাঞ্জাবের কোথাকার জাঠ, কোথাকার কোন্ জাতি সব, শিখধর্মের আস্থানে একত্র হতে পেরেছিল; বাধাও দিতে পেরেছিল, ধর্মকেও রক্ষা করতে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজি এক সময় ধর্মরাজ্য-স্থাপনের ভিত্তি গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না; শিবাজির হয়ে সে দিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না, পেশোয়ারাদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে কণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে। আমার কথা এই যে, আমাদের মধ্যে এই-যে পাপ পুঁবে রেখেছি এতে কি শুধু আমাদেরই অকল্যাণ? সে পাপে কি আমরা প্রতিবেশীদের

কালান্তর

প্রতি অবিচার করি নে ? তাদের মধ্যে হিংসা আগিয়ে তুলি নে ? যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। আপনার জন্তেও, প্রতিবেশীর জন্তেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি 'তোমরা কুর হোয়ো না, তোমরা ভালো হও, নরহত্যার উপরে কোনো ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না'— কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না। বায়ুমণ্ডলে বাতাস লঘু হয়ে এলে ঝড় যেমন আপনিষ্ট আসে, ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্বলতা পুষে রেখে দিলে সেখানে অত্যাচার আপনিষ্ট আসে— কেউ বাধা দিতে পারে না। কিছু ক্ষণের জন্ত হস্ততা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে পরস্পর কৃত্রিম বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি, কিন্তু চিরকালের জন্ত তা হয় না। যে মাটিতে কণ্টকতরু ওঠে সে মাটিকে যত ক্ষণ শোধন না করা হয় তত ক্ষণ তো কোনো ফল হবে না।

আপনার লোককেও যে পর করেছে, পরের সঙ্গেও যার আত্মীয়তা নেই, সে তো ঘাটে এসেছে, তার ঘর কোথায় ? আর তার খাসই বা কত ক্ষণ ? আজ আমাদের অমুতাপের দিন— আজ অপরাধের কালন করতে হবে। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত যদি করি তবেই শত্রু আমাদের মিত্র হবে, রুদ্ৰ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।

মাঘ ১৩৩৩

হিন্দু মুসলমান

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের, সকল সমাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত এক মহাআতিকে আগিয়ে তুলে তার একচ্ছত্র আসন রচনা করব বলে দেশনেতারা পণ করেছেন।

ঐ আসন জিনিসটা, অর্থাৎ যাকে বলে কনস্টিটিশন, ওটা বাইরের, রাষ্ট্রশাসনবাবস্থায় আমাদের পরস্পরের অধিকারনির্গম দিয়ে সেটা গড়েপিটে তুলতে হবে। তার নানা রকমের নমুনা নানা দেশের ইতিহাসে দেখেছি, তারই থেকে যাচাই বাছাই করে প্ল্যান ঠিক করা চলছে। এই ধারণা ছিল, ওটাকে পাকা করে খাড়া করবার বাধা বাইরে অর্থাৎ বর্তমান কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার মধ্যে। তারই সঙ্গে রক্ষা করবার, ত্বরান্বিত করবার কাজে কিছু কাল থেকে আমরা উঠে পড়ে লেগেছি।

যখন মনে হল কাজ এগিয়েছে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে দেখি, যন্ত্র বাধা নিজেদের মধ্যেই। গাড়িটাকে তীরে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবে সারথি যদি বা আধরাজি হল ওটাকে আস্তাবল থেকে ঠেলে বের করবার সময় হাঁস হল, একটা গাড়িটার ছুই চাকার বিপরীত রকমের অমিল, চালাতে গেলেই উল্টে পড়বার জো হয়।

যে বিরুদ্ধ মানুষটার সঙ্গে আমাদের বাইরের সম্বন্ধ, বিবাদ করে এক দিন তাকে হটিয়ে বাহির করে দেওয়া দুঃসাধ্য হলেও নিতান্ত অসাধ্য নয়, সেখানে আমাদের হারজিতের মামলা। কিন্তু ভিতরের লোকের বিবাদে কোনো এক পক্ষ জিতলেও মোটের উপর সেটা হার, আর হারলেও শান্তি নেই। কোনো পক্ষকে বাদ দেবারও জো নেই, আবার দাবিয়ে রাখতে গেলেও উৎপাতকে চিরকাল উত্তেজিত করে রাখাই

কালান্তর

হবে। ডান পাশের দাঁত বা পাশের দাঁতকে নড়িয়ে দিয়ে যদি বড়াই করতে চায় তবে অবশেষে নিজেকে অনড় থাকবে না।

এত দিন রাষ্ট্রসভায় বরসজ্জাটার 'পরেই একান্ত মন দিয়েছিলুম, আসনটা কেমন হবে এই কথা ভেবেই মুগ্ধ। ওটা মহামূল্য ও লোভনীয়। প্রতিবেশীরা যারা কিংখাবের আসন বানিয়েছে তাদের আসরের ঘটা দেখে দীর্ষা হয়। কিন্তু হায় রে, স্বয়ং বরকে বরণ করবার আন্তরিক আয়োজন বহুকাল থেকে ভুলেই আছি। আজ তাই পণ নিয়ে বরযাত্রীদের লড়াই বাধে। শুভকর্মে অশুভ গ্রহের শাস্তির কথাটার প্রথম থেকেই মন দিই নি, কেবল আসনটার মালমসলার ফদ নিয়ে বেলা বইয়ে দিয়েছি।

রাষ্ট্রিক মহাসন-নির্মাণের চেয়ে রাষ্ট্রিক মহাজাতি-সৃষ্টির প্রয়োজন আমাদের দেশে অনেক বড়ো, এ কথা বলা বাহুল্য। সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অস্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী; কিন্তু তার চেয়ে অশুভের কারণ এই যে, এই বিচ্ছেদে আমাদের মনুষ্যত্বসাধনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়, এটা বর্বরতার লক্ষণ। অথচ আমরা যে আত্মশাসনের দাবি করছি সেটা তো বর্বরের প্রাপ্য নয়। যাদের ধর্মে সমাজে প্রথায়, যাদের চিন্তাবৃত্তির মধ্যে এমন একটা মজাগত জোড়-ভাঙানো ছুর্যোগ আছে যে তারা কথায় কথায় একখানাকে সাতখানা করে ফেলে, সেই ছত্রভঙ্গের দল ঐকরাষ্ট্রিক সত্তাকে উদ্ভাবিত করবে কোন্ যজ্ঞের সাহায্যে?

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অল্প কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে

হিন্দু-মুসলমান

বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ শ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড় শত বৎসর পূর্বকার ফরাসি-বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বন্ধপরিষ্কার। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্মহননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোর বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্ভূত।

নব্য তুর্কী যদিও প্রচলিত ধর্মকে উন্মূলিত করে নি কিন্তু বলপূর্বক তার শক্তি হ্রাস করেছে। এর ভিতরকার কথাটা এই যে, বিশেষ ধর্মের আদিপ্রবর্তকগণ দেবতার নামে মানুষকে মেলাবার জন্তে, তাকে লোভ ও অহংকার থেকে মুক্তি দেবার জন্তে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার পরে সম্প্রদায়ের লোক মহাপুরুষদের বাণীকে সংঘবদ্ধ করে বিকৃত করেছে, সংকীর্ণ করেছে; সেই ধর্ম দিয়ে মানুষকে তারা যেমন ভীষণ মার মেরেছে এমন বিষয়বুদ্ধি দিয়েও নয়; মেরেছে প্রাণে মানে বুদ্ধিতে শক্তিতে, মানুষের মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্যকে ছারখার করেছে। ধর্মের নামে পুরাতন মেক্সিকোর স্পেনীয় ধূস্টানদের অকথ্য নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীতে অপ্রতিহত প্রভু নিরে রাজা যেমন কতবার হুঁসুট অরাজকতার মস্ত হয়েছে, প্রজার রক্ষাকর্তা নাম নিরে প্রজার সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, এবং অবশেষে সেই কারণেই আজকের ইতিহাসে রাজ্য থেকে রাজার কেবলই বিলুপ্তি ঘটছে, ধর্ম সত্ত্বেও অনেক স্থলে সেই একই কারণে ধর্মতন্ত্রের নিদারুণ অধার্মিকতা দমন করবার জন্তে, মানুষকে ধর্মপীড়া থেকে বাঁচাবার জন্তে, অনেক বার চেষ্টা দেখা গেল।

কালান্তর

আজ সেই সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক-দেশ-বাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।

হিন্দুসমাজে আচার নিয়েছে ধর্মের নাম। এই কারণে আচারের পার্থক্যে পরস্পরের মধ্যে কঠিন বিচ্ছেদ ঘটায়। মৎশ্রাণী বাঙালিকে নিরামিষ প্রদেশের প্রতিবেশী আপন বলে মনে করতে কঠিন বাধা পায়। সাধারণত বাঙালি অন্য প্রদেশে গিয়ে অভ্যস্ত আচারের ব্যতিক্রম উপলক্ষ্যে অবজ্ঞা মনের মধ্যে পোষণ করে। যে চিত্তবৃত্তি বাহ্য আচারকে অভ্যস্ত বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে তার মমত্ববোধ সংকীর্ণ হতে বাধ্য। রাষ্ট্রসম্মিলনীতেও এই অভাব কথায় কথায় ধরা পড়ে এবং দেখা যায়, আমরা যে অলক্ষ্য বাবধান সঞ্চে করে নিয়ে বেড়াই তা সংস্কারগত, অতি সূক্ষ্ম এবং সেইজন্য অতি দুর্লভ্য। আমরা যখন মুখে তাকে অস্বীকার করি তখনো নিজের অগোচরেও সেটা অস্ত্বঃকরণের মধ্যে থেকে যায়। ধর্ম আমাদের মেলাতে পারে নি, বরঞ্চ হাজারখানা বেড়া গড়ে তুলে সেই বাধাগুলোকে ইতিহাসের অতীত শাখত বলে পাড়া করে দিয়েছে। ইংরেজ নিজের জাতকে ইংরেজ বলেই পরিচয় দেয়। যদি বলত খৃস্টান তা হলে যে ইংরেজ বৌদ্ধ বা মুসলমান বা নাস্তিক তাকে নিয়ে রাষ্ট্রগঠনে মাথা-ঠোকাঠুকি বেধে যেত। আমাদের প্রধান পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান। এক দলকে বিশেষ পরিচয়কালে বলি বটে হিন্দুস্থানি, কিন্তু তাদের হিন্দুস্থান বাংলার বাইরে।

কয়েক বছর পূর্বে আমার ইংরেজ বন্ধু এণ্ড্রুজকে নিয়ে মালাবারে ভ্রমণ করছিলাম। ব্রাহ্মণপল্লীর সীমানায় পা বাড়াতেই টিয়া-সমাজ-ভুক্ত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে দৌড় দিলেন। এণ্ড্রুজ বিস্মিত হয়ে তাঁকে গিয়ে ধরলেন, এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে

হিন্দু-মুসলমান

জানলেন, এ পাড়ায় তাঁদের জাতের প্রবেশনিষেধ। বলা বাহুল্য, হিন্দুসমাজবিধি-অনুসারে এগুজের আচারবিচার টিয়া-ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক গুণে অশাস্ত্রীয়। শাসনকর্তার জাত বলে তাঁর জোর আছে, কিন্তু হিন্দু বলে হিন্দুর কাছে আত্মীয়তার জোর নেই। তার সম্বন্ধে হিন্দুর দেবতা পর্যন্ত জাত বাঁচিয়ে চলেন, স্বয়ং জগন্নাথ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ-দর্শনীয় নন। বৈমাত্র সম্বানও মাতার কোলের অংশ দাবি করতে পারে— ভারতে বিশ্বমাতার কোলে এত ভাগ কেন? অনাত্মীয়তাকে অস্থিমজ্জায় আমরা সংস্কারগত করে রেখেছি, অথচ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের আত্মীয়তা না পেলে আমরা বিস্মিত হই। শোনা গিয়েছে, এবার পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও হিন্দুর প্রতি উৎপাতে নমশূদ্ররা নির্দয়ভাবে মুসলমানদের সঙ্গে ষোগ দিয়েছিল। ভাবতে হবে না কি, ওদের দরদ হল না কেন, আত্মীয়তার দায়িত্বে বাধা পড়ল কোথায়?

এই অনাত্মীয়তার অসংখ্য অন্তরাল বহু যুগ ধরে প্রকাশ্যে আমাদের রাষ্ট্রভাগ্যকে ব্যর্থ করেছে এবং আজও ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃৎকষটাচ্ছে। ছোর গলায় যেখানে বলছি, আমরা এক, স্তম্ভ স্তরে সেখানে অস্তুর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বলে বলছেন, 'ধর্ম-কর্ম আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই।' এর ফল ফলছে; আর রাগ করছি ফলের উপরে, বীজবপনের উপরে নয়।

যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালির চিত্ত বিক্লুত তখন বাঙালি অগত্যা বঙ্গকট-নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই হৃদিনের সুর্যোগে বোধাই-মিলওয়ালার নির্মমভাবে তাঁদের মুনফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল, বাঙালি মুসলমান সে দিন আমাদের থেকে মুগ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা

কালান্তর

প্রধানত কোন্ পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে, সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা বিখণ্ডিত হলে বাঙালিজাতের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মকল্প আমাদের নেই ব'লে সে দিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর ছলে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।

এই ব্যাপারে সে দিন অনেকেই রাগারাগি করেছিলেন। কিন্তু ফুটো কলসীতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের উপরে বা কলসীর উপরে চোখ রাঙিয়ে লাভ কী? গরজ আমাদের যতই থাকুক, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে। কলঙ্ক আমাদেরই আর সে কলঙ্ক যথাসময়ে ধরা পড়বেই, দৈবের কৃপায় লজ্জা-নিবারণ হবে না।

কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্রশাসননীতির প্রবর্তন হওয়া চাই। অর্থাৎ একেবারে জোড়ের চিহ্ন থাকবে না এতটা দূর মিলে যাবার মতো ঐক্য আমাদের দেশে নেই, এ কথাটা মনে নিতে হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রসমস্তার এ একটা কেজো রকমের নিস্পত্তি বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এর ফাটল নিবারণ করা চলবে না; কোনো কারণে একটু তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।

যেখানে নিজদের মধ্যে সত্যকার ভেদ সেখানেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার

হিন্দু মুসলমান

হিন্দু নিজে স্বতন্ত্র কোঠায় স্বতন্ত্র হিসাব চলতে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রিক সম্পদে সকলেরই অংশ স্বার্থের কথাটা স্বভাবতই মনে থাকে না। এমন ছুপ্রহে একই গাড়িকে দুটো ঘোড়া দু দিকে টানবার মুশকিল বাধায়। এখন থেকেই অধিকারের ভাগ-বন্টন নিয়ে হট্টগোল জেগেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি? বিষয়বুদ্ধির আমলে সহোদর ভাইদের মধ্যেও বচসা বেধে যায়। শেষকালে গুণ্ডাদের হাতেই লাঠিসড়কির যোগে ষমের দ্বারে চরম নিস্পত্তির ভার পড়ে।

এক দল মুসলমান সম্মিলিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে, তাঁরা স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতি দাবি করেন এবং তাঁদের পক্ষের ওজন ভারি করবার জন্যে নানা বিশেষ সুযোগের বাটখারা বাড়িয়ে নিতে চান। যদি মুসলমানদের সবাই বা অধিকাংশ একমত হয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনরীতির দাবি করেন, এবং নিজেদের পক্ষের ওজন বাড়িয়ে নিতে চান, তা হলে এমনতরো দাবি মেনে নিলেও আপোষ করতে মহাত্মাজি রাজি আছেন বলে বোধ হল। তা যদি হয়, তাঁর প্রস্তাব মাথা পেতে নেওয়াই ভালো। কেননা, ভারতবর্ষের তরফে রাষ্ট্রিক যে অধিকার আমাদের জয় করে নিতে হবে তার সুস্পষ্ট মূর্তি এবং সাধনার প্রণালী সমগ্রভাবে তাঁরই মনে আছে। এ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই সমস্ত ব্যাপারটাকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে অগ্রসর করে এনেছেন। কাজ-উদ্ধারের দিকে দৃষ্টি রাখলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই হাতে সারথ্যভার দেওয়া সংগত। তবু, এক জনের বা এক দলের ব্যক্তিগত সহিষ্ণুতার প্রতি নির্ভর করে এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকার-পরিবেষণে কোনো এক পক্ষের প্রতি যদি পক্ষপাত করা হয় তবে সাধারণ মানবপ্রকৃতিতে সেই অবিচার সহ্য হবে না, এই নিয়ে একটা অশান্তি নিয়তই মারমুখো হয়ে থেকে যাবে। বস্তুত এটা পরস্পরের বিবাদ মেটাবার পছন্দ নয়।

কালান্তর

সকলেই যদি একজোট হয়ে প্রসন্নমনে একঝাঁকী আপোষ করতে রাজি হয় তা হলে ভাবনা নেই। কিন্তু মানুষের মন! তার কোনো-একটা তারে যদি অত্যন্ত বেশি টান পড়ে তবে জ্বর যায় বিগড়ে, তখন সংগীতের দোহাই পাড়লেও সংগত মাটি হয়। ঠিক জানি না, কী ভাবে মহাত্মাজি এ সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। হয়তো গোল-টেবিল-বৈঠকে আমাদের সম্মিলিত দাবির জোর অক্ষুণ্ণ রাখাই আপাতত সব চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হতে পারে। দুই পক্ষই আপন আপন জিদে সমান অটল হয়ে বসলে কাজ এগোবে না, এ কথা সত্য। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে ত্যাগ স্বীকার করে মিটমাট হয়ে গেলে উপস্থিত রক্ষা হয়। একেই বলে ডিপ্লোম্যাচি। পলিটিক্‌সে প্রথম থেকেই বোলো-আনা প্রাপ্যের উপর চেপে বসলে বোলো আনাই খোয়াতে হয়। যারা অদূরদর্শী রূপণের মতো অত্যন্ত বেশি টানাটানি না করে আপোষ করতে জানে তারাই জেতে। ইংরেজের এই গুণ আছে, নৌকোডুবি বাঁচাতে গিয়ে অনেকটা মাল ইংরেজ জলে ফেলে দিতে পারে। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্তমান আপোষের প্রস্তাবে ইংরেজের কাছে আমরা যে প্রকাণ্ড ক্ষতিস্বীকার দাবি করছি সেটা যুরোপের আর-কোনো জাতির কাছে একেবারেই খাটত না, তারা আগাগোড়াই ঘুবি উঁচিয়ে কথাটা সম্পূর্ণ চাপা দেবার চেষ্টা করত। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ইংরেজের সুবুদ্ধি বিখ্যাত; ইংরেজ সবখানির দিকে তাকিয়ে অনেকখানি সহ্য করতে পারে। এই বুদ্ধির প্রয়োজন যে আমাদের নেই, এ কথা গোয়ারের কথা; আথেরে গোয়ারের হার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দর-কষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মন-কষাকষিকে অত্যন্ত বেশি দূর এগোতে দেওয়া শত্রু পক্ষের আনন্দবর্ধনের প্রধান উপায়।

আমার বক্তব্য এই যে, উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত

হিন্দু-মুসলমান

নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি-দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চির কালের প্রয়োজন টিকবে না। এমন কি পলিটিক্সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ কাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারেই টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে সেই গোড়ায়, নইলে কিছুতে কল্যাণ নেই।

এত দিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলাম। সম্প্রদায়ের গভীর উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উঁচিয়ে তুলতে লেগেছে। ষত দিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল তত দিন গোড়ামি থাকা সত্ত্বেও কোনো হান্ধাম বাধে নি। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। আমরাও মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কিছু অতিরিক্ত জিদের সঙ্গে ঢাকে কাঠি দিলাম, অপর পক্ষেও কোর্বানির উৎসাহ পূর্বের চেয়ে কোমর বেঁধে বাড়িয়ে তুললে, সেটা আপন আপন ধর্মের দাবি মেটাবার খাতির নিয়ে নয়, পরস্পরের ধর্মের অভিমানকে আঘাত দেবার স্পর্ধা নিয়ে। এই-সমস্ত উৎপাতের শুরু হয়েছে শহরে, যেখানে মানুষে মানুষে প্রকৃত মেলামেশা নেই বলেই পরস্পরের প্রতি দরদ থাকে না।

ধর্মমত ও সমাজরীতির সন্ধকে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয়, বিরুদ্ধতা আছে, এ কথা মানতেই হবে। অতএব আমাদের সাধনার

কালান্তর

বিষয় হচ্ছে, তৎসত্ত্বেও ভালো রকম করে মেলা চাই। এই সাধনার সিদ্ধিলাভ আমাদের না হলে নয়। কিন্তু এর একান্ত আবশ্যিকতার কথা আমাদের সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে আজও ভাবতে আরম্ভ করি নি। একদা খিলাফতের সমর্থন করে মহাত্মাজি মিলনের সেতু নির্মাণ করতে পারবেন মনে করেছিলেন। কিন্তু 'এহ বাহু'। এটা গোড়াকার কথা নয়, এই খিলাফত সম্বন্ধে মতভেদ থাকে অগ্রায় মনে করি নে, এমন কি, মুসলমানদের মধ্যেই যে থাকতে পারে তার প্রমাণ হয়েছে।

নানা উপলক্ষ্যে এবং বিনা উপলক্ষ্যে সর্বদা আমাদের পরস্পরের সঙ্গ ও সাক্ষাৎ-আলাপ চাই। যদি আমরা পাশাপাশি চলি, কাছাকাছি আসি, তা হলেই দেখতে পাব, মানুষ ব'লেই মানুষকে আপন ব'লে মনে করা সহজ। যাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই তাদের সম্বন্ধেই মত প্রভৃতির অনৈক্য অত্যন্ত কড়া হয়ে ওঠে, বড়ো হয়ে দেখা দেয়। যখনই পরস্পর কাছাকাছি আনাগোনার চর্চা হতে থাকে তখনই মত পিছিয়ে পড়ে, মানুষ সামনে এগিয়ে আসে। শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রভেদ অনুভব করি নি, এবং সখ্য ও স্নেহসম্বন্ধ-স্থাপনে লেশমাত্র বাধা ঘটে নি। যে-সকল গ্রামের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ তার মধ্যে মুসলমান গ্রাম আছে। যখন কলকাতার হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে, তখন বোলপুর-অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র করা হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এই সঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শাস্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয় নি, কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।

আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা

হিন্দু-মুসলমান

সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নাগিশ করেছিল। সে নাগিশ আমি সংগত বলে মনে করি নি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে বখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা শুধনি তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।

এ কথা আশা করাই চলে না যে, আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্মকর্মের মতবিশ্বাসের ভেদ একেবারেই ঘুচতে পারে। তবুও মনুষ্যত্বের খাতিরে আশা করতেই হবে, আমাদের মধ্যে মিল হবে। পরস্পরকে দূরে না রাখলেই সে মিল আপনিই সহজ হতে পারবে। সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ক্রটিবিচারটা থাক— আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্তে যেন লজ্জা স্বীকার করি। অল্পবয়সে বখন প্রথম জমিদারি সেরেস্তা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখলুম, আমাদের ব্রাহ্মণ ম্যানেজার যে ভক্তপোষে গদিত্তে ব'সে দরবার করেন সেখানে এক ধারে জাজিম তোলা, সেই জায়গাটা মুসলমান প্রজাদের বসবার জন্তে ; আর জাজিমের উপর বসে হিন্দু প্রজারা। এইটে দেখে আমার ধিকার জন্মেছিল। অথচ এই ম্যানেজার আধুনিক দেশাত্মবোধী দলের। ইংরেজরাজের দরবারে ভারতীয়ের অসম্মান নিয়ে কটুভাষা-ব্যবহার তিনি উপভোগ করে থাকেন, তবু স্বদেশীয়কে ভদ্রোচিত সম্মান দেবার বেলা এত কৃপণ। এই কৃপণতা সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। অবশেষে এমন হয়েছে যেখানে হিন্দু সেখানে মুসলমানের দ্বার সংকীর্ণ, যেখানে মুসলমান সেখানে হিন্দুর বাধা বিস্তর। এই আন্তরিক বিচ্ছেদ

কালান্তর

যত দিন থাকবে তত দিন স্বার্থের ভেদ যুচবে না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার এক পক্ষের কল্যাণভার অপর পক্ষের হাতে দিতে সংকোচ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আজ সন্মিলিত নির্বাচন নিয়ে যে বন্দ বোধে গেছে তার মূল তো এইখানেই। এই বন্দ নিয়ে যখন আমরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠি তখন এর স্বাভাবিক কারণটার কথা ভেবে দেখি না কেন ?

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অকথ্য বর্বরতা বারে বারে আমাদের সহ করতে হয়েছে। জার-শাসনের আমলে এই রকম অত্যাচার রাশিয়ায় প্রায় ঘটত। বর্তমান বিপ্লবপ্রবণ পোলিটিক্যাল যুগের পূর্বে আমাদের দেশে এ রকম দানবিক কাণ্ড কখনো শোনা যায় নি। ব্রিটিশশাসিত ভারতে বহু গৌরবের law and order পদার্থটা বড়ো বড়ো শহরে পুলিশ-পাহারার আগ্রত দৃষ্টির সামনে স্পর্ধাসহকারে উপরি উপরি অবমানিত হতে লাগল, ঠিক এই বিশেষ সময়টাতেই। মারের ছঃখ কেবল আমাদের পিঠের উপর দিয়েই গেল না, ওটা প্রবেশ করেছে বুকের ভিতরে। এটা এমন সময়ে ঘটল ঠিক যখন হিন্দু-মুসলমানে কণ্ঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারলে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হত, বিশ্বসভার কাছে আমাদের মাথা হেঁট হত না। এই রকমের অমানুষিক ঘটনার লোকস্বৃতিকে চিরদিনের মতো বিস্মৃত করে তোলে, দেশের ডান হাতে বা হাতে মিল করিয়ে ইতিহাস গড়ে তোলা ছঃসাধ্য হয়। কিন্তু, তাই বলেই তো হাল ছেড়ে দেওয়া চলে না; গ্রন্থি জটিল হয়ে পাকিয়ে উঠেছে বলে জ্বোথের বেগে সেটাকে টানাটানি করে আরো আঁট করে তোলা মূঢ়তা। বর্তমানের কাঁজের ভবিষ্যতের বীজটাকে পর্যন্ত অফলা করে ফেলা স্বাভাবিক আত্মহত্যার প্রণালী। নানা আশু ও সুদূর কারণে, অনেক দিনের পুঞ্জিত অপরাধে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনসমস্তা কঠিন হয়েছে; সেইজন্তেই অবিলম্বে এবং দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে তার সমাধানে প্রবৃত্ত হতে হবে। অপ্রসন্ন ভাগ্যের উপর রাগ করে তাকে বিগুণ হস্তে করে তোলা চোরের উপর রাগ করে

হিন্দু-মুসলমান

মাটিতে ভাত খাওয়ার মতো।

বর্তমান রাষ্ট্রিক উদ্যোগে বোম্বাই প্রদেশে আন্দোলনের কাজটা সব চেয়ে সবেগে চলতে পেরেছিল তার অন্ততম কারণ, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাধিয়ে দেবার উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। পার্শ্বিতে হিন্দুতে ছুই পক্ষ খাড়া করে তোলা সহজ হয় নি। কারণ, পার্শ্বি সমাজ সাধারণত শিক্ষিত সমাজ, স্বদেশের কল্যাণ সম্বন্ধে পার্শ্বিরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করতে জানে, তা ছাড়া তাদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা নেই। বাংলাদেশে আমরা আছি অতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশি ক্ষণ লাগে না। বাংলাদেশে পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যখনই নামি ঠিক সেই সময়টাতেই নিজের ঘর সামলানো অসাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুর্ঘটনার কারণটা আমাদের এখানে গভীর করে শিকড় গেড়েছে, এ কথাটা মেনে নিতেই হবে। এ অবস্থায় শাস্ত্রমানে বুদ্ধিপূর্বক পরস্পরের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের উপায়-উদ্ভাবনে যদি আমরা অক্ষম হই, বাঙালি-প্রকৃতি-সুলভ হৃদয়বেগের কোঁকে যদি কেবলই জেদ জাগিয়ে স্পর্ধা পাকিয়ে তুলি, তা হলে আমাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না এবং স্বাভাবিক কল্যাণের পথ একান্ত দুর্গম হয়ে উঠবে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখ বুজে বলেন, সবই সহজ হয়ে যাবে যখন দেশটাকে নিজের হাতে পাব। অর্থাৎ, নিজের বোঝাকে অবস্থা-পরিবর্তনের কাঁধে চাপাতে পারব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট থাকবার এই ছুতো। কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক।

ধরে নেওয়া গেল গোল-বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত-ফেরাকেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিকণ আছে। সিভিল-সার্ভিসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল-সার্ভিস হবে যা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই

কালান্তর

সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের লোকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও এ কথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়-বিষেবের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেইখানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সব প্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মুঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালি না পড়ে।

শ্রাবণ ১৩৩৮

‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’

যখন খবর পাই, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কী তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন নিশ্চিত জানি, আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে।^১ দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকিলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটাকে প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে না। কেননা অন্য পক্ষের উকিলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন; তার কারণ, বাছাই-করা বাক্যের বিশেষ অর্থ নির্ভর করে বিশেষরূপে বাছাই করার উপরেই।

রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমার মত আলোচনা করে সম্প্রতি ইংরেজি ভাষায় একখানি বই^২ লেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ; তিনি আমার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি, শ্রদ্ধা করেই লিখেছেন। আমার প্রতি তাঁর মনের অমুকুল ভাব থাকতেই, আমার মতকে অনেক অংশে প্রচলিত মতের অমুকুল করে সাজিয়ে আমাকে সাধারণের প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

বইখানি আমাকে পড়তে হল। কেননা, আমার রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কী রকম প্রতীত হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে পারি নি। আমি জানি, আমার মত ঠিক যে কী তা সংগ্রহ করা সহজ নয়। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং

^১ *Political Philosophy of Rabindranath*

by Sachindranath Sen

কালান্তর

কাজও করেছি। যেহেতু বাক্য রচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্তে যখন
যা মনে এসেছে তখনই তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে,
প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার
সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে
চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে
দেখাই সংগত। যেমন এ কথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ-আদি চারি বর্ণ
সৃষ্টির আদিকালেই ব্রাহ্মণ মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে,
যেমন স্বীকার করতেই হবে আৰ্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে
কালে নানা রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত
আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে 'রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাধা
মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে
উৎপন্ন হয় নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে
তারা গড়ে উঠেছে। সেই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা
ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ
মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোন্টা তৎসাময়িক, কোন্টা বিশেষ সময়ের
সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই।
বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না,
সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।

বইখানি পড়ে আমি নিজের মতের ঠিক চেহারাটা পেলুম না। মন
বাধা পেল। বাধা পাবার অন্তান্ত কারণের মধ্যে একটা কারণ এই যে,
এর মধ্যে অনেক তর্জমা আছে যার ভাষা আমার নয়, অথচ আমার যে
নয় তার নিদর্শন নেই। ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা
যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা যারা
পড়ে। আর যাই হোক, নিজের ভাষার দায়িত্ব নিজেকে নিতেই হয়,
কিন্তু অন্যের ভাষার দায়িত্ব নেওয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

তবু এই ক্রটিকেও উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু এ কথা বলতেই হল যে, নানা লেখা থেকে বাক্য চয়ন করে আমার মতের যে-একটা মূর্তি দেওয়া হয়েছে তাতে অংশত হয়তো সব কথাই আছে কিন্তু সমগ্রত মোট কথাটা প্রকাশ পায় নি। এ রকম হওয়াটা বোধ করি অবশ্যস্বাভাবী। কোন্ কথার গুরুত্ব বেশি, কোন্টার কম, লেখক সেটা স্বভাবত নিজের অভিমত ও রুচির দ্বারা স্থির করেন এবং সেই ভাবেই সমস্তটাকে গড়ে তোলেন।

এই উপলক্ষ্যে আমার সমস্ত চিন্তার ক্ষেত্রের উপর নিজেকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে হল। ঐ রাষ্ট্রিক সমস্তা সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি, কী বলতে চেয়েছি, তা নিয়েই কুড়িয়ে এনে সংক্ষেপে আঁটি বাধবার চেষ্টা করা ভালো মনে করি। এজন্তে দলিল দাঁটব না, নিজের স্মৃতির উপরিতলে স্পষ্ট হয়ে যা আগে আছে তারই অনুসরণ করব।)

বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্মপরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচারবিচার ক্রিয়াকর্মের নানা আবশ্জিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের প্রজ্ঞা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সে দিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি বাদের আস্থা বিচলিত হ'ত, তাঁদের মনকে হয় যুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টানধর্মপ্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সে কালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ ক'রে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।

কালান্তর

বলা বাহুল্য, বালককালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।

সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি। যখন আমরা বাইরের কিছুতে যুগ্ম হই তখন লুক্ক মন অমুকরণের মরীচিকা-বিস্তারের দ্বারা তাকে নেবার জন্তে ব্যগ্র হয়। অমুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়; তাতে রঙ চড়াই বেশি, তার আওয়াজ হয় প্রবল, তার আক্ষালন হয় অত্যাগ্র; অত্যন্ত জোর করে নিজের কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি জিনিসটা আমারই, অথচ নানা দিক থেকে তার ভঙ্গুরতা, তার আত্মবিরোধ প্রকাশ পেতে থাকে। বাইরের জিনিসকে যখন আপন অন্তরের করি তখন তার ভাবটা বজায় থাকতে পারে, তবু তার প্রকাশটা হয় নিজের মতো। কিন্তু যত ক্ষণ সেটা আমাদের বাইরে জোড়া থাকে, ভিতরে মিলে না যায়, তত ক্ষণ সেটা হয় মোটা কলমে দাগা বোলানো অক্ষরের মতো, মূলের চেয়ে আকারে বড়ো, কিন্তু একেবারে তার গায়ে গায় সংলগ্ন। তার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সে অক্ষর লেখকের আপন বাক্যে লেখকের আপন চিন্তিত ভাবকে লিপিবদ্ধ করতে পারে না। আমাদের রাষ্ট্রীয় চেষ্টায়, বাইরে থেকে, ইন্সুলে পড়ার বই থেকে আমরা যা পেয়েছি তা আমাদের প্রাণে সর্বাঙ্গীন হয়ে ওঠে নি ব'লেই, অনেক সময় তার বাইরের ছাঁদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদ্বর্ষ চেষ্টা করি—এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার তা পেয়েছি, যা করবার তা করা হল।

‘সাধনা’ পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

তাতে আমি এই কথাটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি। তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে তিক্ত করা ও গলা মোটা করে গবর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতাম। আমাদের দেশে পোলিটিকাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনা করতেই পারবেন না। তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মিলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজি ভাষার বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না। রাজশাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা অগদিস্বনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সত্যায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত জুঁজু হয়ে কঠোর বিজ্রপ করেছিলেন। বিজ্রপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি, এ ক্ষেত্রেও তার অন্তর্ধা হয় নি। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা-কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই নৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষার আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসত্যার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্ভোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটেই সে দিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে। এত বড়ো ছুঃসহ লাঞ্ছনা আমি নীরবে সহ করেছিলুম তার একটা কারণ, ইংরেজিভাষা-শিক্ষার বাল্যকাল থেকে আমি সত্যাই অবহেলা করেছি; দ্বিতীয় কারণ, পিতৃদেবের শাসনে তখনকার দিনেও আমাদের পরিবারে পরস্পর পত্র লেখা প্রভৃতি ব্যাপারে ইংরেজিভাষা-ব্যবহার অপমানজনক বলে গণ্য হ'ত।

কালান্তর

ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লির দরবারের উদ্যোগ হল। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সংঘর্ষের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায়, আমার সেই লেখার কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য; পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে? সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সংঘর্ষ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সংঘর্ষ সে হল বিক্রম সংঘর্ষ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সংঘর্ষ সেইটেকেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ্য পেতেন; সেদিন তাঁর দ্বার অব্যাহত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য সকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন রূপগতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রে শস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয়-বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই পড়ে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করাবার জন্তেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভূত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে, কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।

বরঞ্চ এই রকম কৃত্রিম উৎসবে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয়

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ খুব কঠিন হয়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের মানবসম্বন্ধ নেই, যান্ত্রিক সম্বন্ধ। এ দেশের সঙ্গে তার লাভের যোগ আছে, ব্যবহারের যোগ আছে, হৃদয়ের যোগ নেই। কর্তব্যের জালে দেশ আবৃত, সেই কর্তব্যের নৈপুণ্য এবং উপকারিতা স্বীকার করলেও আমাদের মানবপ্রকৃতি স্বভাবতই সেই প্রাণহীন শাসনতন্ত্রে পীড়া বোধ করে।

এই বেদনাই মনে নিয়ে আমার লেখায় আমি বিশেষ করে এবং বার বার করে বলেছি যে, ভারতবাসী যদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দান কোনো-একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাক, তার চেয়ে দুর্গতি আমাদের আর হতেই পারে না। সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই রকম ধারণা মনে বন্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে নিজে ষথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এ নয় যে, এ দেশ বিদেশীর শাসনাধীনে। আসল কথাটা এই যে, যে দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা ত্যাগের দ্বারা, তপস্বী দ্বারা, জ্ঞানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি; একে অধিকার করতে পারি নি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই আমরা অধিকার করি; তারই 'পরে অন্তায় আমরা মরে গেলেও সহ্য করতে পারি নে। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশ পরাধীন ব'লেই তার সেবা সম্বন্ধে দেশের লোক উদাসীন। এমন কথা শোনবার যোগ্য নয়। সত্যকার প্রেম অমুকুল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর দিয়ে যতই আত্মত্যাগ করতে উচ্চত হয়। বাধা পেলে তার উত্তম বাড়ে বই কমে না। 'আমরা কন্‌গ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ

কালান্তর

প্রকাশ করেছি ; কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নার আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অক্ষসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিচার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্ঠা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্যোগ করি নি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই ব'লেই ভোলাই যে, যে দিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সূদূরে ঠেকিয়ে রাখা, অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক নিরুদ্ভম দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব।

আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই। দেশের 'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি সেই পরিমাণেই অন্তে তাকে অধিকার করেছে। এই চিন্তা করেই এক দিন আমি 'স্বদেশী সমাজ' নাম দিয়ে একটি বক্তৃতা করেছিলুম। তার মর্মকথাটা আর-এক বার সংক্ষেপে বলবার প্রয়োজন আছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিচার ব্যবস্থা করেছে, ভূষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা ; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজার রাজ্য নিরন্তরই রাজস্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে, যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অনবদ্য ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনাই হাতে।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের ; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি । রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বহু থাকে দেশের মর্মস্থান ; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে । রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায় । গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে । কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিত্তর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত ।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে । গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে । যখন থেকে এই অধিকার পাকা হয়ে উঠল তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দিঘিতে গেল জল শুকিয়ে, জীর্ণ মন্দিরে শূন্য অতিথি-শালায় উঠল অশুধ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা-মকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্তে অজ্ঞানে অধর্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল ।

সকলের চেয়ে বিপদ হল এই যে, দেশ দেশের লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়া পায় না । জলদান বিজ্ঞাদান সমস্তই সরকার-বাহাছুরের মুখ তাকিয়ে । এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে । দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধস্থলে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ । আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে এ কথা বলাও বা, আর, আগে ধন লাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে এ কথা বলাও তাই । দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলা উচিত—বস্তুত সেই অবস্থার সম্বন্ধের দাবি বাড়ে বই কমে না । স্বদেশী-সমাজে তাই আমি বলেছিলাম ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর-কেউ আমাদের রাজা

কালান্তর

এই কথাটা নিয়ে বকাবকি ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা নিজের দেশকে নিয়ে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংঘবদ্ধ আকারে কেমন করে দেশে বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে, স্বদেশী-সমাজে আমি তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলুম। খন্দর-পরা দেশই যে সমগ্র দেশের সম্পূর্ণ আদর্শ এ কথা আমি কোনোমতেই মানতে পারি নে; যখন দেশের আত্মা সজাগ ছিল তখন সে যে কেবলমাত্র আপন তাঁতে বোনা কাপড় আপনি পরেছে তা নয়, তখন তার সমাজে তার বহুধা শক্তি বিচিত্র সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করেছে। আজ সমগ্রভাবেই সেই শক্তির দৈন্ত ঘটেছে, কেবলমাত্র চরকার সূতো কাটবার শক্তির দৈন্ত নয়।

আজ আমাদের দেশে চরকালঙ্ঘন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড়শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা— এতে চিন্তাশক্তির কোনো আস্থান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে যে আমন্ত্রণ সে তো কোনো বাহু প্রক্রিয়ার অঙ্ক পুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্তে আবশ্যিক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধন; সে কি এই চরকা-চালনার? চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহু অমুঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এত কাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি? আমাদের দেশের সব চেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়? আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে, বুদ্ধি চাই নে, বিজ্ঞা চাই নে, প্রীতি চাই নে, পৌরুষ চাই নে, অন্তর-প্রকৃতির মুক্তি চাই নে, সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে এক-মাত্র ক'রে চাই, চোখ বুজে, মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহু সহস্র বংসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন ক'রে? স্বরাজ-সাধন-যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

কি অগমান করা হয় না ?

বস্তুত যখন সমগ্রভাবে দেশের বুদ্ধিশক্তি কর্মশক্তি উত্তম থাকে তখন অন্য দেশ থেকে কাপড় কিনে পরলেও স্বরাজের মূলে আঘাত লাগে না। গাছের গোড়ার বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না, যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাণাত্ম থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজী এমন কোনো দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করছে— কেবল এক দিকে নয়, কেবল বণিকের মতো পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিজ্ঞা-অর্জনে, বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। সে দিকে যদি আমাদের দেশে অভাব থাকে তবে নিজের হাত ছুটোকে মনোবিহীন কল-আকারে পরিণত করে আমরা যতই সূতো কাটি আর কাপড় বুনি আমাদের লজ্জা যাবে না, আমরা স্বরাজ পাব না।

আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে। আপন পক্ষের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে আছি বলেই অপর পক্ষের কথা নিয়ে এত অত্যন্ত অধিক করে আমরা আলোচনা করে থাকি। তাতে শক্তিশ্রাস হয়। স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই। সে পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত। দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোনো বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অসুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে, এ

কালান্তর

কথা আমি বিশ্বাস করি নে। আগে আমাদের বাহিরের বাধা দূর হবে, তার পরে আমাদের দেশপ্ৰীতি অন্তরের বাধা ভেদ করে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেশের সেবায় নিযুক্ত হবে, এমন আশ্ববিড়ম্বনার কথা আমরা যেন না বলি।) যে মানুষ বলে 'আগে ফাউন্টেন-পেন পাব তার পরে মহাকাব্য লিখব', বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন-পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে 'আগে স্বরাজ পেলে তার পরে স্বদেশের কাজ করব', তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটোর 'পরেই। একজন আর্টিস্টকে জানি, তিনি অনেক দিন থেকে বলে এসেছিলেন, 'রীতিমতো স্টুডিয়ো আমার অধিকারে না পেলে আমি হাতের কাজ দেখাতে পারব না।' তাঁর স্টুডিয়ো জুটল, কিন্তু হাতের কাজ আজও এগায় না। যত দিন স্টুডিয়ো ছিল না তত দিন ভাগ্যকে ও অন্ত সকলকে ক্লপণ বলে দোষ দেবার সুযোগ তাঁর ছিল; স্টুডিয়ো পাবার পর থেকে তাঁর হাতও চলে না, মুখও চলে না। 'স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।'

অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

নারী

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আত্মশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্যে অনেক যুগ গেছে ঢালাই-পেটাई-করা মিস্ত্রির কাছে। সেটা আধখানা শেষ হতে না হতেই প্রকৃতি শুরু করলেন জীবসৃষ্টি, পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল ক'রে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রবৃত্তি স্বভাবতই চিন্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে যা বন্ধনজাল গাঁথছে নিজেকে ও অন্তকে ধরে রাখবার জন্যে— প্রেমে, স্নেহে, সাক্ষর বৈধে। মানবসংসারকে গড়ে তোলবার, বেঁধে রাখবার এই আদিম বাধুনি। এই সেই সংসার যা সকল সমাজের, সকল সভ্যতার মূল ভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা বিধা-বিহীন। সেই আদিপ্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেইজন্য নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত— তা প্রয়োজন-অনুসারে বিধিপূর্বক খনন করা

কালান্তর

অলাশয়ের মতো নয়, তা উৎসের মতো যার কারণ আপন অহৈতুক
রহস্তে নিহিত ।

প্রেমের রহস্ত, মেহের রহস্ত অতি প্রাচীন এবং চূর্ণম । সে আপন
সার্থকতার জন্তে তর্কের অপেক্ষা রাখে না । যেখানে তার সমস্তা সেখানে
তার ক্ষত সমাধান চাই । তাই গৃহে নারী যেমনি প্রবেশ করেছে
কোথা থেকে অবতীর্ণ হল গৃহিণী, শিশু যেমনি কোলে এল মা তখনই
প্রস্তুত । জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে । সে আপন
জায়গা খুঁজে পায় সন্ধান ক'রে, বুদ্ধ ক'রে । বিধা মিটিয়ে চলতে তার
সময় যায় । এই বিধার সঙ্গে কঠিন বন্ধেই সে সবলতা ও সফলতা লাভ
করে । এই বিধাতরঙ্গের ওঠাপড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়,
সাংঘাতিক ভ্রম জন্মে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় বিপর্যস্ত
ক'রে । পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নূতন ক'রে বাঁধতে
হয় তার কীতির ভূমিকা । পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কর্ম
কেবলই দেহপরিবর্তন করে । অভিজ্ঞতার এই নিত্যপরিক্রমণে যদি
তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ক্রটিসংশোধনের অবকাশ
না পায় তবে জীবনবাহনের ফাটল বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে তাকে
টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে । পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল
থেকে এই রকম ভাঙাপড়া চলছে । ইতিমধ্যে, নারীর মধ্যে প্রেমসী,
নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ
করে চলেছে । এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে
মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে । সেই প্রলয়াবেগ যেন বিশ্ব-
প্রকৃতির প্রলয়লীলারই মতো, ঝড়ের মতো, দাবদাহের মতো—
আকস্মিক, আত্মঘাতী ।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নূতন আগন্তুক । আজ পর্যন্ত
কত বার সে গড়ে তুলেছে আপন বিধিবিধান । বিধাতা তাকে তার

নারী

জীবনের পথ বাধিরে দেন নি ; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ
বানিয়ে নিতে হল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর-এক
কালে, উল্টিরে গেল তার ইতিহাস। করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সত্যতার উলট-পালটের ভিতর দিয়ে নারীর জীবনের মূল
ধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়সম্পদ দিয়েছেন
নিত্যকৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসারে পরখ
করতে দেওয়া হয় নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে ধোরায়। অধিকাংশ
পুরুষই জীবিকার ভণ্ডে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তার
ইচ্ছার, তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পরিশ্রমে নানা কাজের
শিক্ষা তার করা চাই— তাতে বারো আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা
পায় না। কিন্তু গৃহিণীরূপে, জননীরূপে মেয়েদের যে কাজ সে তার
আপন কাজ, সে তার স্বভাবসংগত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিকূলতাকে বীর্যের দ্বারা নিজের অনু-
গত করে পুরুষ মহত্ত্ব লাভ করে। সেই অসাধারণ সার্থকতার উত্তীর্ণ
পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হৃদয়ের রসধারায় আপন সংসারকে শস্তশালী
করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতির কাছ
থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব ; মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের সহজে লাভ
করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে চূর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে,
কোনো শিক্ষার, কোনো কৃত্রিম উপারে সংসারক্ষেত্রে সে সার্থকতা
পায় না।

যে সহজ অনায়াসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক
কারণ অন্তের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ-ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান
নিজের একান্ত প্রয়োজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অমূর্ষের দেশের
পক্ষে স্বাধীন থাকা সহজ। যে পাখির ডানা স্তম্ভর ও কঠোর মধুর

কালান্তর

তাকে খাঁচার বন্দী করে মানুষ গর্ব অমুভব করে ; তার সৌন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির, এ কথা সম্পত্তিলোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ সুদীর্ঘকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাধন-মানা প্রবণতা আছে, সেইজন্তে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তুত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈব্যক্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না, সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ তত্ত্বের আনন্দ নয় ; এমন কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তার বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবান্বিত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় নি। এইজন্তে নির্বিচারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলাবুদ্ধি মুচমতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেয়ের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সব চেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই-যে সব আবিলা মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অন্ধ বিচারবুদ্ধির উপরেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিন্তের বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্বত্রই সীমানা ভাঙার যুগ এসে

নারী

পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ধিরে রাখতে পারে না— তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাত্যন্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচারবিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের বাল্যকালে ঘরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পান্ডির যুগ। মামী ঘরে সেই পান্ডির উপরে পড়ত ঘেটাটোপ। বেধুন স্কুলে যে মেয়েরা সবপ্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি ঘরখোলা পান্ডিতে ইঁসুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে সেটা অন্ন পীড়া দেয় নি। সেই একবস্ত্রের দিনে সেমিঙ্গ পরাটা নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়িতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পান্ডির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মূছপদে যায় নি, দ্রুতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে— এ নিয়ে কাউকে সভাসমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই-যে বাহিরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইরেই থেকে যায় না। অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদের

কালান্তর

যে মনোভাব বদ্ধ সংসারের উপযোগী, মুক্ত সংসারে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড়ো করে চিন্তা করতে, বিচার করতে আরম্ভ করে। তার পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করার কাজ আপনিই শুরু হতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানা রকম ভুল করতে পারে, কিন্তু বাধায় ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হতে হবে। সংকীর্ণ সীমায় পূর্বে মন যে রকম করে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চারি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দুঃখ আছে, বিপদও আছে; কিন্তু সেই ভয় ক'রে আধুনিক কালের শ্রোতাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোটো পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ শিকার দরকার ছিল না বলেই এক দিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এতই বিকল্পতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন করত না, মেয়েদের বেলায় সেগুলিকে সযত্নে প্রশ্রয় দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল যে মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনকর্তাদের। তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ার যথেষ্ট শাসনের সুযোগ রচনা করে; মহুশ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সম্বৃষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুগ্ধ অবস্থাই অমুকুল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই-যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই-যে মুক্ত সংসারের অগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে ক'রে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের অন্বে তাদের বিশেষ

নারী

ক'রে বুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভদ্র মেয়েদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লজ্জা, পূর্বকালে মেয়েদের ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সবকিছু অনৈপুণ্যের অধ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ, গার্হস্থ্য বাজার-দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিশ্বের বাজারেও বোলো আনা খাটছে না। যে বিজ্ঞান মূল্য সার্বভৌমিক, যা আন্তঃপ্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবি ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাত্রীর মহার্ঘতা যাচাইয়ের অস্ত্রে অনেক পরিমাণে সেই বিজ্ঞান সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বময়াজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে এক দিন পৃথিবী আপন তপ্ত নিশ্বাসের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারে নি। অবশেষে এক দিন তার মধ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিভে আরম্ভ হল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনি এক দিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ ক'রে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে বা মুক্ত আকাশের, বা সর্বলোকের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজড়িমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দারিদ্র্য তাদের

কালান্তর

স্বীকার করতেই হবে ; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা ।

আমার মনে হয়, পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে । অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে । এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ । মেয়েরা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ । এই সভ্যতা হয়ে ছিল এককোঁকা । এই সভ্যতায় মানবচিন্তের অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে ; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কৃপণের জিন্মার আটকা পড়ে ছিল । আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে ।

তরুণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পঞ্চস্তরের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত সেই অরণ্য বহুলক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্যতেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায় । সেই-সব অরণ্য ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল । সেই পাতালের দ্বার যে দিন উদ্ঘাটিত হল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্যতেজকে পাখুরে কয়লার আকারে লাভ করল আপন কাজে ; তখনই নূতন বল নিয়ে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল ।

এক দিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতার বাহিরের সম্পদ নিয়ে, আজ তেমনি অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল । ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে । এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তে এই-যে নূতন চিন্তের যোগ, সভ্যতায় এ আর-একটি তেজ এনে দিলে । আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে চলছে । একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে তারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে । প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে । এই সভ্যতার বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে

নারী

পারবে না। একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্যাণের ভূমিকায় নূতন সত্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে— প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়— যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে মানবসমাজে তারা জন্মেছে সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সকল বিভাগেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধ সংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাঙ্গবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি, কেবল ঘরের লোককে নয়, সকল লোককে রক্ষার জন্তে কার্যমনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সত্যতাচূর্ণের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে— তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো-একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো হয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহতি দিয়ে; রাষ্ট্র-স্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদের তাতে রক্তবহু করে। এ সত্যতা কমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়যুক্ত করে এ সত্যতা বধ করে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরুপায় প্রাণী; এ সত্যতার জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ করে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অন্ত জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সত্যতার পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পাঙ্কিত। এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সত্যতা আপন মুখল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শান্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, কিন্তু কলের শান্তি তাদের কাছে লাগবে না শান্তির উপায় তাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হননকারী

কালান্তর

একটা নাড়াচাড়া ঘটতে গেলে মন্দিরের ভিত হবে বিদীর্ণ। প্রাণবান সৃষ্টির ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেও বড়ো রকম বিপর্যয় সাধন করবার যোগ্য অসামান্য চারিত্রশক্তি এ দেশে সম্প্রতি কোথাও দেখা যাচ্ছে না, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। দেশের যে-একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজির শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরই সহযোগিতার রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুমি জান আমার স্বভাবটা একেবারেই সনাতনী নয়— অর্থাৎ খুঁটিগাড়া মত ও পদ্ধতি অতীত কালে আড়ষ্ট ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকলেই যে শ্রেয়কে চিরস্তন করতে পারবে, এ কথা আমি মানি নে। বর্তমান কংগ্রেস যত বড়ো মহৎ অনুষ্ঠানই হোক না কেন তার সমস্ত মত ও লক্ষ্য যে একেবারে দৃঢ়নির্দিষ্ট ভাবে নির্বিকার নিশ্চল হয়ে গেছে, তাও সত্য হতেই পারে না। কোনো দিনই তা না হোক, এই আকাজকা করি। কিন্তু এই কংগ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কংগ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ এ'কে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয়, এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে থেকে কাটাছেঁড়া করে নয়।

ইতিপূর্বে কংগ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি, স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেরকার উপরওয়ালার দিকে। পরবশতার ধাত্মী-ক্রোড়েই তার স্বাধীনতা আশ্রয় নিয়ে আছে, এই স্বপ্ন তার কিছুতে ভাঙতে চায় নি। সেদিনকার হাতজোড়-করা দোহাই-পাড়া বৃষ্টি-

কনগ্রেস

ফৌজের চিত্তদৈন্তকে বার বার ধিক্কার দিয়েছি, সে তুমি জান। হঠাৎ সেই তামসিকতার মধ্যে দেশের সুপ্ত প্রাণে কে ছুঁইয়ে দিলে সোনার কাঠি, জাগিয়ে দিলে একমাত্র আত্মশক্তির প্রতি ভরসাকে, প্রচার করলে অহিংস সাধনাকেই নির্ভীক বীরের সাধনারূপে। নব জীবনের তপস্কার সেই প্রথম পর্ব আজও সম্পূর্ণ হয় নি, আজও এ রয়েছে তাঁরই হাতে যিনি একে প্রবর্তিত করেছেন। শিবের তপোভূমিতে নন্দী দাঁড়িয়ে ছিলেন ওষ্ঠাধরে তর্জনী তুলে, কেননা তপস্কা তখনো শেষ হয় নি— বাইরের অভিঘাতে তাকে ভাঙতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল।

এই তো গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের সম্বন্ধেও ভাবনার কারণ প্রবল হয়ে উঠেছে। কনগ্রেস ষত দিন আপন পরিণতির আরম্ভ-যুগে ছিল, তত দিন ভিতর দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, শত্রুর সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত পৃথিবী। সে কালের কনগ্রেস যে রাজদরবারের ক্রন্দন ঘারে বৃথা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরত আজ সেই দরবারে তার সম্মান অব্যাহত, এমন কি সেই দরবার কনগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে কুঠা বোধ করে না। কিন্তু মনু বলেছেন, সম্মানকে বিষের মতো জানবে। পৃথিবীতে যে দেশেই যে-কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণবিষ উদ্ভাবিত করে। ইম্পিরিয়ালিজম্ বলো, ফাসিজম্ বলো, অস্তুরে অস্তুরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কনগ্রেসেরও অস্তুরসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যারা এর কেন্দ্র হলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরম্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে স্বার্থ ভাবে কনগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত,

কালান্তর

তার ব্যাভিচার ঘটতে দেখা গেছে ; এই ব্যবহারবিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব। খৃস্টান শাস্ত্রে বলে, ক্ষীণকারী সম্পদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশপথ সংকীর্ণ। কেননা ধনাভিম্যনী কমতা আনে তামসিকতা। কনগ্রেস আজ বিপুল সম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্বর্গরাজ্যের পথ করছে বন্ধুর। মুক্তির সাধনা তপস্চার সাধনা। সেই তপস্চার সাধিক, এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপস্কেন্দ্রে যারা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদার ভাবে নিরাসক্ত ? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিস্তৃত সত্যেরই জন্তে ? তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত ? ভিতরে ভিতরে কনগ্রেসের মন্দিরে এই-যে শক্তিপূজার বেদি গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন ? সত্যের যজ্ঞে যে কনগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী, তার বিস্তৃততা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপূজায় নরবলি-সংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিটলার যাদের আদর্শ ? আমি সর্বাত্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে ; যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কনগ্রেসের দুর্গঘারের ঘারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি ? এত দিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই, এই প্রশ্নে সে কথা কবুল করব।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলা দরকার। গত কনগ্রেস-অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে, এই

কনগ্রেস

অভিযোগ বাংলা দেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে। চার দিকে সকলেই বিরুদ্ধ চক্রান্ত করছে, সর্বদা মনের মধ্যে এই রকম সংশয়কে আলোড়িত হতে দেওয়া মনোবিকারের লক্ষণ। দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কনগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য। যে বিচ্ছেদের বাহন স্বয়ং ধর্মমত তার মতো দুর্লভ্য আর-কিছু হতে পারে না। কিন্তু এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের যে আত্মীয়বৃদ্ধির কাণতা তার কারণ পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের অভাব ও আচারের পার্থক্য। এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে। যে দেশের আচার অন্ধ জিদ-ওয়ালা নয়, যে দেশের ধর্মভেদ সামাজিক জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে নি, সেই দেশে রাষ্ট্রিক ঐক্য স্বতই সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের দেশে কনগ্রেস সেই সাধারণ সামাজিক ঐক্যের ভিতর থেকে আপনি সজীব ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাকে স্থাপন করা হয়েছে এমন একটা সামাজিক অনৈক্যের উপরে, যে অনৈক্য প্রত্যেক পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অভিলম্পর্শ গর্ত খুঁড়ে রেখেছে এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষক দল।

কারণ যাই হোক, প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন-এক লেখায় ছিল, যে জীর্ণ গাড়ির চাকাগুলো বিলিষ্ট, মড়মড়্ তলুতলু করে যার কোচবারু, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যত কণ দড়ি দিয়ে বেঁধেঁধে আস্তাবলে রাখা হয় তত কণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য করণা করে সম্ভাব্য প্রকাশ করতে পারি,

কালান্তর

কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাখায় বের করা হয় অমনি তার আত্ম-বিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষের মুক্তিযাত্রাপথের রথখানাকে আজ কংগ্রেস টেনে রাখায় বের করেছে। পলিটিক্সের দড়ি-বাঁধা অবস্থায় চলতে যখন শুরু করলে তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই। অবস্থাটা যখন এমন তখন কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষদের অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলা কর্তব্য। কেননা, সন্দিক্ত মন সকল প্রকার আঘাত ও অবৈধতাকে অতিমাত্র করে তোলে। তাই ঘটেছে আজ। সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে কংগ্রেসের বন্ধনে টান পড়েছে ছেঁড়বার মুখে। এর অত্যাবশ্যিকতা ছিল না। সমগ্র একটা বড়ো প্রদেশের এ রকম মনশ্চাঞ্চল্যের অবস্থায় বাংলা দেশের নেতাদের ঠিক পথে চলা দুঃসাধ্য হবে।

বুঝতে পারছি স্বদেশকে স্বাভাবিকতার উদ্দেশ্যে মহাত্মাজির মনে একটা বিশেষ সংকল্প বাঁধা রয়েছে। মনে মনে তার পথের একটা ম্যাপ তিনি এঁকে রেখেছেন। অতএব পাছে কোনো বিপরীত মতবাদের অভিঘাতে তাঁর সংকল্পকে ক্ষুণ্ণ করে, এ আশঙ্কা তাঁর মনে থাকে স্বাভাবিক। তিনিই দেশকে এত দিন এত দূর পর্যন্ত নানা প্রমাদের মধ্য দিয়েও চালনা করে এনেছেন; সেই চালনার বাবস্থাকে শিথিল হতে দিতে যদি তিনি শঙ্কিত হন তা হলে বলব না যে সেই শঙ্কা একাধিপত্যপ্রিয়তার লোভে। প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষমাত্রেরই নিজের ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় না থাকলে তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। এই বিশ্বাসকে তাঁরা ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ধর ক'রে রাখেন। মহাত্মাজির সেই বিশ্বাস যে সার্থক, নোটের উপর তার প্রমাণ পেয়েছেন গুরুতর ভুলচুক সত্ত্বেও। এবং তাঁর মনে যে পরিকল্পনা আছে সেটাকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করতে তিনি

কনগ্রেস

ছাড়া আর-কেউ পারবে না, সেও তিনি বিশ্বাস করেন। সকল প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরই এই রকম বিশ্বাসে অধিকার আছে। বিশেষত যখন তাঁর কৃত অসমাপ্ত সৃষ্টি গড়ে ওঠবার মুখে। হয়তো মহাত্মাজির স্মরণশালার আরও অনেক মূল্যবান নূতন উপকরণ যোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই যোগ করা যদি ঐর্ষ্যের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার না ঘটে তা হলে সমগ্রেরই হবে ক্ষতি। এ অবস্থার মূল সৃষ্টিকর্তার উপর নির্ভর রাখতেই হবে। আমি নিজের সহজে এ কথা স্বীকার করব যে, মহাত্মাজির সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার মতের ঐক্য নেই। অর্থাৎ, আমি যদি তাঁর মতো চারিত্রপ্রভাবসম্পন্ন মানুষ হতেম তা হলে অল্প রকম প্রশালীতে কাজ করতুম। কী সে প্রশালী, আমার অনেক পুরাতন লেখায় তার বিবরণ দিয়েছি। আমার মননশক্তি যদি বা থাকে কিন্তু আমার প্রভাব নেই। এই প্রভাব আছে জগতে অল্প লোকেরই। দেশের সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ যদি সে রকম শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয় তবে তাঁকে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে, তাঁর কর্মধারাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারব না। সময় আসবে যখন ক্রমে অভাব-ক্রটির মোচন হবে এবং সেই অভাবমোচনে আমরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছাকে আপন বোগ্যতা অনুসারে প্রবৃত্ত করতে পারব। সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সে দিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মতো বলব না, তার উর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরও আছে এবং তার অন্তে আরও মাঝির দরকার হবে।

আমার মনে যে পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল তার কথা পূর্বেই বলেছি। আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত ; কোনো দেশেরই ইতিহাসে তার অন্তর্থা হয় নি ; সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইয়ারতের করণার মুগ্ধ হয়ে কোনো লাভ নেই। সমুদ্রের

কালান্তর

ও পারে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের, নানা আয়তনের, অন্নতোরণের চূড়া, কিন্তু তাদের কোনোটারই ভিত গাড়া হয় নি বালির উপরে। যখন লুক মনে তাদের উপরতলার অক্ষুরণে প্লাস্টিক আঁকব তখন দেশের সামাজিক চিন্তের মধ্যে নিহিত ভিত্তির রহস্যটা যেন বিচার করি।

কিছু দিন হল একটি বিরল-বসতি পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আছি সন্ত-উন্নতিত রাষ্ট্রিক উদ্ভেজনা থেকে দূরে। অনেক দিন পরে ভারতবর্ষকে এবং আপনাকে শাস্ত্রমনে দেখবার অবকাশ পাওয়া গেল। দেখছি চিন্তা করে, মানবজগতে দুই প্রবল শক্তি নিয়ে পলিটিকসের ব্যবহার। একটার প্রয়োগ বাহিরের দিকে, সেটা যন্ত্রশক্তি; আর-একটার কাজ মানুষের মন নিয়ে, সেটাকে বলতে পারি মস্তশক্তি। আজ যুরোপের সংকটের দিনে এই দুই শক্তির হিসাব গণনা ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে পদচারণা করছে।

বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই শক্তির কোনোটারই সহজসাধ্য নয়, অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগশিক্ষা-চর্চা। বহু কাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাশ্চর্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার কেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালি খাল কেটে কুমির ডেকে আনা। তাতে কুমিরের পেট ভরে অবিবেচক খাল-কাটির খরচার। তা ছাড়া অমঙ্গল-প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহু কালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো-একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে

কনুগ্রোস

তিতুমীরের বাঁশের কেলায় । এক দিন ছিল বখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই । এখন এসেছে সায়ান্স, শিক্ষিত বুদ্ধির 'পরে ভর ক'রে । শুধু বুদ্ধি নয়, তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল । অথচ আমাদের লড়াতে হবে শূন্য তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত—যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে নয় অন্ধ হয়ে ছোটে । দেশের পলিটিক্সের আদর্শ হয়েছিল এই ছুরুহ সমস্তা নিয়ে । সেইজন্মে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকা বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেন্ট দিয়ে । সেটা দাঁড়িয়েছিল খেলায় । এই রিক্ততার সমস্তা নিয়েই এক দিন মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন বিপুল শক্তিমান প্রতিদ্বন্দীর সামনে ; ছুঃখ সবে'ছিলেন, মাথা হেঁট করেন নি । বিনা যুদ্ধশক্তিতে লড়াই যে চলতে পারে এইটে প্রমাণ করতে তাঁর আসা । একটা একটা উপলক্ষ্য নিয়ে তিনি লড়াই শুরু করে দিলেন ; কোনোটাতে যে শেষ পর্যন্ত জিতেছেন তা বলতে পারি নে, কিন্তু পরাভবের মধ্যে দিয়ে জেতবার ভূমিকা সৃষ্টি করছেন । ক্রমে ক্রমে সেই মন তৈরি করছেন যে মন তাঁর সংকল্পিত অস্ত্র বধাযোগ্য সংঘম ও সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে । এই অস্ত্র ছাড়া কেবল যে আমাদেরই উপায়ান্তর নেই তা নয়, সমস্ত পৃথিবীরই এই দশা । হিংস্র যুদ্ধ নিরস্ত ; সে একই কেন্দ্রের চারি দিকে ধ্বংসসাধনের ঘুরপাক খাওয়ায়, তার সমাপ্তি সর্বনাশে ।

হিংস্র যুদ্ধের ফৌজ তৈরি করা সহজ, বহুরথানেকের কুচকাওয়াজে তাদের চালিয়ে দেওয়া যায় রণক্ষেত্রে । কিন্তু অহিংস্র যুদ্ধে মনকে পাকা করে তুলতে সময় লাগে । অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল ; তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ তাণ্ডা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান । এমন কি পাশব শক্তির রীতিমতো ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ।

কালান্তর

পৃথিবীতে আজ যে-সব জাতি যে-কোনো রকম লড়াই চালাচ্ছে তাদের সকলেরই জোর সর্বজনীন জনশিক্ষায়। বর্তমান যুগ শিক্ষিত বুদ্ধির যুগ, স্পর্ধিত মাংসপেশীর যুগ নয়। আপানের তো কথাই নেই — বড়ো বড়ো অন্ত সকল প্রাচ্য জাতিই সর্বত্র জনশিক্ষায়ত্ন খুলেছেন। আজকের দিনে আমরা দেশের বহু কোটি চোখ-বাঁধা মোহের বাহন নিয়ে এগোতে পারব না। মহাত্মাজি অসহযোগ আন্দোলন স্বগিত রেখে জনশিক্ষায় মন দিয়েছেন। বোধ করি প্রমাণ পেয়েছেন, ভিড় জমিয়ে অসহযোগ দেখতে দেখতে অসহ হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্‌স্‌কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে, স্পষ্ট বুঝতে পারি নে এ-সকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্‌স্‌ প্রবীণ নই। এ কথা জানি, যারা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজিই তার প্রমাণ। তবু, তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা প্রত্বেয় নয়। অন্ত কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তা হলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবেন না। সেজন্ত হয়তো অভ্যস্ত পথে যুধত্রষ্ট হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে। কনুঞ্জের অভিযুখে যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনতিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অতিব্যক্তি— কিন্তু দূরের থেকে। কেননা দেশের জননায়কতার দায়িত্ব অত্যন্ত বৃহৎ; তার ভালোমন্দ ফলাফল বহুদূরব্যাপী, অনেক সময়েই তা অশাবনীয়। নিজের উপরে ধার স্থির বিশ্বাস আছে তিনিই তা বহন করতে পারেন, কিন্তু এ সকল পোলিটিক্যাল প্রয়াস আমার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লে আমি

কনগ্রেস

অমুভব করি নে। পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার নিজের এত দিনের অভ্যস্ত পথেই আমি সাফল্য পাই। গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্রে এই কথা বলে। স্বদেশসেবার সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন-সকল অমুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, স্ত্রীরকে নির্মলকে আবাহন ক'রে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষার আত্মকল্যাণসাধনে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা ক'রে সকলে সম্মিলিত হতে পারে। আমার সামান্ত শক্তিতে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এই কাজে মন দিয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর ধ'রে। মহাত্মাজি যখন স্বদেশকে জাগাবার ভার নিয়েছিলেন তখন একান্তমনে কামনা করেছিলুম, তিনি জনগণের বিচিত্র শক্তিকে বিচিত্র পথে উদ্‌বোধিত করবেন— কেননা আমি জানি, দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।

আজ আমি জানি, বাংলা দেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষ-চন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা ক'রে আসছেন সে পলিটিকসের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে, সেই ধূলিচক্রে মধ্য আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকে-কার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন ঝাঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি স্তূটসংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসারে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই

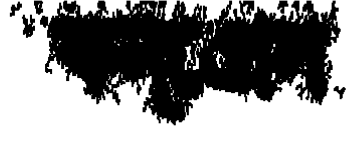
কালান্তর

দিয়ে। বাংলা দেশের সার্বকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভার। সেই সার্বকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্তার।

মংপু

২০।৫।৩২

অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বস্তুব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি। হিন্দু মুসলমানের চাকরির হার-বাটোরারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন-দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নামস্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। দীর্ঘ কাল চাকরির অরে বাঙালির নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের ভারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক— তা হলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে, শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরতার বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে; এই দুঃখের ধাক্কাতেই আনবে যুগান্তর। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি। তার একটি মাত্র কারণ আছে। স্বজাতির দুই শ্রেণীর মধ্যে পক্ষপাতের অন্তায় বিচার দেখলে শাসনকর্তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, তার ফলাফল তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে দুই অসমান বাটখারায় অবিভাগের শোচনীয় পরিণাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শাস্ত করবার অবকাশ থাকবে না। পৃথিবীতে হিটলার-মুসোলীনির দল অন্য় করবার অপ্রতিহত সুযোগ পেয়েছেন নিজের প্রবল শক্তির থেকে। তারও একটা ভীষণ মহিমা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নীচের তলার শাসনকর্তারা সুযোগ পেয়েছেন উপরতলার প্রশ্ন থেকে —এই অবিমিশ্র অন্তায়ে পৌঁছব নেই। তাই যারা অবিচার সহ



করতে বাধ্য হয় তাদের মনে সন্দেহ জাগে না, অশ্রদ্ধা জাগে। দেশ-
শাসনের ইতিহাসে এই ব্য্তিটা হয়। কিন্তু আমাদের সমস্তা এই
শাসনকর্তাদের নিয়ে নয়। কেননা শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই;
কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের
শরিক — অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সব্বন্ধের মধ্যে যদি গভীর ক'রে
কাটা বি'ধিরে দেয় তবে তার বক্তব্যাবী কত শীঘ্র নিরাময় হবে না।
তাই আজ যে ব্যবহার মুসলমানের জয়ার ঘরে ভুক্ত করছে সুবিধা,
দীর্ঘ কালের হিসাবে সেটা রয়ে যাবে নিরন্ত ক্রতির ছিদ্ররূপে। তা
ব'লে এই চিন্তায় হিন্দুদের সাস্বনার কথা নেই, কেননা আমাদের
ইতিহাসের তহবিল সাধারণ তহবিল।

আষাঢ় ১৩৪৬

আরোগ্য

আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারি নি, এ রকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল। আমার বার্ধক্য এবং আমার রোগের দুর্বলতা আমাকে সমস্ত বহির্বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আজ আমার সেই দূরত্ব থেকে তোমাদের যদি কিছু বলি তো সংক্ষেপে বলব। কেননা বাহিরের কোনো কাজে অধিক ক্ষণ মনোযোগ দিতে আমার নিষেধ আছে, কেবল যে ডাক্তারের তা নর, আমার রোগজীর্ণতারও।

যৌবনের তেজ যখন প্রখর ছিল, ভাবতুম, বার্ধক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হয়ে সেই দশা মৃত্যুর সূচনা করে। কিন্তু আজ আমি এর ভাবাত্মক দিক ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছি। সম্ভার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। ঠিক মনে হচ্ছে, যেমন পরিণত ফল তার বাহিরের খোসাতে আর আসক্ত হয়ে থাকে না, সেই খোসাটা ক্রমশ তার পক্ষে নিরর্থক হয়ে ওঠে। তখন তার প্রধান সম্পদ হয় ভিতরের শস্য। কাঁচা অবস্থায় সেই শস্যের পরিণত রূপ সে অনুভব করতে পারে না, এইজন্যে তাকে বিশ্বাস করে না। তখন সে আপনার বাহিরের পরিচয়েই বাহিরে পরিচিত হতে চেষ্টা করে, সেখানে কোনো আঘাত পেলে সে পরম ক্ষোভের বিষয় ব'লে মনে করে। বৃদ্ধ বয়সে তার বিপরীত দশা ঘটে। সে অন্তরের পূর্ণতার মধ্যে আপনাকে যত উপলব্ধি করতে পারে ততই একটা পরম আশ্বাস লাভ করে এবং ততই বাহিরের কৃতি অথবা অসম্মান তাকে আর স্কন্ধ করতে পারে না। এ কথা কেউ যেন না মনে করে, এটা

আরোগ্য

একমাত্র বৃদ্ধ বয়সেরই অধিকারগত। বস্তুত অল্প বয়সে আমরা সংসারের বাহিরদিকেই সম্পূর্ণ মূল্য দিই ব'লেই সংসারে এত অশান্তি ঘটে এবং মিথ্যার সৃষ্টি হতে থাকে। কেননা এই বাহিরের দিকেই আমরা পরম্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন এবং একমাত্র আপনার মধ্যেই আবদ্ধ।

আজ আমি রোগের দশা অতিক্রম করছি ব'লেই আরোগ্য কাকে বলে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করি—কিন্তু যথার্থ আরোগ্য সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ। সেই আরোগ্যে আমরা সমস্ত বিশ্বভূবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগস্থাপন করতে পারি। জগতে আমাদের অস্তিত্ব আনন্দময় হয়ে ওঠে। তখন আমাদের দেহের অনুকূল অবস্থা। এই-যে আরোগ্যতত্ত্ব এটা দেহের অন্তরবিভাগের সম্পদ, অলক্ষ্যে সকল দেহে ব্যাপ্ত হয়ে কাজ করে। অনুস্থ হলেই সেই অন্তর্গত সামঞ্জস্য ভেঙেচুরে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পীড়িত করতে থাকে। তখন তার বিরোধের অবস্থা। সেই রকম আমাদের সম্ভার যে অন্তরবিভাগে আধ্যাত্মিক সত্য পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে তার প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ হয়, তখন সর্বত্র তার শান্তি এবং সকলের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য। এই আন্তরিক সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করবার সাধনায় কোনো বয়সের ভেদ নেই। তরুণ অবস্থায় নানা প্রকার আসক্তির আবির্ভাব এই উপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু ঠাৱা তাকে অতিক্রম ক'রে আপনার আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা সর্বত্র শান্তিলাভ করেন। কারণ তাঁরা মানবতার সত্যকে অনুভব করতে পারেন, এবং তাঁদের ভয় থাকে না, তাঁরা মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

মানব-ইতিহাসে কোনো কোনো জাতির মধ্যে এই সত্যের উপলব্ধির ইতিবিশেষ দেখা যায়। যুরোপীয় সভ্যতা প্রথম থেকেই বাহিরে আপনার সার্থকতা অন্বেষণ করেছে এবং লোভকে কর্ণধার ক'রে দেশে দেশে, বিশেষভাবে এশিয়ার ও আফ্রিকার, দখলবৃত্তি দ্বারা ধনসঞ্চয়

কালান্তর

করেছে। যে বিজ্ঞান বর্ধার আত্মসাধনার সহায় তাকে বিস্তৃত জ্ঞানের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে জগতে মহামারী বিস্তার করেছে। এই দুর্গতির অন্ত কোথায় জানি নে। অপর পক্ষে কোনো কোনো জাতি অপেক্ষাকৃত সহজে তাদের স্বভাবকে অনুসরণ করে বাহিরের চিত্তবিক্ষেপ থেকে শান্তিলাভ করে এসেছে। তারা বিবাদ করে, লড়াই করে মানুষের গৌরব সপ্রমাণ করতে চায় নি। বরঞ্চ লড়াই করাকে তারা বর্বরতা বলে জ্ঞান করেছে। চীন তার প্রধান দৃষ্টান্ত। বহু শতাব্দী ধরে আপনার সাহিত্য, অতুলনীয় শিল্প ও অতিগভীর তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে মনকে সম্পদশালী করে রাখতে পেরেছে। মানুষের চরম সত্য যে তার অন্তরে সঞ্চিত, এই কথাটা যতই তারা জীবনের ব্যবহারে সপ্রমাণ করেছে ততই তারা মহতী প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে। আজ লোভের সঙ্গে, বিজ্ঞানবাহন রিপূর সঙ্গে, তার শোচনীয় বিরোধ ঘটল।

আমাদের বিশ্বাস, এক দিন যখন এই বিরোধের অবসান হবে তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে পুনরায় পৃথিবীতে স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু যারা লোভকে কেন্দ্র করেছে তারা জয়লাভ করলেও আত্মপরাভবের বিপত্তি থেকে কোনো দিন রক্ষা পাবে কি না সন্দেহ করি। এই লোভের শেষ পরিণাম মহতী বিনষ্টি। পরম্পরের প্রতি অবিশ্বাস, পরম্পরের অর্জিত সম্পদের প্রতি লুক্ক হস্তক্ষেপ— এই অভ্যাস অনার্য অভ্যাস এবং এই অভ্যাস মানকতার মতো শরীরমনকে অস্তিত্ব করে রাখে। তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করা পরম আঘাতেও অসাধ্য। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর শিক্ষা দেশকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককেই মনের তিস্তর ধ্যান করতে হবে। কারণ, পাশ্চাত্য সংক্রামকতা আমাদের জাতির মধ্যে প্রবেশ করে ভারতবর্ষের পুরাতন আধ্যাত্মিক বীর্যকে প্রতিদিন পরাস্ত করেছে। ঋষিবাক্যে যে পরম মন্ত্র এক দিন আমরা পেয়েছিলাম সে হচ্ছে শান্তং শিবং অধৈতম্— এক

আরোগ্য

সত্যের মধ্যে সত্যের এই তিন রূপ বিদ্যুত। শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য— এই বাণীর তাৎপর্য মানুষকে তার সত্য পরিচয়ে উদ্ভীর্ণ করতে পারে, কারণ মানবের ধর্ম পরস্পর প্রীতির মিলন, ব্যবহারে কল্যাণ ও শান্তিকে অক্ষুণ্ণভাবে স্বীকার করা। আমি এই কামনা করি, আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাকুক।

যে সমাজ আশ্রয় পরিবর্তে বহির্বিষয়কে একান্ত প্রাধান্য দেয়, সে আপন লোভের সঞ্চয় দিয়ে অন্তকে আঘাত করে এবং সেই লোভের সঞ্চয়ই তার ফিরে আঘাতের বিষয় হয়। এই আঘাত-প্রত্যাহাতের কোনো দিন কোথাও অন্ত দেখা যায় না। শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে সে এই লোভের ছুর্গকে দৃঢ়তর করতে থাকে, পরাস্ত হলে দৃঢ়তর প্রয়াসে তার অমুসরণ করতে থাকে। তখন পৃথিবীর যে-সকল জাতি বাহবলে তার সমান নয় তাদের স্বাধীন কৃত্যার্থতার পথ অবরুদ্ধ করে ফেলে। এই লোভরিপুপ্রধান সভ্যতা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে ছেয় করে রাখবার পেষণযন্ত্র হয়ে থাকে, কারণ লোভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ করতে পারে না। এ রকম সভ্যতাকে সভ্যতা নাম দেওয়া যায় না, কেননা সভ্যতা সর্বমানবের সম্পদ। অস্ত্রকার মহাযুদ্ধের অধিনায়কদের অন্তত এক পক্ষ বলে থাকেন, তাঁরা সমস্ত মানবের অন্ত লড়াই করছেন। কিন্তু নিজেদের গণ্ডির বাহিরের মানুষকে মানুষ ব'লেই গণ্য করে না, উচ্চত লোভরিপু এই লক্ষণ। কেননা, আশ্রয় বাঁদের মুখ্য লক্ষ্য নয় আশ্রয়তার বোধসীমা তাদের কাছে সংকীর্ণ। মানুষের সম্বন্ধে অধৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী তাদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না। মনে রাখতে হবে, এক দিন এই মৈত্রী প্রচার করবার অন্ত সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশে বিদেশে অভিযান করেছিল, পরসম্পাদকে

কালান্তর

আত্মসাৎ করবার জন্ত নয় ।

পাশ্চাত্য অলংকার-মতে মহাকাব্য যুদ্ধমূলক । মহাভারতের আখ্যান-ভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত— কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয় । নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি । এতে দেখা যায়, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন— এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ । এই নির্দেশ সকল কালে সকল মানবের প্রতি । যে ভোগ একান্ত স্বার্থগত ত্যাগের দ্বারা তাকে কালন করতে হবে । যে ভোগে সর্বমানবের ভোজের আহ্বান আছে সভ্যতার স্বরূপ আছে তার মধ্যে । কিন্তু রিপু অতি প্রবল, সাধনা অতি দুর্লভ । সেই কারণেই এই সাধনায় যত দূর সিদ্ধি লাভ করা যায় মনুষ্যত্বের গৌরব তত দূর প্রসারিত হতে থাকে, ব্যাপ্ত হতে থাকে তার সভ্যতা ।

যুগ প্রতিকূল, বর্ধরতা বলিষ্ঠতার মর্যাদা গ্রহণ ক'রে আপন পতাকা আন্দোলন করে বেড়াচ্ছে রক্তপঙ্কিল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে । কিন্তু বিকার-গ্রস্ত রোগীর সাংঘাতিক আক্ষেপকে যেন আমরা শক্তির পরিচয় ব'লে ভুল না করি । লোভ যে সম্পদ আহরণ ক'রে আনে তাকে মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত ঐশ্বর্য ব'লে জ্ঞান করে এসেছে, এবং অহংকৃত হয়েছে সঞ্চয়ের মরীচিকায় । লোভের ভাণ্ডারকে রক্ষা করবার জন্তে অগৎ জুড়ে অস্ত্রসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন চলল । সেই ঐশ্বর্য আজ ভেঙেচুরে তার উগ্রাবশেষের তলায় মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে ।

আমার অধিক কিছু বলবার নেই, শক্তিও নেই । মানবসত্তার শেষ বাণী আমাদের দেশে উচ্চারিত হয়েছে, আমি আজ কেবল তারই প্রত্যুচ্চারণ করে বিদায় গ্রহণ করি

আরোগ্য

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তরু খ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমতো প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যারা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিত পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাথীর জনে,
দলে দলে যারা
মরুবালুতলে অস্থি গিরেছেন রেখে,
সমুদ্র যাদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনাররু কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে—
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার ॥

উদয়ন । শান্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০ । প্রাতে

মাঘ ১৩৪৭

সভ্যতার সংকট

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনকেন্দ্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অসম্ভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি বিখণ্ডিত হয়ে গেছে— সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালয়গুলোর পধ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে, অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গতলে; নিরন্তর আলোচনা চলত সেক্সপিয়রের নাটক নিয়ে, বায়র্নের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্‌সে সর্বমানবের বিজয়বোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অস্তরে অস্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির

সত্যতার সংকট

স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, এক সময় অত্যাচার-প্রণীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিস্তার পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়ে-ছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমস্ততার তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম। সেই সময় অনু ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাধি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীত্রয় দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সে দিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা রূপের অবরুদ্ধ ভাঙারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শব্দ আমার মনে মন্ত্রিত হয়েছে।

সিভিলিজেশন, যাকে আমরা সত্যতা নাম দিয়ে উর্জমা করেছি, তার স্বার্থ প্রতিশব্দ আমাদের জ্ঞান পাওয়া সহজ নয়। এই সত্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল যত্ন তাকে বলেছেন

কালান্তর

সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারস্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রধান উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাকুক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচারব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিন্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কি ধর্মমতে কি লোকব্যবহারে, শ্রামবুদ্ধির অশুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন হৃৎখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপূর প্রবর্তনার তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভূতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেটন হতে এক দিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের

সত্যতার সংকট

যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানায় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সত্য অগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলাম তখন কোনো দিন সত্যনামধারী মানব-আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, এক দিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সত্যজাতির অপরিণীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাগীস্ত।

যে যজ্ঞশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত; অথচ চক্ষুর সামনে দেখলুম, আপান যজ্ঞচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই আপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সত্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কো নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অরূপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্ত ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সত্যতা জাতিবিচার করে নি, বিগত মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার ক্রম এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অমুতক করেছি। মস্কো শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলাম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার স্বার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে

কালান্তর

প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সংঘর্ষ আছে বহুসংখ্যক মরুত্বের মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিম্যান করে তোলাবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সংঘর্ষে কিছু পড়েছি। এই রকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে যত্নস্বত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণা যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ এক দিন দুই যুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের যুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে যুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বাস্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণকামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যতাগর্বিত কোনো যুরোপীয় জাতি তাকে আজও অতিক্রম করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের অগদল পাথর বুকে নিয়ে ভাসিয়ে

সভ্যতার সংকট

পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের যতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে অর্জরিত করে দিলে, এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম, উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল! পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের স্তলার ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিত্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, এক দল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত আগ্রহ হয় নি, তবু যুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। যুরোপীয় জাতির স্বতাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্য শাসনের চালনার ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আয়োজ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসনচালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারতশাসনবস্ত্রের উর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেম্ব্রে প্রেরণের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের

কালান্তর

এত বড়ো অপমানকর অসত্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে আপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই ছুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিজুত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলা, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে স্বার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার রূপগত এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহাদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। 'এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আতঙ্কিত বোধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে স্বার্থ ইংরেজকে, স্বার্থ ধর্মটানকে, স্বার্থ মানবকে বহুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণিতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলাম, আমার শেষ-

সত্যতার সংকট

বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ক্রম হারে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মন্ত্রণ করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্বকে এঁরা সকল প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্র কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত যুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদস্ত বিক্যশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্ভত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সত্যতার মজ্জার ভিতর থেকে আগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুণিত করে-দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরঙ্ক অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাদিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন গুঁড় হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা ছবিবহু নিফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অস্তরের সম্পদ এই সত্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আগছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাহিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সত্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মাহুকের চরম আশ্বাসের কথা মাহুকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত

কালান্তর

থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিন্ন সত্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভঙ্গুপ ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আশ্বপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাধিত মানুষ নিজের জন্মযাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অস্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমস্ততা আশ্বস্তরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মৈগৈধতে তাবৎ ততো ভঙ্গাণি পশ্চতি ।

ততঃ সপত্নান্ জয়তি সখুলন্ত বিনশ্চতি ॥

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যুলির ঘাসে ঘাসে ।
স্বরলোকে বেজে ওঠে শব্দ,
নরলোকে বাজে জরজর—

এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমারাজির চূর্ণতোরণ যত
ধূলিভলে হরে গেল ভগ্ন ।

